ভূমিকা

এই বইয়ের পরিকল্পনায় আমি একটি অভিনবত্ব আনবার প্রয়াসী হয়েছি। এটিকে দুই অংশে বিভক্ত করে, দ্বিতীয় অংশে বিভিন্ন তারিখে আমার রোজনামচা জাতীয় কয়েকটি লেখা সন্নিবেশিত কবলাম—একদিকে শুধুই কল্পনা আর একদিকে জীবনের খানিকটা বাস্তব অংশ।

আরও একটি কথা আছে। রেডিওতে প্রচারিত শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবী এবং আমার নিজের 'ভাগীরথী' নিয়ে একটি মৌল কাহিনীও দিয়ে দিলাম। একটু বৈচিত্র্যের খাতিরেই। তাঁদের ঋণ এখানে স্বীকার করে রাখলাম। তাঁরাও সুযোগ মত কাহিনীটি তাঁদের বইয়ে নিতে পারবেন।

আশা করি পরিকল্পনার দুটি অঙ্গই পাঠকের সমর্থন লাভ করবে।

ব. ভ. ম.

এর মুখে ওর মুখে শুনে ওঁদের পারিবারিক রহস্য সম্বন্ধে খানিকটা ওয়াকিবহাল থাকতাম। বিশেষ করে ওঁদের নাৎবৌ নতুন বৌদির কাছে খাতিরটা ছিল বেশি। এবং পারিবারিক রহস্যের মধ্যে যেটুকু দাম্পত্য নিয়ে, সে-সম্বন্ধে খোঁজখবরটা ওঁর কাছেই পেতাম বেশি। ওঁর নূতন বিবাহ, তখন মাত্র বছর দুই চলছে, স্বামী হাবুলদাদার কলকাতায় থেকে চাকরি, হপ্তায় গড়পড়তা দুটো দিন আর ছুটিছাটায় বাড়ি থাকেন, কেনা-কাটা, বিশেষ করে চিঠি-পত্রের ব্যাপারে আমার প্রয়োজনটা খুব বেশি ছিল নতুন বৌদির। উনি বলতেন— রাঙা ঠাকুমার মেজাজটা বিগড়োয় ঠাকুর্দার বিরহে। এখন বুঝছি হয়তো ওঁর নিজের দুঃখই অন্যের নামের আড়াল দিয়ে একটু মুখ ফুটে বলা, তার সঙ্গে আমায় হাতে রাখবার জন্যেই একটা পারিবারিক গোপন রহস্য প্রকাশ করে একটু অন্তরঙ্গতা।

তবে মেজাজ বিগড়ানোটা রাঙা ঠাকুমার বিরহ-ব্যথার প্রতিক্রিয়া হওয়াটাও বিচিত্র নয়।

তার কারণ—সে আবার অন্য এক দাম্পত্য রহস্য রাঙা ঠাকুমাদের জীবনে। সেটা এখন হয়তো কিছু কিছু পরিষ্কার হয়েছে, কিন্তু বাল্যের অপরিপক্ক বুদ্ধি দিয়ে কিছুতেই বুঝতে পারতাম না।

ঠাকুমা সাবিত্রী-ব্রত করতেন।

সাবিত্রীর উপাখ্যান শুনি নতুন বৌদির কাছে; কি করে সাবিত্রী তাঁর স্বামী সত্যবান অল্পায়ু হবেন জেনেও শুধু প্রথম দর্শনেই প্রেমসঞ্চার হয়েছিল বলে পিতামাতার অনিচ্ছা সত্বেও বিবাহ করেন এবং পরে তিনি মারা গেলে সতীত্বের তেজে তাঁকে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে আনেন।

ব্রতটা আর সব ব্রতর তুলনায় খুবই শক্ত এবং এত ঘটা করে করতেন ঠাকুমা যে, মনে হত যেন দুর্গাপূজাকেও ছাপিয়ে যেত ব্যাপারটা। কৃচ্ছ্র-সাধনটাই এক অদ্ভুত ব্যাপার। দু'দিন এক আসনে হবিষ্যি আর ফলমূল খেয়ে, দু'দিন নিরম্বু উপোস করে, দেবতার মতোই স্বামীকে চৌকিতে বসিয়ে ফুল-দূর্বা-চন্দন দিয়ে পূজা করে পরদিন পারণ। অমন শরীর, তবু ঠাকুমা শেষদিকে এমন নির্জীব হয়ে যেতেন, অমন দরাজ গলা এমন নিঝুম হয়ে যেত যে, আমার ভয় হত ওঁকে বাঁচাতে উল্টে ঠাকুরদাকে না সাবিত্রী ব্রত করতে হয়। সেও এক অদ্ভুত অনুভূতি—আশা-উদ্বেগ-কৌতূহল একসঙ্গে মেশানো।

অবশ্য দরকার হত না, চৌদ্দ বৎসরের ব্রত, তার মধ্যে গোটা ছয়-সাতের স্মৃতি আমার স্পষ্ট। দেখতাম, বেশ কাটিয়ে উঠে আবার দিন দুয়েকের মধ্যে

নিজের গলা এবং তার প্রয়োগ শক্তি ফিরে পেয়েছেন রাঙা ঠাকুমা। আরও আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য, অত ঘটা করে পূজা করা, তবু রাঙা ঠাকুর্দার সঙ্গে সেই ঝগড়া-খিটিমিটি, সেই মুক্ত কণ্ঠে গালি বর্ষণ, সেই মৃত্যুকামনা—চিরকালটা জ্বালালেন, এবার হয় উনি যান, না হয় রাঙা ঠাকুমাকেই ডেকে নিয়ে যম পরিত্রাণ করুন ওঁর হাত থেকে। ভাষার যেটুকু অর্থবোধ হত, ভঙ্গির যেটুকু দ্যোতনা, তাতে মনে হত আগেরটা হলেই রাঙা ঠাকুরমা যেন বেশি খুশি হন।

অত্যন্ত আশ্চর্য লাগত আমার। একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল—তবে বুঝি এই রকম নির্যাতন করবার জন্যই ঠাকুমা ওঁকে সতীত্বের তেজ নামে কোন অজ্ঞাত শক্তি দিয়ে যমের হাত থেকে বাঁচিয়ে জীইয়ে রেখে যাচ্ছেন। কতকটা যেন কৈমাছ জীইয়ে রাখবার মতো। নতুন বৌদি দাম্পত্য তত্ত্বের হাজার ব্যাখ্যা দিলেও এইখানটা ঠিক পরিষ্কার হত না আমার কাছে।

তারপর একদিন একটা কাণ্ড হয়ে ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে উঠল। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের নজীর দিয়ে সেই কথাই বলতে বসেছি—

সেবারে আরও তুলকালাম করে ঠাকুমার চৌদ্দ বৎসরের ব্রত উদ্‌যাপন হল। সমস্ত গাঁ-সুদ্ধ নিমন্ত্রণ, শামিয়ানা খাড়া করে আসর বেঁধে কথকতা, কীর্তন, তিনদিন ধরে সমস্ত গ্রামটা গমগম করতে লাগল। একটা যাত্রারও ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু স্বয়ং অধিকারী কিম্বা জুড়ির কেউ একজন হঠাৎ মারা যেতে দলটা আসতে না পারায় ওটা আর হল না। গাঁয়ের হুজুগ টপ করে জুড়ুতে চায় না, ক্লাবের ছেলেরা ঠিক করল তারাই একটা যাত্রা দেবে, আর পালা হবে 'সাবিত্রী'। বাড়ির সবাই মত দিল, শেষ কাজটাতেই একটা বিঘ্ন হয়ে গেছে, মনটা খুঁতখুঁত করছিল, এমন কি বায়না দিয়ে একটা নূতন দল আনবার কথাও উঠেছিল নাকি। ঠাকুমাকে কিন্তু রাজী করানো যায়নি।

ছেলেরা গিয়ে বলতে ওঁরা রাজীই হলেন, বললেন ঠাকুমাকে যদি রাজী করাতে পারে, ওঁদের আপত্তি তো নেই-ই বরং খুশীই হবেন। বাঘের মুখে আচমকা গিয়ে না পড়ে, খানিকটা যাতে প্রস্তুত থাকে, তার জন্য বলে দিলেন ওঁর মেজাজটা খুব খারাপ যাচ্ছে ক'দিন থেকে।

ওটা আমি জানতাম, সর্ব-ঘটের নারায়ণী ছিলাম তো। জানতাম, বিঘ্নটা হওয়ার সব দোষটা ঠাকুমা ঠাকুরর্দার ঘাড়ে চাপিয়েছেন এবং তাঁকে নিয়ে খিটিমিটিটা খুবই বেড়ে গেছে। কয়েকটা এই রকম খেঁচাখেঁচিতে উপস্থিত থাকায় (ঠাকুমার আওয়াজ উঠলে পারতপক্ষে বাদ দিতাম না)—টের পেলাম, ওঁর বক্তব্যটা অনেকটা এই রকম—যে লোকটার আয়ু নেই, পয় নেই, জানে

কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না, সে জেনে শুনেও তাঁকে এই চৌদ্দটা বছর এইরকম করে উপোস করিয়ে মারবার চেষ্টা করল কেন?

এখন যাই ভাবি, তখন কিন্তু যুক্তিটা আমারও খুব সমীচীন বলেই মনে হয়েছিল। নতুন বৌদি ওটাকে অবশ্য দাম্পত্য প্রেমের একটা খুব বড় লক্ষণ বলে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। অত করে আমায় দাম্পত্য শাস্ত্রে বেচারি তালিম দিচ্ছেন, অথচ কিছু বুঝছি না, সেই 'ক্যাবলাই' রয়ে গেলাম—এই লজ্জাটা ঢাকবার জন্যে সায়ও দিয়েছিলাম মনে আছে আমার। কিন্তু ভেতরে ভেতরে জানতাম ওটা ঠাকুমার অনুরাগ নয়, রাগই। এবং সঙ্গত রাগ।

ওদের পেছনে পেছনে আমিও গেলাম।

বিকাল বেলা। ছাত থেকে রোদ সরে যাচ্ছে। একটা মাদুরে পা ছড়িয়ে সুপুরি কুঁচুচ্ছিলেন ঠাকুমা, নতুন বৌদি চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন। বেশ হাঁসিখুশি ভাবই, আমাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে দেখে মুখটা একেবারে থমথমে হয়ে উঠল। একেবারে বেশ গলা ছেড়ে দিয়েই বলে উঠলেন—"শুনেছি। না, কিছু হবে না আর। বলগে যা, যেতে হয় যাক, কাকে ভয় দেখাচ্ছে? থান পরাবে আমায়? তা পরাক্। এই চোদ্দটা বছর ধরে একটা মানুষ…"

"আমি ঠাকুমা কিন্তু অন্য কাজে এসেছি, সেরে নিয়ে চলে যাই।"

ভালো করে রিহার্সেল দেওয়াই ছিল, জয়া-পিসিমার ভাইপো অখিল পকেট থেকে একটা ডিবে বের করে এগিয়ে গেল। বলল—"পিসি বললেন, জর্দাটা ফুরিয়ে আসছে, ওদিকে যখন যাবি এটুকু দিয়ে আসিস রাঙা খুড়িকে, নয়তো বলবে, পোড়ারমুখী একলাই খেলে সবটা।…থাক্ না ডিবেটা সুদ্ধ, এগ্‌জিবিশনে কিনেছিলাম। ভাবলাম এইতে করেই দিয়ে আসি রাঙা ঠাকুমাকে। যাই তাহলে এবার এ্যাঁ?"

"বোস না একটু।"—হাসি হাসি মুখটা হা করে একটিপ জর্দা মুখে ফেলে দিলেন ঠাকুমা। বললেন—"বালাই! অমনি 'পোড়ারমুখী!'—গালটা উচ্চারণ করতে একটু বাধল না মেয়ের!…বোস না একটু দাদা। এরা আবার কি বলতে এসেছে…"

ওদের দিকে চেয়ে বললেন—"শুনেছি সব। তা 'সাবিত্রী' যাত্রা যে করতে যাচ্ছিস, ছেলেখেলা তো নয়—করছেটা কারা শুনি।"

বঙ্কুদা লীডার। কারা কারা কিসের পার্ট নিয়ে নামছে বলে যাচ্ছিল, রাঙা ঠাকুমা একটু অধৈর্য-ভাবেই প্রশ্ন করলেন—"চুলোয় যাক আর সবার কথা। যম হয়ে কে নামছে তাই আগে বল না শুনি।"

নাম করল বঙ্কুদা। সহদেব দাঁ। বাজারে বড় চাল-ডাল-তেল-মসলার দোকান। কালো, লম্বা, মোটা, পেটে-বুকে কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, মাথায় বাবরি, বড় বড় চোখ একটু লাল; দুটো গাল ঢেকে গালপাট্টা। বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ।

রাঙা ঠাকুমা কল্পনা-দৃষ্টিতে যেন সবটুকু দেখতে দেখতে মুখে দুটো পান আর একটিপ জর্দা ফেলে দিলেন, তারপরেই একেবারে খিলখিল করে ঘাড় উলটে হেসে উঠলেন। পান জর্দা হাসির মধ্যে ভাঙা ভাঙা স্বরে বলে চললেন —"হাঁ, এইবার—ঠিক—হয়েছে—নিশ্চয় করবি—ও-যমের হাত থেকে কে কেড়ে আনে একবার দেখতে চাই আমি—দেখতে চাই কত বড় সতী সাবিত্রী সে—হ্যাঁ, যম বাছাই করেছিস বটে!—যা..."

প্রবল উৎসাহে দিন রাত খেটে খুব জোর মহলা দিল ছোকরারা। তারপর, দিন পনের বাদে ভালো করে আসর তোয়ের করে জুড়ে দিল পালা।

আমার পালার চেয়ে ঠাকুমার দিকেই মন ছিল বেশি। যাত্রা আর ওঁকে বেশ ভালোভাবে এক সঙ্গে দেখা যায় এইভাবে কাছাকাছি একটা জায়গা বেছে নিয়ে গুছিয়ে-গাছিয়ে বসলাম। স্পষ্ট কিছু বুঝছি না, তবে সহদেব দাঁর যমের পার্ট নেওয়াটা খুব বেশিরকম কৌতুক জাগিয়েছে ওঁর মনে, কিভাবে সেটা প্রকাশ পায় তার জন্য মনটা কৌতূহলে রয়েছে ভরে।

ঠাকুমাও জাঁতি, পান-দোক্তার ডিবে সব নিয়ে জমিয়ে বসেছেন আরও সব বর্ষীয়সীদের মধ্যে। শুরু হয়নি গোলমাল, তার মধ্যেই কি সব আলোচনা হচ্ছে আর ঘাড় উলটে উলটে হেসে উঠছেন, এমন সময় নাতির কাঁধে হাত দিয়ে জয়া-পিসিমার জ্যেঠাই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এসে উপস্থিত হলেন, এক হাতে আঁকাবাঁকা একটা মোটা লাঠি।"

"ও হরি! তুমি কি আশায় এলে, যমের অরুচি!"—বলে হেসে একেবারে লুটিয়ে পড়ার মতো হলেন রাঙা ঠাকুমা। তারপর, সে হাসির মধ্যেই বলেন— "দিদি আশা করে এসেছে—এই এক সুবিধে—তা সহদেবও যে কিছু করতে পারবে না ওর · ওঃ, বাবা গো! আজ হাসিয়ে তুলে দেবে আমায় সবাই সহদেবের হাতে!"

জয়া-পিসিমার জ্যেঠাই। গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে বড়, তখন প্রায় আশি-পঁচাশি। একেবারে ঝুঁকে গেছেন, লাঠি আর নাতি সম্বল। সবাই জায়গা করে দিতে রাঙাঠাকুমার কাছেই বসতে বসতে কাঁপা গলায় বললেন—

"শুনলুম গাঁয়ের ছেলেরা নাকি খুব ঘটা করে করছে—তা আমার আবার ঘটা!—না পাই চোখে দেখতে, না পাই কানে শুনতে।"

কি বলতে যাচ্ছিলেন রাঙা ঠাকুমা, এমন সময় ঘণ্টা বাজিয়ে শুরু হল যাত্রা।

প্রাণ-পণ করে খেটেছে, একেবারে গোড়া থেকেই দিলে জমিয়ে। আমার লক্ষ্য ঠাকুমার দিকে। দেখলাম সেই হাসি-হাসি ভাবটা দু' চারবার ফুটেই আস্তে আস্তে যেন মিলিয়ে আসছে। সেও যা, তা সহদেবকে উদ্দেশ্য করেই—"সহ কখন্ আসবে?...ওরা সহদেবকে বের করছে না কেন?—একবার দেখব যে!..."

এদিকে পালা জোর এগিয়ে চলেছে। প্রথম দর্শন, বারণ সত্ত্বেও সাবিত্রীর বিবাহ, তারপর বিবাহের একটা বৎসর কাটিয়ে মোক্ষম দিনটিতে সাবত্রীকে সঙ্গে করে সত্যবানের সমিধ আহরণের জন্য বনে যাওয়া। যতই এগিয়ে আসছে, দেখছি রাঙা ঠাকুমা যেন তন্ময় হয়ে যাচ্ছেন। শুধু উনিই নয়, এমন জমিয়েছে, অত বড আসরটা একটু 'টু' শব্দ নেই। এক সময় সামান্য একটু মাথা ধরে সেটা সঙ্গে সঙ্গে উৎকট হয়ে পড়ে সত্যবানের মৃত্যু হল।

এবার সহদেব এল যমের পার্ট নিয়ে। একে সহদেবই, তায় রক্তচেলি, পায়ে শুঁড তোলা প্রকাণ্ড নাগডা, কপালে মোটা সিঁদুর, হাতে যমদণ্ড—ছোট ছেলেমেয়ের আওয়াজও যা একটু-আধটু হচ্ছিল, গেল বন্ধ হয়ে।

একটু যেন চটক ভাঙল ঠাকুমার এতক্ষণে। ডিবে খুলে দুটো পান আর এক টিপ জর্দা মুখে ফেলে দিয়ে একটু যেন হাসি মুখেই পাশে জয়া-পিসিকে কি বলতে যাবেন, এমন সময় যম সহদেব সত্যবানের মাথায় যমদণ্ড ঠেকিয়ে জলদ-গম্ভীর স্বরে সমস্ত আসরটা কাঁপিয়ে সাবিত্রীকে মৃতদেহ ছেড়ে দিতে বলল, সে তার আত্মাকে নিয়ে যাবে এবার।

পান চিবোনি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়ে রাঙা ঠাকুমার মুখটা সে যে কী অদ্ভুত রকম হয়ে গেল বলে বোঝাতে পারি না। তারপরেই সাবিত্রীতে যমে কথাবার্তা চলল।

সাবিত্রী সেজেছিল মদন। যেমন মানিয়েছিল তেমনি চুটিয়ে পার্ট করে যাচ্ছে সেকালের যাত্রার ঢঙে। প্রথমে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনুরোধ, মিনতি. তারপর তর্ক। উপোসে শরীর এলিয়ে রয়েছে. তারই মধ্যে আবার সতীত্বের তেজ যেন ফুটে বেরুচ্ছে। যম কিন্তু কোনমতেই রাজী নয়। ধর্মরাজ, এদিকে

সত্যবানের আয়ু ফুরিয়েছে, কোন মতেই রেহাই পেতে পারে না। আসর একেবারে নিশ্চুপ, একটা সুচ পড়লে তার শব্দ শোনা যায়। একবার রাঙা ঠাকুমার দিকে চাইতে দেখি তাঁর চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। তার পর "সত্যবান, আগচ্ছ !!"—বলে যম সেই যমদণ্ডটা তুলে নিয়ে এগুবে, ঠাকুমাও খাড়া হয়ে বসলেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই জয়া-পিসির জ্যেঠাইমার লাঠিটা তুলে নিয়ে—"তবে রে, তোর ধম্মরাজের নিকুচি করেছে !! একটা কচি মেয়ে চার-চারদিন ধরে নিজ্জলা উপোস দিয়ে যাচ্ছে উনি এসেছেন ধম্ম দেখাতে !…"

—বলতে বলতেই আসরে ঢুকে পড়ে যমের মাথায় বসাবেন লাঠিটা, সহদেব একটু হকচকিয়ে গিয়েই, একটা গোত্তা মেরে মাথাটা বাঁচিয়ে নিয়ে ডিঙ্গিয়ে-ডাঙিয়ে একেবারে সীমানার বাইরে। "ও ঠাকুমা !…ও কাকিমা !—এটা যাত্রা যে !…ও কি করছে ?"—কজন ঢুকে পড়ে ওঁকে ধরে নিয়ে এসে বসাল একবার। একটা খুব হট্টগোল উঠেছে। সেটা থামিয়ে আসর ঠাণ্ডা করতে বেশ খানিকটা সময় লাগল।

অর্ধেন্দু মুস্তাফি না ?—যিনি বিদ্যাসাগরের চটি জুতো মাথায় করে নিয়ে এসে বললেন—"এতদিনে আমার অভিনয় করা সার্থক হল।"

কথাটা তখনও এত পুরনো হয়ে যায়নি। যাত্রা আবার শুরু হওয়ার আগে সহদেব লাঠিটা দু'হাতে বুকের কাছে ধরে এসে দাঁড়াল হাত জোড় করে। বলল—"রাঙা ঠাকুমা, তাহলে একেবারে মন্দ হয়নি—নেহাৎ ব্রেথা যায়নি আমার খাটুনিটে ?"

অত লজ্জিত হয়ে পড়তে এর আগে কখনও দেখিনি রাঙা ঠাকুমাকে। একটু জড়ো-সড়ো হয়েই বসেছিলেন, সহদেব আসতে আবার যেন একটু সাড় হল। বললেন—"তা বলে তোকে আর অত ভালো করতে হবে না বাবা, ঢের হয়েছে। আর, আমারও যেমন ভীমরতি হয়েছে—এখন আবার যাত্রা দেখা !…দে বাঁচিয়ে বাছা, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাই।"

দেহ্-সমাং নিক্ রহো

কথাটা এদেশের একটা বড় আশীর্বাদ; অর্থ হচ্ছে—তোমার শরীর এবং পরিবারবর্গ কুশলে থাক্। পরম কাম্য জিনিস একথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু শুনে অবধি মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে রয়েছে।

অনেক দিনের সম্বন্ধ বুড়ির এ-বাড়ির সঙ্গে, প্রায় বছর কুড়ি-বাইশ ধরে দুধ যোগান্ দিয়ে আসছে। ওটা বাড়ির মেয়েদের এলাকা, সুতরাং একটানা এতদিন খারাপ দুধ দিয়ে যে কোন লোক টিকে থাকবে এটা সম্ভব নয়। বড় কঠিন ঠাঁই, বিশেষ করে যদি বাঙালীর মেয়ে হল। তেমনি অন্য দিকে আবার একটানা এত বছর খাঁটি দুধ যোগান দিয়ে যাবে, শুধু টিকে থাকবার লোভে, কোনও দুধ-ওয়ালির কুষ্ঠীতে এ-কথা লেখেনি। অথচ বুড়ি রয়েছে টিকে। এবং মোটামুটি ভালো দুধ দিয়েই।

একটা রহস্য সবার নজরে।

তারপর সেটা পরিষ্কারও হয়ে গেল কতকটা—লোকসানটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য বুড়ি নাকি এই বাড়িতেই এক শাঁসালো খদ্দের ধরেছে। মেয়েমানুষের কথা, কানাঘুষোতে নিজেদের মধ্যেই চলছিল, তারপর একদিন আমার কানেও পৌঁছে গেল। খদ্দেরটি নাকি আমি স্বয়ং।

অস্বীকার করব না, আমার একটু কেনা-কেনা বাই আছে। এবং এদিকে এসে বেড়েও গেছে। এটা কেন হয় ভাবতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে শান্তি-শান্তি করলেও শান্তি জিনিসটা আমরা পুরোপুরি চাই না। তাই, কর্মের জীবনে আমরা যে ঝামেলাকে পরিহার করবার চেষ্টা করে এসেছি, অবসর-প্রাপ্ত জীবনে সেটাকেই আবার নানা ভাবে টেনে আনতে চাই। সবাই নিজের নিজের মেজাজ অনুযায়ী পন্থা বেছে নেয়, আমি বেছে নিয়েছি এই কেনার দিকটা, আমার একটু সুবিধা আছে, আমাদের বার-বাড়ি আর ভেতর-বাড়ি আলাদা। নজরে পড়লে (এবং নজরও সজাগই থাকে), জামা-কাপড়, তৈজসপত্র থেকে, পাপর-বড়ি, তরিতরকারি, ফলফুলুরি প্রভৃতি সব জাতের ফিরিওলাদের বাইরেই আটকে ফেলি আমি। দর করি, বিশ্বাস করি না তাদের শপথ খাওয়া, বেশ খানিকটা তর্কাতর্কি হয় জিনিস বাছাবাছি আর দর-কষাকষি নিয়ে; খানিকটা রক্ত চলাচল বাড়ে, তারপর তারা জিনিস রেখে

দাম নিয়ে চলে যায়। প্রায় প্রত্যেকেই অসন্তোষের ভাব নিয়েই বিদায় হয় —এমন খরিদ্দারের হাতে পড়লে নাকি তাদের দেউলিয়া হতে দেরি হবে না। কিন্তু এও দেখেছি, আমায় যদি পেয়ে গেল, কেউ ভেতর-বাড়ির দরজা-মুখো হতে চায় না।

ওদের মতো এ নিয়ে বাড়িতেও একটা অসন্তোষের ভাব আছে। কেনার প্রবৃত্তি, অর্থাৎ লেন-দেনের ক্ষেত্রে টানাটানি করে জেতবার প্রবৃত্তি মেয়ে-পুরুষ উভয়েরই সমান। এ বিষয়ে যুগযুগাগত একটা ভাগবাঁটরাও হয়ে আছে —পুরুষদের জন্য বাজার, দোকান-পাট, মেয়েদের ফিরি-করা জিনিস। ওরা মনে করেন আমার অনধিকার-চর্চায় ওঁদের ন্যায্য কর্ম-পরিধি সঙ্কুচিত করে আনছি আমি।

আমাদের বাড়িতে ভেতর-বাইরে এই একটা অসামঞ্জস্য এসে গেছে, আমার অবসর-গ্রহণের পর থেকে। বাড়ছে দিন দিন।

বুড়ির কথায় আসা যাক এবার। পূর্বেই বলেছি প্রায় কুড়ি-বাইশ বৎসর ধরে ওর এ বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ। শোনা যায় আট-দশ বৎসর মেয়েদের সতর্কতায় (এই যশটা ওঁরা করেনই দাবি) খাঁটি দুধ খাইয়ে আর লোকসান সইতে না পেরে বুড়ি যখন ছাড়বে ছাড়বে করছে সেই সময় নাকি আমি বাড়ি এসে বসি। এবং কিছুদিন পরেই লোকসান দেওয়া নিয়ে নাকে-কান্না থেমে গিয়ে বুড়ি আবার পূর্ববৎ যোগান দিয়ে যেতে থাকে। এর সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা কঠিন, তবে এই সূত্র ধরে বাড়িতে আমায় নিয়ে গবেষণার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। বুড়ি নাকি বহুদিন পূর্বেই আমার এ দুর্বলতাটুকু (ওঁদের মতে) আবিষ্কার করে ফেলেছিল, দৈবাৎ আমার কিছু কেনার সময় উপস্থিত থাকলে দূর থেকে লক্ষ্য রাখত এবং আমার বাড়িতে এসে বসবার দিনটির প্রতীক্ষায় ছিল। ও যে অধৈর্য হয়ে পড়েছিল সেটা চাকরিতে এক্স্‌টেনশন্ পেয়ে আমার কর্মজীবনটা কিছু কিছু করে বেড়ে যাওয়ার জন্যই।

এর মধ্যে কতটা বাস্তব কতটা কল্পনা, কতটা আক্রোশ, কতটা আমার দুর্বলতার জন্য (ওঁদের মতে) সত্যকার অনুকম্পা বলতে পারি না, তবে নিজের কাছে নিজের আমার একটা ভালো জবাবদিহি আছে। শুধু বুড়ির ক্ষেত্রেই। আর যারা সওদা নিয়ে আসে তাদের কাছে খুব কড়া খদ্দের হলেও, বুড়ির ব্যাপারে আমি যে একটু ঢিলে দিই এটা ঠিকই। এ বিষয়ে আমার একটা

নিজস্ব থিয়োরিই আছে ; সেটা এই যে, যে মানুষটার যখন শক্তি ছিল তখনও ঠকিয়ে গেছে, বার্ধক্যের অসমর্থতায় তার সেই ঠকিয়ে যাওয়ায় একটা নৈতিক অধিকারই আছে। কেনার ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ও যে একেবারে কাত করে ফেলতে পারবে না এ আত্মপ্রত্যয় আছে আমার , আমি শুধু ইচ্ছা করেই একটু অজ্ঞ সাজি, একটু চোখ বুজে নিই।

ভেতরে দুধ যোগানোর অতিরিক্ত বাইরে বুড়ি যা সওদা ধরল তা হচ্ছে মরসুমী জিনিস, বিশেষ করে কপির সময় কপি এবং আমের সময় আম। বিক্রিব আইন-কানুনগুলো বেশ অধিগত আছে। প্রথমটা বেশ খাঁটি দিয়েই যে আরম্ভ করল, এটা বুঝতে দেরি হল না। এতে দুটো কাজ হল , একদিকে কেনার ব্যাপারে আমার যশটা গেল বেড়ে, অন্যদিকে বুড়ির প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও একে একে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হল।

এর পব বুড়ি কবে থেকে আস্তে আস্তে নিজ মূর্তি ধরতে আরম্ভ করল, সে খোঁজ রাখা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে। মানুষ কতদিন একটি মাত্র ব্যাপার নিয়ে পড়ে থাকতে পারে ? আলু কপি কেনা—এই একটাই কাজ নয়·তো আমার। আরও পাঁচটা ব্যাপারে মনটাকে চারিয়ে দিতে হয়।

বিক্রেত্রী হিসাবে বুড়ির দক্ষতার কথা আগেই বলেছি। পুরনো হয়ে খদ্দেব হাত করে ফেলার সঙ্গে ও আর একটা উপায় যা বের করল তা হচ্ছে শপথ খাওয়া। ওটা ফেরিওয়ালাদেরই একটা বিশেষত্ব, এর উপর বুড়ি ছেলেমেয়ে নিয়ে এত শপথ খেয়েছে যে শতসন্তানবতী হলেও মামুলী লোকে ততটা সাহস করবে না , চোখ নিয়ে এত যে, সহস্রলোচনা হলেও কেউ ততটা করতে ভরসা পাবে না। কিছু গছিয়ে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে আঁচলে টাকা-পয়সা বেঁধে ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বেবিয়ে যাওয়া এটা তো কিছুই নয়।

তবে খদ্দেরকে যে অভিশাপ দেয় না মনে মনে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। তার কারণ, এই ব্যবসায়সুলভ আত্মধিক্কারেব উর্মিবিক্ষোভের ঠিক নিম্নস্তরেই ওর মনে যে একটি বিজয়ের প্রসন্ন ধারা বইতে থাকে এ-সম্বন্ধেও আমি একেবারে নিঃসন্দেহ।

কিন্তু আশীর্বাদও দেয়নি কখনও। আজ এই হঠাৎ রূপান্তরে মনটা সংশয়াকুল করে তুলেছে। উপলক্ষ্যটা বলি এবার।

মরসুম এলে আম সরবরাহ করাটা বুড়ির প্রধান কাজ। আমের কেন্দ্র বলে ও ব্যবসাটা এখানে খুব ফলাও, এবং থাকেও বহুদিন বাজার দখল

করে। চারিদিক থেকে আমদানি, শহরে বিক্রয়, তার ওপর দূর দূর থেকে ফড়ে এসে হাজারে-হাজারে রপ্তানি—সব মিলিয়ে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে প্রবেশ করে জিনিস বুঝে দরদস্তুর করে নিত্যব্যবহার্য আম খরিদ করা, সে এক দুরূহ কাণ্ড। বুড়ি বোঝে ভালো একরকম। একটা লাভ নেবেই, খয়রাৎ করতে বসেনি, তারপর ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য জানতই আরও কিছু ধরে দিই, যেটাকে অজ্ঞ সাজা বা চোখ বুজে থাকা বলেছি। এই করে চলে আসছে, বহুদিন থেকেই। ওদিকটা এখন ওর মনোপলি বা একচেটিয়া।

তবে, যদি আমি রইলাম। অন্যের কাছে আমল পায় না।

এবার একটা বিশেষ প্রয়োজনে আমার একেবারে মাস চারেক বাইরে কাটাতে হল, এবং তার মধ্যে আমের মরসুমের প্রথম দিকটা গেল পড়ে। মাস খানেকেরও বেঁশি। অর্থাৎ প্রায় আধাআধি কাটিয়ে ফিরে এলাম আমি। এসেই শুনলাম বুড়ি মরণাপন্ন।

বুকটা ছ্যাৎ করেই উঠল; ঠকাক বা যাই করুক, একটা মানুষ কুড়ি-বাইশ বছর ধরে বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছিল তো নিজেকে। মুখ থেকে একটু 'আহা' বেরুবার আগেই অবশ্য বুঝতে পারলাম, ওটুকু রহস্য মাত্র। কেনা কাটা নিয়ে ভেতর-বাইরে অবিরাম যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে তার সঙ্গে এর সম্বন্ধ আছে। সোজা ভাষায়, বুড়ির এবারে কাজকর্ম কিছুই চলেনি আমি না থাকায়, প্রতিদিনই খোঁজ নিয়েছে কবে আসব, কি বৃত্তান্ত; একরকম আধমরা হয়েই দিন কেটেছে।

পরদিনই প্রথম সুযোগে এসে দেখা করল এবং যথাবিধি ফরমাশ নিয়ে গেল আমের। প্রথম দিন শ'খানেকের। এইরকমই এক এক বারে থাকে, আম হিসাবে কখনও কখনও কিছু বেশিও! এবার বুড়ি নিজেই বেশি নিতে মানা করল। বলল এবার আমের বাজার ওর একেবারেই জানা নেই, ঝুঁকি নিতে চায় না বেশির।

একটা কথা বলা হয়নি। বছর দুয়েক থেকে বুড়ি আর নিজের মাথায় করে আম আনে না। বয়স বাড়ছে, পারেই না আর আনতে, যদিও প্রতিকূল মন্তব্য এই যে পরের মাথায় হাত বুলিয়ে টাকা হয়েছে, এখন বোঝা বওয়া ওর মর্যাদায় বাধে।

সত্য যাই হোক, বুড়ি আজকাল আর একজন স্ত্রীলোকের মাথায় ঝুড়িটা চাপিয়ে বিকিকিনি করে দেখেছি। বলে ওর এক আত্মীয়া। ও থাকায় বোঝা

বওয়া ছাড়া আরও কয়েকটা সুবিধা হয়। বাজার রেট ইত্যাদি বিষয়ে কথায় কথায় ওকে সাক্ষী মানতে পারে বুড়ি। বিশেষ করে ও যখন শপথ খেতে আরম্ভ করে, এও, কীর্তনের দোয়ার দেওয়ার মতো করে অনুরূপ ভাব-ভাষা-ভঙ্গি দিয়ে সেটাকে পরিপুষ্ট করে।

পরের দিনের কথা।

বাজার জানে না, একশ'র বেশি ঝুঁকি নিতে পারবে না নিজেই এ-কথা বলে সেই মতো ফরমাশ নিয়ে গেল বটে বুড়ি, কিন্তু দেখি রীতিমতো একটি ছোটখাট দলের মাথায় আম বোঝাই-করা ঝুড়ি চাপিয়ে হন হন করে এগিয়ে আসছে। গুনে দেখলাম পাঁচজন। আর সবার মুখের ভাব অনাসক্ত হলেও ওর নিজের মুখটা উদ্বেগে পূর্ণ, যেন কী সর্বনাশটাই তখুনি হয়ে যেতে পাবত!

বারান্দায় একটা বই নিয়ে আরাম-চেয়ারে বসে ছিলাম, বিস্মিত দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করলাম—"ব্যাপার কি?—এত আম?"

"বেশি নেই! মাত্র পাঁচশ' আছে, যা এই আবাগের-পো ফড়েদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারলাম একরকম···কিরে, মিথ্যে বলছি?"

সবগুলোকেই সাক্ষী মানল, তারা একবাক্যে বলল—"তা ছিনিয়ে নেওয়াই বৈকি একরকম।"

গঙ্গামুখো হয়ে হাত তুলে শপথও করল বুড়ি। বলল—"বম্বাই-মালদহের (ওরা ল্যাংড়াকে যা বলে) সময় একরকম শেষ করে যে এলেন আপনি, আর কি পাবেন? দু'একশ' পেলেও আবাগের-পো ফড়েদের সঙ্গে কি দরে এঁটে উঠতে পারবেন? এখনই অগ্নিমূল্য হয়ে গেছে···"

"বুঝলাম তো সবই, কিন্তু একেবারে এত আম নিয়ে আমি করব কি?" —বললাম আমি।

"এই শোন্, তোদের বলিনি?"—আবার ওদের সাক্ষী মানল বুড়ি। আমার দিকে চেয়ে বলল—"ওরাও আমায় বলেছিল, একেবারে পাঁচশ আম—ভোজ নয়, কিছু নয়, নষ্ট হয়ে যাবে না? বললাম—দাঁড়া, কি ব্যবস্থা করি দেখ আগে। আমি বাবুকে আম দোব, তার একটাও বরবাদ হয়ে গেলে জলে ডুবে মরব না!···তিন রকমের আম বেছে বেছে নিয়েছি, পাকা—আজ থেকে কাল পর্যন্ত চলবে। ডাঁশা তার পরে দু'দিন। বাদবাকি প্রায় অর্ধেক আম যদি আরও চারটে দিন না চলে তো আমায় ডেকে বলবেন'খন, বেইমান হারামজাদি তুই করেছিস কি?···"

"দর ?"—প্রশ্ন করলাম আমি।

"আমি কিছু বলব না।"—হাত দুটো একত্র করে কপালে ঠেকাল। বলল, "ঐ ওদের জিগ্যেস করুন কি দরে ফড়েদের ওপর টেক্কা দিয়ে ছিনিয়ে এনেছি মাল। তার ওপর কিছু লাভ ধরে দিতে হয় দেবেন, নয় তো তাও দরকার নেই আমার। এ বছরটাই বুঝি বাবুকে আম খাওয়ান হল না—কী করে যে কাটছিল আমার।"

আত্মীয়াটি বলল—"একটা আমের চাকলা মুখে দেওয়াতে পারিনি আমরা আজ পর্যন্ত। জানে গঙ্গামাঈ—আঁখ গলে যাবে মিছে বলে থাকি তো…"

এসব কিছু নয়। বাঁধা গৎ, আজ দশ বারো বছর ধরে শুনে আসছি। তারই না হয় রকম-ফের একটু। আমগুলো যে রেখেও নিলাম তা ওর ভাঁওতাতে পড়েই নয়। কুটুম্ব-সাক্ষাতের কাছে কিছু আম পাঠাতে হয়, কাঁচা বোধ হয় আরও কিছু কিনতেই হবে। ও যে দামটা বলে তা থেকে শতকরা দু'তিনটাকা যে কমাই আমি (সেটা ও-ও ধরে নিয়েই বলে), সেটা কমিয়েও নিলাম। রেওয়াজ মাফিক খানিকটা নাকী কান্নাও কাঁদল বুড়ি, ওরা ক'জনে দোয়ারও দিল, জেনেই কিছু লোকসান দিই বলে এসবে খানিকটা সান্ত্বনাই পাই বরং।

আজ সব চুকে-বুকে গেলে একগোছা নোট আচলে বাঁধতে বাঁধতে একটু হাত তুলে সে আশীর্বাদটুকু করল—"দেহ্-সমাং নিক্ রহো"—তাইতেই কিন্তু মনটা সত্যই বড় খারাপ হয়ে রয়েছে।

কী অগ্নিমূল্যে কিনতে হল আমায় আজ এই চারটি শব্দ? এতদিন পরে এসে একবারটি একটু বাজার না বুঝে বুড়ির খপ্পরে গিয়ে পড়ার জন্যেই না ?

শুধু এসে দাঁড়াল

ব্যাপারটা সামান্যই, কিন্তু তারই মধ্যে কী যে একটা অসামান্যতা ছিল, অমন একটা দুর্ঘটনা যে ঘোরালো হয়ে উঠছিল, বিনা রক্তপাতেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

কলকাতার যান-বাহন একটা অচল অবস্থায় এসে পৌঁছুচ্ছে দিন-দিন।

ট্রাম, বাস—একতলা, দোতলা, যাতেই যাই সেই চাপ ভিড, ঠেসা-ঠেসি, গাদাগাদি, মেজাজ, বচসা। এমনই অবস্থা যে প্রত্যেক ট্রামে-বাসে, প্রতিটি ট্রিপে দু-চারটা করে নাক ছেঁচে যাওয়ার, দু-চারটা করে দাঁত খসে পড়ার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না। দেখেছি, নানা কারণে। কেউ হয়তো শুরু হওয়ার পর প্রতিপক্ষকে অনর্গল বকে যেতে দিয়ে দাঁত নখ খুঁটতে খুঁটতে বরাবর নিশ্চুপ থেকে গেল, তারপর বাস থামার মুখে একটা মোক্ষম গালাগাল ঝেড়ে দিয়ে এমন টুপ করে নেমে গেল যে, শুধু নিরুপায় বলেই নয়, শত্রুর বল-চাতুর্যে বাকি পথটা ভদ্রলোকের মুখে আর রা সরল না। বাকযুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে গন্তব্যস্থলে নেমে শত্রুকে উপযুক্ত ভাষায় এবং ভঙ্গিমায় দ্বৈরথে আহ্বান করতেও দেখেছি। আবার এও দেখেছি, চাপভিড়ে আধা-অন্ধকারে খুব চড়া পদায় হুঙ্কার তুলে, হঠাৎ কোনরকমে শত্রুর অঙ্গসৌষ্ঠবের ওপর নজর পড়ে যেতে গলা একেবারে খাদে নামিয়ে বিড-বিড করতে করতে থেমে গেছে। যেমন এসব দেখেছি, তেমনি আবার এও লক্ষ্য করেছি যে অভ্যাসে—অসহায়তায় সাধারণ মানুষ যেন বড বেশি সহনশীল হয়ে উঠেছে। ঘাত-সহ, দার্শনিক, যেন 'আর ক'টা দিনই বা, যার জন্যে···' এইরকম একটা নির্লিপ্ততা। যারা সালিশীতে নামে তাদের কথা মেনে নিয়ে কিম্বা নিজেরাই গলার পর্দা নামাতে নামাতে থেমে যায়।

যার জন্য এত কাণ্ড সেই চাপ ভিড়ই করেছে রক্ষা এও চোখে পড়েছে, হাত টেনে বের করবার উপায় না থাকার জন্যই হাতহাতি হতে পায়নি।

মোট কথা, প্রতিবারেই পরিস্থিত রক্তপাতের অনুকূল থাকা সত্ত্বেও প্রতিবারেই গেছে সামলে এইটেই বরাবর এসেছি দেখে, কিন্তু সেদিন যেন আর উপায় ছিল না। তার কারণ সেদিন আর পৃথক পৃথক দুজন মাত্র নয় দুটি দল। হালকাও নয়, বেশ পুষ্ট। এবং তার চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ, দুটিই বরযাত্রীর দল।

বরযাত্রীর কথা উঠলেই আমার কি করে একটা বাংলা প্রবাদের কথা মনে পড়ে যায়—'এই বেড়ালই বনে গেলে বনবিড়াল হয়ে যায়' দেখেছি, এমনি সোনার চাঁদ ছেলে সব, বুকে করে নিতে ইচ্ছে করে, যাঁহাতক কারুর বরযাত্রী হয়ে দলে ভিড়ল, আর তাকে চেনা যায় না। যাদের মন্দ দুষ্টু বলে নাম আছে তাদের কথা বাদই দিলাম। সব মিলিয়ে একটা সমষ্টিগত উত্তাপ উৎপন্ন হয় যার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে কন্যাপক্ষকে পদে পদে অগ্নিপরীক্ষায় ফেলা।

এতে একটা ভুল ধারণা দাঁড়াতে পারে, তাহলে ফেরার পথে নিশ্চয়

বরযাত্রীর দল আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিয়ে আসে। না তা হতে দেখিনি এবং কেন হয় না সে বিষয়ে গবেষণা করে একটা সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছি। যাত্রার সময় বরযাত্রীর যে উত্তাপ তার সামনে একটা লক্ষ্য রয়েছে, কন্যাপক্ষ। ফেরার সময় আর সেটা না থাকায়, উত্তাপটা যেন সমস্ত পথ নূতন লক্ষ্য খুঁজতে খুঁজতে আসে। ফলে দেখা যাবে বরযাত্রী দলের বহির্মুখী আর গৃহমুখীর মধ্যে মেজাজের দিক দিয়ে বিশেষ প্রভেদ নেই। একটু তটস্থ থাকাই ভালো।

এ ভূমিকাটুকুর একটু প্রয়োজন ছিল; এবার মূল কাহিনীতে আসা যাক।

আমি উঠেছি যোল নম্বর স্টেট-বাসে; এর দৌড় শিবপুর ট্রাম ডিপো থেকে বালিগঞ্জ গড়েহাটার গোল পার্ক পর্যন্ত। উঠেছি ডিপোতেই, সন্ধ্যা উৎরে গিয়ে একটু রাত হয়ে এসেছে। ঘড়িতে আটটা পাঁচ হয়েছে, পনেরয় বাস ছাড়বে।

রাত হয়ে গেলেও একটা দরকারী কাজে বেরুতে হয়েছে, আগের বাসটা ধরতে পারলেই ভালো হত, কিন্তু সম্ভব হল না। সমস্তটাই প্রায় শুধু একটা বরযাত্রীর ভিড়েই বোঝাই হয়ে বেরিয়ে গেল। ভাবছি—যাক, অন্তত মন্দের ভালো, এই সময় চলন্ত বাসের দরজা থেকে একজন গলা বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল—"পরের বাসটা নিশ্চয় ধরবি, আমরা নেমে ওয়েট্ করব।"

কোনরকমে ঠেলেঠুলে ওঠবার ঝোঁকে অতটা লক্ষ্য করিনি, ঘুরে দেখি ওদের একটা মোটা অংশ এখনও পড়ে আছে। মিনিট দু-তিনের মধ্যেই পরের বাসটা স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়াতে আমরা সবাই উঠে পড়লাম। রাত্রির বাস, আকাশের অবস্থাও ভালো নয়, ঘণ্টা দুয়েক আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, সাধারণ যাত্রীর সংখ্যা একটু কমই আজ। আমাদের ওঠার পরও অনেকটা খালিই ছিল একজন দুজন করে ভর্তি হয়ে আসলেও শেষ পর্যন্ত হালকাই যাবে এইরকম মনে হয়। দলের একটি ছোকরা আমার পাশেই বসেছিল, পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বের করে কি মনে হতে আমার দিকে দৃষ্টি তুলে প্রশ্ন করল, আপত্তি আছে আপনার?"

অবশ্য ওর খাওয়াতেই আপত্তি আছে কিনা। একটা সৌজন্য। বরযাত্রী-পনার ঝোঁকেই করে ফেলেছে ভুলটা। আমি মনে করিয়ে সামনেই 'No Smoking' অর্থাৎ 'ধূমপান নিষেধ'টা দেখিয়েও দিতে 'ননসেন্স' বলে হাতটা ঝেড়ে পকেটে পুরল। প্রশ্ন করলাম—"যাবে কোথায় তোমরা? বরযাত্রীর দল মনে হচ্ছে যেন?"

জানাল আন্দাজটা ঠিকই আমার। শিবপুর—বাজে শিবপুর থেকে বালিগঞ্জ গরচায় বরযাত্রী হয়েই যাচ্ছে, পথেও দু'চারজন উঠবে মল্লিক ফটকে, বঙ্গবাসীর স্টপে।

"ভিড় না বাড়ে আবার।"—কথাটা বলার সঙ্গে দৃষ্টিটাও আমার দিকে সযত্নে গিলে করা পাঞ্জাবির হাতার ওপর গিয়ে পড়ল।

একবার হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে সান্ত্বনাচ্ছলেই আরম্ভ করেছি—"না, আর"—

—এই সময় একটা তুমুল কলরব উঠল—"না ট্রাম নয়! এই দিকে। স্টেট বাস।—খালি।"

সঙ্গে সঙ্গে একটি পুষ্ট দল এইমুখো হয়ে হুড়মুড় করে ভর্তি করে ফেলল বাসটা।

মনটা দমে গেল। ভিড়ের জন্যই নয়, অভ্যাস হয়ে এসেছে। দমে গেল—এরাও সব বরযাত্রী। বাসের মধ্যেকার গন্ধসারের সুবাস হঠাৎ দ্বিগুণিত হয়ে উঠেছে।

তৃপ্ত উদ্গার, রসিকতা করে পেটে হাত বুলিয়ে ভোজ্যদ্রব্য এবং পরিবেশনের সমালোচনায় বুঝলাম এরা ফিরতি দল। বৌবাজারে নেমে যাবে। সীট যা কিছু খালি ছিল সব ভর্তি হয়ে মাঝখানের চলা-ফেরার রাস্তাটাতেও আর জায়গা রইল না। গোলমালটাও বেড়ে যাচ্ছে। সমস্ত বাসটাই বলতে গেলে বরযাত্রী দিয়েই ভর্তি; নানারকম বুকনি, রসিকতা, দুটো দল বলে রসিকতার মধ্যেও আবার বুদ্ধির রেষারেষির চেষ্টা থাকায়, বেড়েই যাচ্ছে কলরোলটা। এরা আবার শিবপুর থেকে মেয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে খানিকটা যেন উত্তমর্ণের মনোভাব, যাকে ইংরেজীতে বলা যায় সুপিরিয়ারিটি কমপ্লেকস্। বুকনিগুলো একটু তীক্ষ্ণ এবং তির্যক। তবে, সুখের বিষয় মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না।

সেটা যে হচ্ছে না তার কারণ আজকালকার প্রথা মাফিক উভয় পক্ষেই কিছু কিছু মেয়ে-বরযাত্রী রয়েছে। তবে এরপর যা হল, আমার বিশ্বাস, সেটাও ঐ মেয়ে বরযাত্রী থাকার জন্যই। পুরুষ যে পুরুষই, সহজে হটবার পাত্র নয়, এ জ্ঞানটা আবার কাছে-পিঠে মেয়ে থাকলে যেমন উগ্র হয়ে ফোটে, অভাবে তেমন হতে পায় না। ইতিহাসেও এর নজীর আছে।

মোটের ওপর বেশ একরকম চলছিল, হঠাৎ একটা সামান্য ঘটনায় রংটা গেল বদলে। সেটা ঘটলও একেবারে আমার সামনে, একটা সীট বাদ দিয়ে। মেয়েদের সীট সবই ভর্তি, মাত্র এইটেই খালি থাকায় দুজন পুরুষ ছিল দখল

করে ; একজন যুবা, শিবপুরের বরযাত্রী দলের এবং অপরজন প্রৌঢ়। কি হল ঠিক বুঝতে পারলাম না, হয়তো গোলমালটা বরদাস্ত করতে না পেরেই তিনি—"নাঃ!" বলে হঠাৎ উঠে পড়ে বারমুখো হতেই পাশের যুবকটি হাত দিয়ে সীটটা চেপে সামনে একটু গলা বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"ওরে পচা, চলে আয়, খালি হয়েছে!"

"ধরে রাখবি!" বলে ওদিক থেকে সাড়াও এল, কিন্তু এদিকে বৌবাজার দলের একটি যে ছেলে পাশেই দাঁড়িয়েছিল খপ করে পড়ল বসে। সঙ্গে সঙ্গে—রসিকতারই মেজাজে রয়েছে সব, বেশ গলা চড়িয়ে একটা টিপ্পনীও কেটে দিল—"থাক, আর আসতে হবে না কষ্ট করে!" ঐটুকু নিয়ে গোলমালটা হঠাৎ থেমে গেল। তারপরেই শুরু হয়ে গেল।—

"একি রসিকতা হল?" শিবপুরের ছোকরা শিরদাঁড়া সোজা করে নিয়ে প্রশ্ন করল।

"মোটেই রসিকতা নয়।" নিরীহভাবে ভ্রূদুটো একটু কুঁচকে উত্তর করল অপর ছোকরা—"সীট খালি হয়েছে, বসে পড়েছি।"

"ছিল না খালি। এখনও আমার হাত দিয়ে চাপা রয়েছে। ও এসে বসবে।"

"সীট জিনিসটা বসবার, হাত দিয়ে চেপে রাখলে দখলীস্বত্ব এসে যায় না।" একটু উঠে পড়ে বলল—"নিন আপনার হাত টেনে।"

বাসটা হর্ন দিয়ে ছেড়ে দিল।

"নেভার! নিচ্ছি না আমি!"

"ইচ্ছে আপনার। তাহলে এই আমি আবার বসলাম।"

বসতে যাবে, হাত সরিয়ে দুহাতে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে রুখে উঠল ছোকরা। ততক্ষণে পচা নামে ছোকরাটিও "কি হয়েছে? কি হয়েছে রে?" বলতে বলতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসেছে। একটু বেশি ধূর্ত, কিম্বা হয়ে পড়েছে সন্ত্র সন্ত্র, প্রশ্ন করল—"কৈ আমার সীট?"

বেশ চড়া গলাতেই, কেননা ততক্ষণে সেই ক্ষণিক বিস্ময়ের স্তব্ধতাটুকু কেটে গিয়ে নানা কণ্ঠে নানা আওয়াজে সমস্ত বাসটা গরম হয়ে উঠেছে—"আলবৎ নয়!...আলবৎ! ঠেলে সরিয়ে দাও।...জানলা দিয়ে ফেলে বসে পড়... ইয়ার্কি! হাত চাপলেই দখল! মামার বাড়ির আবদার!"

—দূরে, কাছে। ভিড়টা কেন্দ্রমুখী হয়ে ঘটনার চারিদিকে জমাট বেঁধে উঠেছে। তার মধ্যে থেকেই ঠেলে বেরিয়ে এসে 'পচা' ছোকরা "কৈ আমার

সীট ?" বলে আর একটা পাক দিয়ে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করায় ধ্বস্তা ধ্বস্তিটা গেল বেড়ে একচোট।

"আপনার সীট এখানে নেই—ফিরে যান!"

"আলবৎ আছে—বন্ধু, নিজের সীট ছেড়ে দিয়ে এসেছি।"—ওরই মধ্যে একটু রসিকতা করে উত্তর দিল ছোকরা।

"বন্ধুত্ব ঘরে গিয়ে করুন, এখানে খাটবে না!"

"আমরা ঘরেই রয়েছি!"—সামনের দিকে কোথা থেকে ভেসে এল কথাটা —"মনে রাখবেন এটা হাওড়া-শিবপুর!"

সমর্থন হল—ঐ দিকেই কোথা থেকে—"এখনও পুল পেরুননি! মনে থাকে যেন!"

তার পরেও—"হাড়-কখানা এপারেই না রেখে যেতে হয়!"

পচা ছোকরার কাঠামোটা একটু হালকা গোছেরই, পিছলে পাছলে ভিড় ঠেলে আসবার যেমন সুবিধে, একটা বড় মোহাড়া নেবার মতো তেমন নয়। একরকম কথার জোরেই চালিয়ে যাচ্ছিল, সামনে—পেছনে থেকে সমর্থন পেয়ে আর একচোট তেড়ে উঠেছে, এমন সময় বাসটা মল্লিক-ফটকে এসে দাঁড়াতে হট্টগোল ছাপিয়ে আর একটা হট্টগোল উঠল—"মথুরাদা, এসে গেছে, হুররে! ব্যাস্ মথুরাদা!...চেপে দাঁড়িয়ে থাকবি পচা!...মোথ্‌রো! সোজা এইদিকে! ...এইখানে...বাসের মাঝামাঝি!..."

আমার পাশের ছোকরা পাঞ্জাবির গিলেকরা হাতা দুটো কোলে করে একটু জড়সড় হয়েই বসে ছিল, গা-ঝাড়া দিয়ে একটু চনমনে হয়ে বলে উঠল— "যাক্, নিশ্চিন্দি।"

নিজের মনেই।

প্রশ্ন করলাম—"কি ব্যাপার ?"

"আপনি থাকেন কোথায় ?" বিস্মিত প্রতি-প্রশ্ন হল। জানাতে বলল —"ও! তাই।...হাওড়ার চ্যাম্পিয়ন বক্সার। চুপ করে শুধু দেখে যান ক'পাটি দাঁত খসে এবার।"

ততক্ষণে উঠে পড়ে—"কি ?—কোথায় ?—কি ব্যাপার ?" বলতে বলতে একটা খসখসে আওয়াজ এগিয়ে আসছে। খসখসে হলেও কানে বেশ স্পষ্টই এসে পৌছুচ্ছে, তার কারণ, যেখান দিয়ে আসছে, অন্য সব গল্প একেবারে যাচ্ছে থেমে। দেখলামও। বরযাত্রীর পোশাক একেবারেই নয়। পায়জামা, গায়ে একটা গলাখোলা, হাত-কাটা বুশ-শার্ট, ছোট চুল, মোটা কাঁধ, বুকের

ছাতি, হাতের মাস্‌ল্‌গুলো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ডান হাতের কব্জিতে একটা চামড়ার ব্যাণ্ড শক্ত করে বাঁধা। খুব বেশি ধাক্কা-ধাক্কিও করতে হচ্ছে না, আমাদের পাশ দিয়ে একটু তেরছা হয়ে এগিয়ে গিয়ে হাত দুটো বুকে চেপে একবার ঘাড়টা ঘুরিয়ে নিল ; প্রশ্ন করল—"ব্যাপারখানা কি ?" একরকম ঠাণ্ডাই হয়ে গেছে বাসটা, একটু-আধটু মৃদুগুঞ্জন আর বাসের গতির শব্দ। এতক্ষণে শোনা যাচ্ছে একটু।

"দেখুন না মথুরাদা, পচাকে বসাবো বলে সীটটা ধরে রেখেছি তারপরে মল্লিক-ফটক এলে আপনি বসবেন, তা এ-ভদ্দরলোক কোন মতেই…"

"বুঝেছি…উঠে আসুন।"

বৌবাজারের ছোকরার দিকে চেয়ে ডান হাতের তর্জনীটা বেঁকিয়ে একটু নাচিয়ে দিয়ে বলল—"গেট্ আপ। কুইক্! অত সময় নেই আমার।"

এত সহজে কিন্তু মিটল না। দেখা গেল বৌবাজারও হজম করে নেওয়ার পাত্র নয়। যখন ভাবা গিয়েছিল একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেছে, ওদিক থেকে একটা আওয়াজ উঠল—"খবরদার উঠবি নে সতে !"

ওরা দলে ভারি, খেয়েদেয়ে তাকৎও হয়েছে, তা ভিন্ন নিশ্চয় কলকাতার দল বলে একটা মর্যাদাবোধও আছে হয়তো, হুঙ্কার দিয়ে বক্তার দিকে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কলরবটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। প্রথমে এদের, তার উত্তরে শিবপুর, তার প্রত্যুত্তরে আবার বৌবাজার—"মারো, কাটো !"—তারই মধ্যে বক্তা এগিয়ে এসে দাঁড়াল। মথুরাদার মতো অতটা না হলেও চেহারাটা আছে। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির মধ্যে নাম শুনলাম 'জটুদা'—বোধ হয় জটাধর হবে। মুখোমুখি হয়ে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল—"কী ভেবেছেন অপনারা বুঝিয়ে বলবেন ?"

."বলা হয়েছে বুঝিয়ে। জায়গাটা ছেড়ে দিতে হবে।"

"দেবে না।…চেপে বসে থাক তুই সতে।…কি করবেন আপনি ?"

"কিচ্ছু না। শুধু একটি ঘুষিতে দু'পাটি দাঁত খসিয়ে দেওয়া।"—সেটা যে ওর পক্ষে কত সহজ বোঝাবার জন্য ডান হাতের ঘুষিটা এগিয়েও নিয়ে গেল মুখের খানিকটা কাছাকাছি।

ওদিক থেকে হুঙ্কার উঠল—"খবরদার, মুখ সামলে।"

বোধ হয় বাক্‌-যুদ্ধের [illegible] জাতীয় কণ্ঠে একটু বিরতি এসেছিল, আবার নারকীয় কলরবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, বাসটা পরের স্টপ 'বঙ্গবাসী'তে এসে দাঁড়াল। আধ মিনিট, তারপরেই একটি মেয়ে ভিড়ের মধ্যে কিভাবে

রাস্তা করে নিয়ে এগিয়ে এল এবং একবার "Ladies"—লেখাটার ওপর চোখ তুলে নিয়ে সীটের দিকে দৃষ্টি নামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছিপছিপে ঋজুদেহ, একটু যেন লম্বাটে, মাথার চুলটা 'হর্স্‌টেল' করে ওপর দিকে টেনে বাঁধা। বাঁ হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, ডান হাতে একটা বেঁটে ছাতা। বসে থাকার জন্যে অনুযোগ নয়, ওঠার জন্যে অনুরোধও নয়, শুধু এসে দৃষ্টি নত করে দাঁড়াল সীটের সামনে।

মথুরাদার ঘুষি আলগা হয়ে ঝুলে পড়ল, জটুদার বাঁকা ভঙ্গিতে চিতোনো বুকটা সোজা, সহজ ভঙ্গি নিল। 'শিবপুর' 'বৌবাজার'কে বলল—"নিন, পাশ দিন।" 'বৌবাজারও' বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। সেই কেন্দ্রীভূত জমাট ভিড়টা ইতিমধ্যে পাতলা হয়ে গেছে, দুজনে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল।

মেয়েটি আস্তে আস্তে গিয়ে ছাতাটি কোলে করে সীটে বসে পড়ল।

বাস চলতে আরম্ভ করেছে। কন্‌ডাকটারের গলা শোনা গেল—"আপনাদের টিকিটগুলো এবার।"

লুচি পায়েস খেতেন

আমার এখনও বিশ্বাস আকাশের অবস্থাই ব্যাপারটুকুর জন্য দায়ী ছিল; একেবারে সম্পূর্ণ না হোক, বহুলাংশেই। কলকাতা থেকে কিছু দূরে একটা পাহাড়ে জায়গায় বায়ু-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সপরিবারে গিয়ে মাস চারেক হল রয়েছি। বেশ ফল পাওয়া গেছে। আহার, পরিপাক, মুক্ত আকাশের নীচে অবাধ ভ্রমণ, স্বাস্থ্যের সঙ্গে মনের প্রফুল্লতা—সব মিলিয়ে, জীবনটা যে বাঁচবার জন্য, বাঁচবার চিন্তা নিয়ে দুঃসহ কালাতিপাতের জন্য নয়, এই উপলব্ধিটা দিন দিন বেশ সহজ হয়ে আসছে। ছাড়া ছাড়া ভাবে দূরে-কাছে অনেকগুলি বাড়ি, দীর্ঘ প্রবাসের ফলে কিছু কিছু আলাপ পরিচয়ও হয়েছে, কয়েক বাড়ির সঙ্গে বেশ কিছু ঘনিষ্ঠতাও। ফলে, নিঃসঙ্গতার গুরুভারটা না থাকায় আরও বেশ হালকা মনে হয়। বেশ কাটছে।

আমরা এসেছিলাম শীতের শেষের দিকে। বসন্ত এবং গ্রীষ্ম কেটে গিয়ে, গোটাকয়েক হালকা বারিপাতে বর্ষাও তার আগমন বার্তা জানিয়ে গেছে।

বাসাটিও বেশ পেয়েছি। পল্লীর ভেতরে হয়েও বেশ একটু একান্তে। নিঃসঙ্গতাকে গুরুভার বলে বোধহয় একটু ভুলই করলাম। এক একটা সময়,

এক একটা পরিবেশ আসে যখন ঐ নিঃসঙ্গতাই হয়ে ওঠে পরম কাম্য ; মনটা এমন নিবিড়ভাবে নিজের সঙ্গী নিজে হয়ে ওঠে যে মাঝখানে আর তৃতীয় কারুর আবির্ভাব বরদাস্তই করতে পারে না। একটু একান্তে হয়ে আমার বাড়ির অবস্থানটুকুও এদিক দিয়ে বেশ অনুকূল। একটি অনতি উচ্চ টিলার ওপর। বাঁয়ে এবং সামনের দিকে জমিটা নেমে গিয়ে একটি ছোট পাহাড়ী নদীতে গিয়ে শেষ হয়েছে। বাঁয়ে নদী পেরিয়ে আবার কিছু বাড়ি, সামনে কিন্তু আমাদের লাইনের ক'টাই শেষ। নদীর ওদিকে অনেক দূরে দূরে আদিবাসীদের দুচারখানা করে ছাড়া ছাড়া ঘর, তারপরে একেবারে সাত আট মাইল পরে পূব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পাহাড়ের একটা টানা নীল রেখা।

আমার বাড়ির সামনের দিকে বেশ বড একটি গোল বারান্দা। বিকালবেলায় প্রতিবেশী কয়েকজন আমরা এইখানে একত্র হই এবং রোদটা ভালো করে পড়ে এলে বাইরে থেকে খানিকটা বেড়িয়ে এসে আবার খানিক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করে কাটাই। আজ সময় প্রায় হয়ে এলেও এখন পর্যন্ত কেউ আসেননি। মনে হয়, আসবেনও না কারণ হঠাৎ এক খণ্ড করে মেঘ এসে বার তিনেক যেমন জল ঢেলে গেছে তাতে একটা অনিশ্চয়তা এনে দিয়েছে আকাশ সম্বন্ধে। বেলা পড়ে এলেও কেউ আসেন না দেখে একখানি বই নিয়ে একাই বসে আছি, এক সময় চোখ তুলে দেখি, দক্ষিণের পাহাড ছাপিয়ে গাঢ়তর নীল রেখায় মেঘের স্তূপ কখন আকাশের বেশ খানিকটা ওপর পর্যন্ত উঠে এসেছে। একেবারে এ-মুড়ো—ও-মুড়ো। বিলম্ব হল না একটা যে ঝিরঝির হাওয়া বইছিল সেটা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল গতিবেগ। দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশটা গেল ছেয়ে এবং তারপর পাহাড থেকে নিয়ে চারিদিকের সব কিছু এক এক করে বিলুপ্ত করে দিয়ে মুষলধারায় বৃষ্টি নামল।

বর্ষায় সবারই মন খানিকটা অন্তর্মুখী করে তোলে, তবে আমার ক্ষেত্রে, কেন জানি না, হয়তো একটু বেশি। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছি নেশায় যেমন মনটাকে একটা পথ ধরেই চালিয়ে নিয়ে যায়, বর্ষার মাঝে পডলেও, যে খেয়ালটা মনে উদয় হল সেটা ধরে আমি যে কোথায় গিয়ে পড়ি তার যেন আর কোন হিসাবই থাকে না। আজ দৃষ্টির সামনে থেকে পৃথিবীটা যতই ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগল, ততই আমার নিঃসঙ্গ বুকে একটি আতুর বেদনা জেগে উঠতে লাগল যে, এই পৃথিবীর যথেষ্ট ভালো করা হয়নি আমার। কেমন একটা নিরুপায় অনুতাপের ভাব এসে মনটাকে বড়

অবসাদগ্রস্ত করে তুলল। মনে হল, এই যে দিগন্তব্যাপী অন্ধকার, সর্বগ্রাসী বর্ষার মধ্যে পৃথিবীর এই যে অবলুপ্তি, এ যেন আমারই মৃত্যু। আজ, কিছু না করতে পারার নিদারুণ খেদ নিয়ে আমায় এই সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে যার প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত আত্মদানের মহিমায় সমুজ্জ্বল।

ভেতর থেকে নাতনিটি বেরিয়ে এল। হাতে একটি মোটা সুজনী। বলল—"মা বললেন, এটা গায়ে দিয়ে ভেতরে এসে বসতে। ঠাণ্ডাটা ভালো নয়।"

ভালো না করতে পারার অনুশোচনা নিয়েই ওর কচি মুখখানির দিকে একটু চেয়ে থেকে বললাম—"নিজের কথা যে কাউকে ভাবতে নেই দিদি। বল গে দাদু বললেন উনি বেশ আছেন।…বরং এসো দিকিন কাছে।"

ওর মা ওর গায়ে একটি সোয়েটার চড়িয়ে ভালোভাবেই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, আমি কিন্তু তৃপ্ত না হয়ে সুজনীটা পাট করে ভালো করে জড়িয়ে দিলাম গায়ে। যা একটু আত্মত্যাগ করতে পারা গেল, যা একটু সান্ত্বনা। এর পর ওকে ফিরে যেতে বলে আবার তখনি কোলের কাছে টেনে নিলাম। না, এই তো এখনও উপায় আছে ; নিজের জীবনের ব্যর্থতা এদের জীবন দিয়ে পূর্ণ করতে হবে বলেই তো এদের পাঠিয়ে দেন ভগবান। বললাম—"একটা কথা দিদি, মনে করে থাকবে তো—দাদু যখন থাকবে না, তখনও…"

বছর আটেকের শিশু, দাদুর ভাবগতিক দেখে একটু যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে, বলল—"থাকবে মনে। কি কথা ?"

"নিজের কথা একটুও না ভেবে খুব ভালো করবে সবার। আচ্ছা তো ?"

কি ভেবে একবার সুজনীটার দিকে চেয়ে নিয়ে মাথাটা হেলাল। তারপরেই আবার প্রশ্ন করল—"দুষ্টু হলেও ?"

বুকে চেপে ধরে বললাম—গুরুপাক হয়ে যাচ্ছে জেনেও বললাম—"কে দুষ্টু কে লক্ষ্মী এক ভগবান ছাড়া আমরা কেউ যে বুঝতে পারি না সোন। আমার। চোখ বুজে শুধুই ভালো করে যেতে হবে…"

ওর মার গলা শোনা গেল। নিশ্চয় ব্যস্ত ছিলেন, হাতের পাট সেরে এগিয়ে আসছেন। ঘরের মধ্যে আমাদের না দেখে এবার আমাকেই একটা ডাক দিয়ে ত্রস্তভাবে বারান্দায় বেরিয়ে আসবেন, একটা বাধা পড়ল।

বৃষ্টির একটুও উপশম নেই। তারই মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে একটি লোক সামনের রাস্তা দিয়ে কুঁকড়ে-মুকড়ে যেতে যেতে আমার গেটের কাছে এসে একটু থমকে দাঁড়ালেন, তারপর একবার বাড়িটার দিকে চোখ তুলে দেখে নিয়ে গেট খুলে এগিয়ে এলেন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট, গায়ের রং উজ্জ্বল, মাথায় কাঁচাপাকা চুল

সমান করে ছাঁটা, বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন এইরকম হবে। গলায় ধপধপে এক গোছা পৈতে।

ভুঁড়িটা বেশ বড়ই। বিশেষ করে তাই থেকে এবং সাধারণভাবে সমস্ত চেহারা থেকেই মনে হয় ভদ্রলোক জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেই অভ্যস্ত। কিন্তু গোল বাধায় অন্য দিকে। ছাতায় রং-বেরঙের তিনচারটি তালি। গায়ের ফতুয়াটি ছেঁড়া; এক জায়গায় শেলাই করা, এক জায়গায় তাও নয়। পায়ের দুটো জুতোতেই তালি-মারা, হাতে যে একটি চটের র্যাশন ব্যাগ গোছের রয়েছে তার চেহারা দেখলে বোধ হয় না তার মধ্যে ভদ্রগোছের কিছু আছে। মোট কথা, চেহারার সঙ্গে এদিকের সমস্ত কিছুর এমন একটা অসামঞ্জস্য যে, দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই পারে না। মনে হতেই হয়, ভদ্রলোক কোন আকস্মিক বিপর্যয়ে যেন কোথা থেকে কোথায় হঠাৎ নেমে এসেছেন।

আগাগোড়াই ভিজে গেছেন। ছপছপ করে এগিয়ে এসে সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—"আসতে পারি আজ্ঞে?"

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, দাঁড়িয়ে উঠে ব্যস্তভাবে বললাম—"আসুন, আসুন, জিজ্ঞেস করতে আছে?"

উঠে এসে ছাতাটা মুড়ে থামে ঠেস দিয়ে রাখতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমি ততক্ষণে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছি। তাড়াতাড়ি হাত থেকে ওটা নিয়ে বললাম—"সে কি কথা! আপনি ভেতরে এসে চেয়ারে…না হয় দাঁড়ান একটু, আগে কাপড় জামা পালটে নিন। ইঃ, একেবারে ভিজে নেয়ে গেছেন!"

নাতনিকে বললাম—"আমার একখানা কাপড়, আর ফতুয়া জামা যা হয়।… হ্যাঁ, আর একটা তোয়ালে। যাও তো—শীগ্গির—লক্ষ্মী মেয়ে।"

কাপড়-জামা নিয়ে এলে ওকে চায়ের কথা বলে দিতে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলাম। একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছি; যে একদিন সুখের মুখ দেখেছে তার দারিদ্র্যকে উপলক্ষ করে সহানুভূতি দেখানও যেন শক্ত। কিছুক্ষণ কোন কথাই জোগাল না, চুপ করেই বসে রইলাম দুজনে। তারপর, কতকটা চুপ করে থাকার অস্বস্তিটা কাটাবার জন্যই বললাম—"বড় ভুল করেছেন; এই দুর্যোগে কেউ বেরোয়?"

একটা করুণ হাসি নিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বললেন—"বলেছেন যথার্থই। কিন্তু যার না বেরুলে দিন চলবে না সে কি করবে বলুন?"

ছ্যাঁৎ করে লাগল প্রশ্নটা বুকে। যেটা এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম সেইটেই

ঘুরে এসে পড়ায় আবার কোন্ কথায় কোন্ কোমল জায়গায় ঘা দোব এই আশঙ্কায় ফের খানিকটা চুপ করে বসে থাকতে হল। কিন্তু যেখানে ছিদ্রের পর ছিদ্র সেখানে ক'টার মুখ বন্ধ করব? নাতনি এসে বলল—"মা ওঁর কাপড় জামাগুলো চাইছেন, নিংড়ে উনুনে শুকিয়ে দেবেন।"

ওঁর মুখখানা যেন ছাইপানা হয়ে গেল, তবে এবার উনিই সামলেও নিলেন। নাতনিকে টেনে নিয়ে বললেন—কি হবে কষ্ট করে শুকিয়ে মা-মণি? বিষ্টি তো আজ থামবে না। এই একটু জিরিয়ে নিলুম, আবার তো বেরিয়ে পড়তে হবে।"

নাতনি ভেতরে কথাটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোঁড়া চাকরটা ট্রে করে চা-টোস্ট নিয়ে এসে পড়ায় এ অস্বস্তিটুকুও একরকম কেটে গেল।

কিন্তু, বলতে ভুলে গেছি, এসব ছোটখাট অস্বস্তি কোনরকমে কেটে গেলেও একটা স্থায়ীভাবই মনে জেঁকে বসেছে, কোন উপায়ও করা গেল না। ভদ্রলোক ভেতরে আসতেই চাইছিলেন না, তারপর যদি বা নিয়ে এলাম, কোন মতে চেয়ারে বসতে চাইলেন না, নিজেই একপাশ থেকে একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে আমার সামনাসামনি বসলেন, এমন কি একটা যেন পার্থক্য রক্ষা করেই। দারিদ্র্যের পেষণে নিজের পূর্বকথা ভুলে সেই দারিদ্র্যের সঙ্গে আপোষ করা, নিজের অবস্থাকে মেনে নিয়ে নতশিরে স্বেচ্ছায় নিজের সামাজিক স্তর থেকে নেমে আসার এই যে কম্‌প্লেক্স—এ যেন আরও করুণ। নিরুপায় হয়েই আমিও মেনে নিয়েছিলাম তারপর চা আসতে পরিস্থিতিটা একটু সহজ হয়ে এল।

ওঁর কথা ধরেই বললাম—"তা বলে এই দুর্যোগে সদ্য সদ্য আপনার বেরুন তো চলবে না। সন্ধ্যাও নেমে এল, আমরাই বা ছেড়ে দিই কি করে? আপনি তো শহরের দিকে যাচ্ছেনও না, সামনে নদী, টিলা, খাদ, পাহাড়।"

বেশ একটু জোর দিয়েই বললাম কথাগুলো।

চায়ে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে দিতে বাইরের দুর্যোগের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতেই চেয়েছিলেন, প্রশ্ন করলাম—"যাবেনই বা কোথায় আপনি?"

দৃষ্টিটা বাইরে থেকে ঘুরিয়ে এনে সেইরকম ম্লান হাসি হেসে বললেন—"তা—একরকম যেদিকে দু' চক্ষু যায়, ওফ্!"

আমি শিউরে উঠলাম। এক ধরনের সুবিধা পেয়েই এবার জোরের সঙ্গে একটু অনুযোগের সুর মিশিয়েই বললাম—"কিন্তু দু' চক্ষু অন্ধকারে আপনাকে নিয়ে যাবে কোথায় সেটা ভেবে দেখেছেন? না, যাওয়া আপনার কোন মতেই

হতে পারে না—আজ রাত্রে তো নয়ই। কাল তখন দেখা যাবে—সকালে বৃষ্টিটা যদি থামে।"

এবার উনিও যেন নিরুপায় হয়েই মেনে নিলেন কথাটা। ডান হাতটা একটু উলটে দিয়ে বললেন—"কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। কি আর করা যাবে?"

অকাল সন্ধ্যার পর অন্ধকারটা গাঢ় হয়ে আসার সঙ্গে দুর্যোগটা যেন আরও বিপুল আকার ধারণ করল। তাতে পৃথিবীটা আমাদের দুটির মধ্যে গুটিয়ে আসায় একটা ফল এই হল যে, ওঁর মনের কপাট খুলে গেল এবং আমারও প্রয়োজন মত প্রশ্ন করে মোটামুটি একটা পরিচয় জেনে নিতে বাধল না।

তবে মোটামুটিই। একটা যে গোপনের ইচ্ছা আছে সেটা টের পেয়ে আমিও বেশি কৌতূহল দেখিয়ে বিব্রত করার দিকে গেলাম না।

দেশেই জীবনটা কেটেছে, জমিজমা যা একটু ছিল তার ওপর নির্ভর করে। নানা সূত্রে তার প্রায় সবটুকুই খুইয়ে আজ প্রায় বৎসরখানেক চাকরি নিয়ে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। কি চাকরি প্রশ্ন করায় সেটা এইভাবেই চাপা দিলেন যে, বয়সকালের চাকরি, অভাবগ্রস্ত হয়ে যখন যেটা পান সেটাই ধরেন, তবে মনের অবস্থার জন্যই হোক বা দুরদৃষ্টের জন্যই হোক ধরে রাখতে পারেন না। এই আজই একটি স্ব-ইচ্ছাতেই ছেড়ে দিয়ে মনের দুঃখে বৃষ্টি বাদল মাথায় করে বেরিয়ে পড়েছেন।

বলতে বলতেই এক সময় মনটা অতিরিক্ত দ্রব হয়ে উঠে চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। এরপর কোঁচার খুট দিয়ে চোখ মুছতে গিয়ে ভেঙেও পড়লেন, ধরা গলায় একটু উচ্ছ্বসিত স্বরেই বলে উঠলেন—"বড় নাকি শৌখীন খাইয়ে, লুচি-পায়েস ভিন্ন মুখে কিছু রুচত না, তারই এই সাজা—আজ ক'দিন থেকে…"

উঠে গিয়ে পিঠে হাত দিলাম। বললাম—"চুপ করুন। আসে এক একটা সময় এরকম, আবার তাঁর দয়ায় কেটেও যায়। কথায় বলে, যে খায় চিনি, তাকে জোগান্ চিন্তামণি। আবার হয়তো আসবে ফিরে ভোগের দিন…"

সান্ত্বনার কথা, ফিরে আসবে কি না আসবে কে এমন দৈবজ্ঞ আছে যে খড়ি কেটে বলতে পারে? তবে আমার মনে তখন সার্থকতার উন্মাদনা। যদি বলি যে আমার তখন দৃঢ় বিশ্বাস, দূর অতীতের পৌরাণিক উপাখ্যানের মতোই আমার ঠাকুর ছলনা করে আমার সেবা নিতে এসেছেন তো বিশেষ ভুল হয় না। সে-রাত্রে অশেষ শ্রদ্ধা আর নিষ্ঠার সঙ্গে আমি তাঁর উপযুক্ত ভোগেরই ব্যবস্থা করলাম। লুচি, প্রচুর ঘৃত-তৈল-পক্ক ব্যঞ্জন, পায়স, মোহন-

ভোগ, ছানা কাটিয়ে সন্দেশ। বর্ষায় মনটাকে অন্তর্মুখী করে দিয়ে যেমন বিষাদময় করে তুলেছিল—জীবনে কিছু করা হল না বলে, তেমনি একটি রাত্রের নিরন্ধ্র সেবায় সে আপসোসের যতটা পারলাম নিলাম মিটিয়ে।

শুধু আহার দিয়েই নয়। আরও অনেক কিছু। উনি সকালে যখন আমার বাসা ছেড়ে গেলেন, তখন পায়ে এক জোড়া আমার প্রায় নূতন জুতা, ডান হাতে আমার প্লাসটিকের বাঁটের ছাতা, বাঁ হাতে একটি ফুলকাটা ভালো ক্যাম্বিসের থলিতে একটি ধুতি, একটি রেশমের পাঞ্জাবি, যে তোয়ালেটা দিয়ে গা মুছেছিলেন সেটি, পরনে আমার সেই ধুতি, গায়ে সেই জামা, এবং তার পকেটে গুটি দশেক টাকা। সম্বল, যতদিন না মনোমত আবার একটা কাজ পান।

একটা কথা বলা হয়নি। আমি যাই করতে গেছি, যাই দিতে গেছি তাতে অনিচ্ছার ভাব দেখালেও শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক বিষয়েই রাজী হয়ে গেছেন।

এবং এ-কথা না বললেও সত্যকে গোপন করা হবে যে, দু-একটা ব্যাপারে এও মনে হয়েছে অমন শতকরা শতভাগই রাজী না হয়ে যেমন অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সেটা জিদ করে ধরে থাকলেই যেন, অন্তত বেশ শোভন হত। যেমন, প্লাসটিকের বাঁটের ছাতাটা। জিনিসটা পছন্দ করে কেনা ছিল আমার। ব্যাগের মধ্যেকার সিল্কের জামাটাও। আমার সেবার আকাঙ্ক্ষা মিটবে, অথচ যাঁকে দিলাম তিনি যে কত মহৎ কত নির্লোভ এই তৃপ্তিটাও থাকবে মনে, এই ভেবেই বাড়িয়ে ধরেছিলাম।

সেটা যে ওঁর পক্ষে কত অসম্ভব তা টের পাওয়া গেল তার পরের দিন বিকালে। যখন রামপ্রাণবাবু এলেন।

বামপ্রাণবাবুব সঙ্গেও এইখানেই পরিচয়। আমি যেমন থাকি শহরের এই প্রান্তে উনি তেমনি থাকেন একেবারে অন্য প্রান্তে ; ঐ জন্য ওঁর বাড়িতে যাওয়া খুব কম হয়েছে, তাই চার মাসের মধ্যে মাত্র দিন দুয়েক। উনি চাষাড়েও নন আমার মতো, এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। পরিবারটিও বড। এবং বেশ সম্পন্নও। আজকের বিকালটি একেবারে পরিষ্কার, কালকের সঙ্গে কোন মিল নেই। কাল বৃষ্টিতে উষ্ণতার ভাবটা কেটে গিয়ে আকাশ-বাতাস বেশ স্নিগ্ধ। কিছু একটা করতে পারায় আমার মনের সঙ্গে এই স্নিগ্ধতার বেশ একটি যোগসূত্র অনুভব করছি ; নাতনিটিকে কোলের কাছে নিয়ে একটা ইজিচেয়ারে বসে আছি বারান্দায়। কালকের ব্যাপারটুকুর আলোচনা চলছে আমাদের।

সমস্ত বিষয়টি ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট করাবার চেষ্টা করছি এমন সময় রামপ্রাণবাবু একটু হন্তদন্ত হয়েই গেট খুলে প্রবেশ করলেন। তারপর মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সামনে-পাশে কিসের খোঁজে যেন দেখতে দেখতে বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন—"এখান থেকেও ভেগেছে ব্যাটা ?"

ওঁর ঐরকম ; একেবারে মাঝখান থেকে আরম্ভ করেন। বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলাম—"কার কথা বলছেন ?"

কোন উত্তর না দিয়ে উনি উঠে এসে বারান্দার এককোণে গিয়ে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়ালেন। হাতে একটা লাঠি থাকে, আজ রীতিমতো একটা লগুড। কাল দুর্যোগে বাইরে এসে আগন্তুকের জুতো ছাতা আর চটের থলিটা সরানো হয়নি, লগুড়টা দিয়ে নাড়তে নাড়তে বললেন—"এই যে, ভুল হওয়ার নয় তো! সেই মার্কা মারা জুতো, সেই ব্যাগ, সেই রাজছত্র!"

তারপরেই আমার দিকে ঘুরে চেয়ে লগুডটায় একটা কড়া ঝাঁকুনি দিয়ে অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন—"ইস! জ্যান্ত ছেড়ে দিলেন মশাই ?"

কিছু একটা আন্দাজ করে নাতনিকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিলাম, বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। বললাম—যাও তো দিদি, জ্যাঠামশাইয়ের জন্যে চা নিয়ে এসো। তোয়ের করিয়ে একেবারে নিজের হাতে করে নিয়ে আসবে।"

এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসতে বসতে উনি বলে চলেছেন—"এ দুনিয়ায় কারুর ভালো করতে নেই মশাই। বাড়িতে অষ্টরম্ভা—খেতে পেত না, এইরকম ডিগডিগে চেহারা (ডান হাতের তর্জনীটা নেড়ে)—এসে দাঁড়াল—একটা চাকরি—যে কোনও—কোদাল তামা থেকে। গলায় পৈতে (কে জানে সেটাও ভড়ং কিনা)—কি কাজ দোব, বললাম, তাহলে পারিস তো না হয় হেঁসেলটা সামলে দে খানিকটা। মাস পাঁচেকও যায়নি মশাই—দেখতে দেখতে সেই প্যাকাটির মত শরীর লাল হয়ে উঠল—ভুঁড়ি গজিয়ে, কাঁধে মাংস নেমে একশা! গিন্নি বলেন—হবে না কেন—কাজের ঢেঁকি, পিঁড়েয় বসে ঢুলবে—এদিকে ভাত বেড়ে নেবে—একটা বেড়াল ডিঙোতে পারে না। বলি আহা, এক মুঠো খায়—বামুন মানুষ—ওদিকে নজর দিতে নেই। দিন দিন তিলভণ্ডেশ্বর হয়ে উঠছে মশাই—লাগছেই সবার নজর, কিন্তু একটুও টসকাতে চায় না। মেয়েলি কথা একটা—আলোচনা হয়ই বাড়িতে—ঘি-দুধেও এদিকে কারুর গায়ে একটু গত্তি লাগে না—আর ওর শুধু ভাতের জোরে—না হয় এক মুঠো বেশিই খায়—তারপর এতদিন বাদে কাল পড়ল ধরা···লিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ, আন্দাজ করুন তো কি ব্যাপার।"

সে চেষ্টা করবার মতো মনের আর অবস্থা নেই। একটু বিমূঢ় হাসি হেসে বললাম—"ব্যাপার কি ?"

"বাড়িতে লক্ষ্মী-নারায়ণ আছেন মশাই (কপালে জোড়হস্ত ঠেকিয়ে—'উঃ, পাজাল ব্যাটা!')—নিত্যি ভোগটা হয়। কবে থেকে টের পায়নি তো কেউ—একটু করে ক'মে এসেছে—লুচি, হালুয়া, পায়েস, ক্ষীর—গেরস্থ আবার ভাড়ার থেকে পুষিয়ে-পুষিয়ে গেছে—ভোগের জিনিস, মেয়েরা আবার ওদিকে হিসেবের কড়াক্কড়ি রাখতে চায় না তো—তারপর এই কালকে গিয়ে—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে তো…"

মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, একটা ক্রূর হাসি নিয়ে। অপ্রতিভ স্বরে প্রশ্ন করলাম—"পড়ল ধরা শেষ পর্যন্ত ?"

"পড়ত ? রাঁধতে রাঁধতে এক ফাঁকতালে আউট হাউসে নিজের ঘরে বসে কাজ সেরে আসছে—সেই কবে থেকে কে জানে—বাদলা দিন, খিঁচুড়ির ব্যবস্থা হয়েছিল—ধরে গিয়ে গন্ধ বেরুতে খোকা ডাকতে গিয়ে ছাখে, দিস্তেখানেক লুচি, তদনুরূপ হালুয়া, পায়েস, ক্ষীর, গোটা তিনেক সন্দেশ নিয়ে গুছিয়ে বসেছে—খিঁচুড়ি মাথায় থাক—তাড়াতাড়ি ছুটে এসে খবর দিয়েছে—কিন্তু, যেতে যেতে ততক্ষণে উধাও—সে আর চৌহদ্দির মধ্যে থাকে ?… "

"সাংঘাতিক মানুষ তো!"—শুষ্ককণ্ঠে সায় দিতে হয়।

"আমি ওর চেয়েও সাংঘাতিক মানুষ মশাই—আমার নাম রামপ্রাণ দস্তিদার"—লগুড়টা বাগিয়ে ধরে বললেন—"সমস্ত দিন খুঁজেছি ব্যাটাকে তন্ন-তন্ন করে, শেষে টের পেলাম, কাল সন্ধ্যেয় ঐ ধরনের একটা লোক নাকি বৃষ্টি-বাদল মাথায় করে আপনাব বাসায় ঢুকেছে—ফাঁসির আসামী, তার আবার বৃষ্টি-বাদল!—তা দেখছি লিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ, আপনাকেও ধাপ্পা দিয়ে…" —এবার একটু ব্যঙ্গস্বরেই।

বললাম—"এসেছিল—হয়েছিলও খানিকট' সন্দেহ বৈকি—হবেই 'কিনা—অমন লাস, এদিকে জামা কাপড়ের ঐ অবস্থা—তবে যা দুর্যোগ—কখন বাড়ি থেকে এক মুঠো চেয়ে কি খেয়েছে—কখন চলে গেছে অত খেয়াল করিনি…"

আরও সাফাই গাইতে যাচ্ছিলাম, নাতনি এসে পড়ায় তাকে কি করে ওদিকে আটকে রাখা যায়—এই চিন্তার মধ্যে কথাগুলা এই পর্যন্ত এসে আটকে গেল।

হারানো স্থর

রবিবারের সকাল। মেসের বড ঘরটায় সবাই জটলা করছে। রণদা, হারু, দ্বিজেন, ঋষি এবং অনাদি। বেহারের একটা মফঃস্বল শহরে বাঙালী যুবকদের ছোট মেস, ছয়জন মেম্বার, কেউ মাস্টার, কেউ ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান, কেউ কেরানি, কেউ বিশেষ কিছু নয়। রবিবারের মজলিসে উপস্থিত নেই শুধু বিমান। ওর বাড়ি পাশেই আর একটা শহরে। রবিবার বা অন্য ছুটির দিনে থাকে না, সকালের গাড়িতে চলে যায়, তারপর আবার দশটার গাড়িটাতে এসে অফিস করে। সেই গেছে।

একটা খবরের কাগজের পাঁচখানা পাতা পাঁচজনের হাতে। পডছে না কেউ। অনাদির হাতের পাতাটায় পাকিস্থান নিয়ে সম্পাদকীয় স্তম্ভ; তাই কেন্দ্র করে আলোচনাটা জোরদার হয়ে উঠেছে, ঋষি হাত ঘডিটা দেখে বলল—"হয়েছে, আর নয়, ন'টা বাজে। কে কুটনো কুটবে, কে মসলা বাটবে, কে উনুন ধরাবে, কে রান্নার দিকে যাবে ঠিক করে ফেলো, নৈলে কপালে আজ হরিমটোর।"

কাল ঝি-মাগিটা বাড়ি যাওয়ার সময় মাথা ধরার জন্য খুঁতখুত করতে করতে গেছে। এখনও আসেনি; তার ওপরে পাচকঠাকুরও কোঁ কোঁ করতে করতে বিছানা নিয়েছে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জাটা আত্মপ্রকাশ করছে শহরে।

ঋষির কথায় সবাই একটু হট্টগোলের সঙ্গেই গা-ঝাডা দিয়ে উঠবে, একটি স্ত্রীলোক একটি আন্দাজ বছর চারেকের ছেলের হাত ধরে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। বিধবা, আধঘোমটা দেওয়া। ছেলেটির পরনে একটা হাফ্‌ প্যাণ্ট আর হাফ্‌ শার্ট। খুব ছেঁড়া বা অপরিষ্কার নয়।

ঐ হট্টগোলটা একটু অন্যদিকে ঘুরে গেল—

"ঐ নাও, পাকিস্থান সশরীরে!...আর কত পারে লোকে বলো বাছা, নিত্যিই এসে জুটছে।...খেটে খাও না কেন? ঐ তো দেখছ, সিন্ধী-পাঞ্জাবীরা...দেখেও শেখে!"

খুব রূঢ় না হলেও বিরক্তি ফুটে বেরুচ্ছে কথায়। নিত্যকার ব্যাপার, তার ওপর মেজাজও ঠিক নেই কারুর আজ। স্ত্রীলোকটি একভাবেই দাঁড়িয়ে আছে

দৃষ্টি নত করে। ছেলেটির দৃষ্টি ওর মুখের ওপর, মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে নিয়ে কারুর কারুর ওপরে ফেলছে। দ্বিজেন বেরিয়ে আসতে আসতে গলাটা নরম করে নিয়েই কি বলতে যাচ্ছিল, হয়তো অন্য সময় আসবার কথা, এমন সময় হট্টগোলটা আবার একটু মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—"ঝি এসে গেছে!...বিল্টার মা এসে গেছে!...তুম হামসাবকো বাঁচায়া বিল্টার মা!...এত্তা দেরি কাহে কিয়া—হাম সাবকো ধড়মে প্রাণ নেহি থা!...কেয়সা হ্যায় বিল্টার মা..."

হারু বলল—"তা হলে তুই রেঁধেও দে বাছা—আজ জাত-জাত করলে আর চলে না। আজ ঠাকুর বিমার পড গিয়া।"

"তাহলে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে।"—দ্বিজেন মন্তব্য করল। ঝিকে বলল—"তোম সব কাম ছোড়কে পয়লা চুল্হাঠো ধরায়ে দেও।"

ওদিক থেকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়ায় স্ত্রীলোকটিকে বেশ ভদ্রভাবেই বলল—"আপনি তাহলে ওবেলায়ই আসুন একবার। দেখি কতটা কি করতে পারি। দেখতেই পাচ্ছেন বড বিব্রত রয়েছি এখন—বাজার-হাট কিছুই হয়নি, তার ওপর আজ আবার হেঁসেলও ঠেলতে হবে।"

"আপনাগোর ঠাকুর অসুস্থ হৈয়া পডছে?"—প্রশ্ন করল স্ত্রীলোকটি। এই প্রথম কথা।

দ্বিজেন বলল—"হ্যাঁ। দেখুন না নিগ্রহ।" দুটো কথা বাডিয়েই বলল। চুপ করে একবার মেসটার ওপর নজরটা বুলিয়ে নিয়ে কি যেন একটু ভাবল স্ত্রীলোকটি, তারপর কুণ্ঠিতভাবে বলল—"আমি রাইন্ধা দিলে খাইবান?" প্রশ্ন, তবে একটা অদ্ভুত অনুনয়ের ভাব ফুটে উঠেছে, যেন এতবড একটা অনুগ্রহের আশাই করতে পারছে না।

সবাই দোরের কাছেই জড়ো হয়ে রয়েছে, পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। স্ত্রীলোকটি বলল—"আমি বৈদ্য।"

হারু বলল—"না, জাতের কথা এমনি বলছিলাম। তা আপনি আবার কষ্ট করতে যাবেন কেন? অযথা সময় যাবে তো?"

"আমার আবার সময়!"—একটু ম্লান হাসল স্ত্রীলোকটি।

অনাদি পেছনের দিকে ছিল। মুখটা একটু দ্বিজেনের দিকে বাডিয়ে এনে চাপা গলায় বলল—"দিন; কতদিন যে বাড়ির রান্না খাইনি।"

ঋষি বলল—"তা, উনি যখন নিজেই বলছেন।"

"মন্দ কি?"—দ্বিজেন বলল, "ছেলেটিও রয়েছে—দুজনে এক মুঠো করে খেয়ে যেতে পারবেন। ততক্ষণ আমরাও না হয়..."

রণদার দিকে চাইতে সে বলল—"হ্যাঁ, কাছাকাছি একটু ঘুরে যদি কিছু তুলতে পারি…"

"অ ঝি, তুমি করো কি! রও, আমারে আইস্‌তা দ্যাও"—হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে বারান্দার ওদিকে ঝিকে উদ্দেশ করে বলে উঠল স্ত্রীলোকটি, সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্নভাবে এদের মধ্যে থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এগিয়ে চলল।

নীচে দোকান, ওপরতলায় সারি সারি তিনখানা ঘর আর একটা চওড়া বারান্দা নিয়ে মেস। বারান্দার এক প্রান্তে একটুখানি জায়গা ছ্যাঁচা বেড়া দিয়ে ঘিরে রান্নাঘর। দরজা নেই, প্রায় সমস্তটাই খোলা, একদিকে দেয়াল ঘেঁষে পাশাপাশি একজোড়া উনুন। ঝি একটা ঝাঁটা বুলিয়ে পরিষ্কার করতে যাচ্ছিল, নজর পড়ায় ছুটে এসেছে স্ত্রীলোকটি। দাঁড়িয়ে পড়ে একটু কর্ত্রীত্বের টোনেই বলল—"ওকি, উনানে ঝাঁটা দ্যাও কেন্?"

ঝি বুড়ি গোছের। হঠাৎ এভাবের তম্বিতে যতটা না বিস্মিত হয়েছে তার চেয়ে বেশি বিরক্ত হয়ে উঠেছে, নিজের ভাষাতেই জানাল, "কেন, হয়েছে কি? ঝাঁটা না বুলিয়ে পরিষ্কার করা যাবে কি করে?"

"তুমি সরো গিয়া, সইরা আইস। আমি বাৎলায়ে দিচ্ছি, কেমন কৈরা অইব…"

এত আকস্মিক সমস্তটুকু যে ওরা খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল, তারপর হয়তো পাগল বা ঐরকম কিছু মনে করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। দ্বিজেন বলল—"ঐভাবেই করে ও, মেসই তো।"

"তা হোক্ মেস। উনানে ঝাঁটা দিলে মা-লক্ষ্মী ছাইড়া যান। তুমি খানিকটা ভালো মাটি গুইল্যা আনো ঝি, আমি বাৎলায়ে দিচ্ছি।…তোমরা যাও গিয়া আপন আপন কাজে। বাজার আনবে কইছিলে না? মাছ বেশি কৈরা আনবা—মুসুর দাইল, ধনেশাক—একটা নারিকেল—কাঁচা মরিচ…"

"আজ্ঞে, আমরা লঙ্কা বেশি খাই না"—ভয়ে ভয়ে বলল রণদা—"আর তরকারিতে ধনেশাক…"

"তোমরা আনো গিয়া ধন আমার। যা কইছি শোন। তোমাদের পেটে মরিচ সয় না আমি জানি। যাও গিয়া বেলা হইছে।" ঝিয়ের দিকে চেয়ে আবার সেই কর্ত্রীত্বের টোন ফিরিয়ে এনে বলল—"তুমি হাঁ কৈরা দাঁড়ায়া করো কি? বুড়া হইছ, উনানে ঝাঁটা দিলে মা-লক্ষ্মী ছাইড়া যান জ্ঞান নাই! যাও,

আনো গিয়া মাটি গোলা। উনিকে আগলায়া-আগলায়া রাখতে হয় ; অনাচার সইবার মাইয়া উনি ?"

গুটি ছয়েক পুরুষের নিতান্তই শ্রীহীন আবাস একটি ; ঘণ্টা তিনেক যে ছিল, মা লক্ষ্মীকে ডেকে এনে যেন সত্যই আটকে রাখল স্ত্রীলোকটি। ফরমাশ করে করে আরও সব জিনিস আনাল বাজার থেকে। একটা রহস্য অবশ্য লেগেই রইল—উদ্বাস্তু, হয় তো একটু মস্তিষ্ক-বিকৃতি—হতে পারে, সুযোগ পেয়ে একদিন একটু সাধ মিটিয়ে খাওয়ার লোভই, বাচ্চাটিও তো রয়েছে সঙ্গে—কিন্তু মস্তিষ্ক-বিকৃতির খারাপ রকম কিছু নয় দেখে ওরাও নির্বিচারেই জোগান্ দিয়ে গেল। রবিবারের বাজার, পূর্ববঙ্গের বিচিত্র রন্ধন-শৈলী—মাছেরই কয়েকটি পদ—চুকা ডাল, তিতা ডাল, সমস্ত মেসটি গন্ধে ম-ম করছে—তারই মধ্যে একটি সুমিষ্ট প্রত্যাশার সঙ্গে ওদের এই রহস্যময় শুভ আবির্ভাব নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল।

শ্রী বা লক্ষ্মী শুধু রন্ধনশালাতেই নয়। একবার এক ফাঁকে, হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে এসে দোরের সামনে দাঁড়াল। এ ঘরটি বড, তিনটে সীট, চৌকিতে অগোছালভাবে বিছানা পাতা, তিনটি টেবিল, তিনটি আলনা—তাদেরও অনুরূপ অবস্থা। একবার দেখে নিয়ে গোছাতে আরম্ভ করে দিল, নিজের মনেই, তবে নীরবে নয়। মুখভার করে মৃদু অনুযোগ—এভাবে থাকতে আছে ? বেটা ছেলেরা পারে না, কিন্তু ঝিমাগীটা করে কি ? এই তো তিনটি ঘর, এক চিলতে বারান্দা। না পারে, অন্যমানুষ রাখতে হবে···

বিছানা পর্যন্ত ঝেড়ে-ঝুড়ে ঠিক করে দিয়ে প্রশ্ন করল—"পাশের ঘরটা কার ?"

ঋষি অনাদিকে দেখিয়ে বলল—"আমি আর এ থাকি।"

"আইস গিয়া একজন, ঠিক কৈরা দিই। এমন কৈরা থাকে না, মা-লক্ষ্মী গোসা করেন।"

"আপনি গিয়ে দিন না গুছিয়ে। আমি তো বলি দরকারই বা কি ?"—ঋষি বলল।

"এই দেখো, ছেলে কয় দরকার কি। না, ওঠ, আইস। কোথাকার কে তাকে ঘর ছাইড়া দিবে ক্যান্ ? তোমাদের বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম বাবা, একথা আমি অবশ্যই কইব। ন্যাও, আসো।"

পরের ঘরটিও। ঐ রকম ডেকে নিয়ে। কেউ 'বড় ছেলে' কেউ 'মেজো

ছেলে'। কাব্বর বা শুধু নামটা। কাউকে কিছু বাজারের ফরমাশ করে, কাউকে হেঁসেলে ডেকে কিছু চাকিয়ে বেশ একটু কর্ম-চঞ্চলতা এনে ফেলল। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝিয়ের ওপর তম্বি; ছেলেটি চঞ্চল, সাদামাটা মেসের মধ্যেও শিশুসুলভ খেলায় যে বিশৃঙ্খলা এনে ফেলছে তার জন্য তিরস্কার—সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ সংসারের ছোট একটি হরিৎ-কেন্দ্র জেগে উঠল মেসের মরুবক্ষে।

মাত্র ঘণ্টা তিনেক। রান্না শেষ হলে আবার এসে খানিকটা বকাবকি—"এখনও স্নান হয়নি কারুর? শরীর খারাপ অইব যে!"

"আমাদের শরীর খারাপ হয় না। মেসের জীব।"—হেসে বলল দ্বিজেন।

"শোন কথা বড ছেলের। ওনাগোর লোহার শরীর। কত যে লোহার শরীর তা চক্ষু দিয়া দেখছি না তো। যাও গিয়া সব, অবাধ্য হইবা না। আমি পোলাটারে খাওয়াইয়া লই। কি কও?"

"আপনিও খেয়ে নিন না। সকাল থেকে কিছু মুখে দেওয়াতে তো পারলাম না।"—হারু বলল।

"কি ক'স্ তরা! তোগোর পেটে ভাত নাই, আমি গরাস তুইল্যা খাবার লাগমু!"

একটু হেসেও ফেলল প্রস্তাবটার বৈচিত্র্যে। নাওয়ার তাগাদা দিয়ে ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে রন্ধনশালার দিকে চলে গেল। এক ফাঁকে ওর স্নানের ব্যাপারটা সেরেই রেখেছিল।

প্রচুর এবং রুচিকর ব্যঞ্জন-সংযোগে আহার পর্ব নিষ্পন্ন করল সবাই। সবটুকুকে আরও রুচিকর যা করে তুলল তা একটি মায়ের প্রাণ—উপরোধে, অনুরোধে, এমন কি মৃদু ভর্ৎসনার মধ্যে দিয়ে সে প্রাণ নিজেকে ব্যক্ত করে ধরল—"হ্যাঁ, আরও লাগব—একটু দিই চুকা দাইল; তোমারে একটু চিডামুড়া না খাইলে শরীর থাকব কেমন কৈরা—লোহার শরীর যে কইতেছ?"

উপরোধ-অনুযোগ-ভর্ৎসনা, সেও কিন্তু একটু অপরূপ প্রফুল্লতার মধ্যে, যেটা রান্নাঘরে প্রবেশ করা থেকে শুরু করে সমস্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেই ওর মুখটাকে উজ্জ্বল করে রেখেছিল। ওদের খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেটা যেন লুপ্ত হয়ে গেল।

ওরা সেটা টেরই পেল না বলা চলে। কারুর নজরে যদি একটু ধরা দিয়েই থাকে পার্থক্যটা তো ভূরিভোজনের পর ভোজনের কথা নিয়েই যে আলোচনা চলল তার মধ্যে সেটা তলিয়ে গেল।

বেশ ভালো করেই নিজেদের মধ্যে একটা চাঁদা তুলল। বিকালে ওকে নিয়ে বেরুবে সবাই। বড় ঘরটার মধ্যে পান সিগারেটের সঙ্গে চলল জল্পনা-কল্পনা। কিন্তু আর পাওয়া গেল না ওকে।

ওঃ আহারের জন্য সম্ভবমতো সময় দিয়ে দ্বিজেন বাইরে এসে দেখল, রান্নাঘরে নেই। ঝি অনেক আগেই কাজ সেরে চলে গেছে। উদ্বৃত্ত অন্নব্যঞ্জন সব যেমনকার তেমনি পড়ে আছে।

ওপরে খোঁজ করবার মতো অলিগলি, কোণকোণ কিছু নেই। ওরা নীচে নেমে কাছে-পিঠে খুঁজল। নেই দুজনের কেউ। বিকালে মেসে তালা দিয়ে ওরা শহরের বাঙালী অঞ্চলগুলো ভালো করে গিয়ে খুঁজল। কোথাও, কেউ আসেনি ওরকম।

সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে বড ঘরটায় সবাই বসে ছিল। মনটা বড অবসন্ন হয়ে রয়েছে। শুধু তো বেদনাই নয়, একটা অসমাহিত রহস্যেরও ভার। এভাবে হঠাৎ না খেয়ে, কিছু সাহায্য না নিয়ে চলে গেল কেন? পাগল? তাহলে যে ছেলেটির জন্য মনটা আরও টনটন করে ওঠে।

বিমান এসে উপস্থিত হলো। প্রশ্ন করল—"তোমরা এমনভাবে বসে যে? আমার আজকেই চলে আসতে—" সঙ্গে সঙ্গেই নিজের কথা চাপা দিয়ে বলল—"আচ্ছা, সকালে একটি স্ত্রীলোক এসেছিল? এই ধরো বছর পঞ্চাশ বয়স, সঙ্গে একটি ছোট ছেলে।"

"হ্যাঁ, এসেছিল···কেন বল তো?···জান কিছু তার সম্বন্ধে?"—সবাই উদ্বিগ্নভাবে জডাজডি করে প্রশ্ন করল।

"স্টেশনে ওয়েটিং রুমের বাইরের বেঞ্চটায় বসে ছিল। বড মর্মান্তিক কাহিনী হে, একটি ভরা সংসারের সবাইকে খুইয়ে ঐ একটি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে কোন রকমে এসে উপস্থিত হয়েছে পূর্ববঙ্গ থেকে। আমার কাছে বিশেষ কিছু ছিল না। দুটি টাকা, সে দুটি দিয়ে মেসের ঠিকানা বলে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তোমরা কিছু তুলেও দিতে পারবে ভেবে।"

"সেই চেষ্টা করছিলাম। সে কিন্তু অপেক্ষা না করে হঠাৎ কখন চলে গেল।"

"তার মানে?"

সব কথা শুনল বিমান। তারপর ওদের মতোই খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, "আমার কি মনে হয় জান?"

কোন প্রশ্ন না করে সবাই মুখ তুলে চাইল ওর দিকে।

বিমান বলল—"ঐটুকুর মধ্যে কতদিনের হারানো যে জিনিসটা পেল, টাকা নিলে সেটার অমর্যাদা করা হত না ?"

"অমর্যাদা ?...কেন ?...টাকা নিলে দোষটা...কিছু তো খেলেও..."

—সবার প্রশ্ন-মন্তব্য কিন্তু অসম্পূর্ণই রয়ে গেল মুখে। একটা বিষন্ন মৌন নেমে এলো ঘরটাতে। বিমানের কথাক'টা আস্তে আস্তে রহস্যটার ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে নিচ্ছে।

আমার চোর বেঁচে থাক

ঘুম ভেঙে সবে চোখ মেলেছে সাধুচরণ ঘরের এক পাল্লা দরজা ক্যাঁচ্ করে একটা শব্দ করতে করতে হাওয়ায় আস্তে আস্তে খুলে গেল।

খুব ভোরেই ওঠা অভ্যাস, এখনও একটু একটু অন্ধকার লেগে রয়েছে। সাধুচরণের ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল। ওই হিসেবপত্র সেরে সব শেষে শোয় দরজা বন্ধ করে দিয়ে। তাহলে কি ভুলে গিয়েছিল কাল ? স্মৃতির সূত্র ধরে আস্তে আস্তে এগুতে লাগল। ক্যাশ এনে দরজা বন্ধ করে লোহার সিন্দুকে তুলেছে, ঘুনসিতে চাবির থোলোটা ঝুলিয়েছে। আহার করে তামাক খেয়ে খেরোর খাতা নিয়ে বসেছে, গিন্নি অন্নদা নাতিটিকে জাগিয়ে খেয়ে দেয়ে এসে শুলো পান চিবোতে চিবোতে—আগের হাটে কেনা সেই আড়াই টাকা তোলা জর্দার গন্ধটা পর্যন্ত যেন নাকে এসে লাগছে। হিসাবপত্র সেরে রাত সাড়ে বারোটায় একবার বাইরে থেকে হয়ে এসে দরজা দিয়ে নিজে শুলো সাধুচরণ—হ্যাঁ, বেশ মনে পড়েছে দরজা এঁটে দিয়েই শুলো। তাহলে কি বৌ-ই ভুলটা করেছে ? নাতিটা এক একদিন ওঠে, বাইরে নিয়ে যেতে হয়। সাধুচরণ ডাকল—"সুধীর-মা ! গেছলি তো ভুলে দরজাটা দিতে কাল ?"

গায়ের ঝাল মেটাবার জন্যে বলা। চিরকাল যে নিয়ম চলে আসছে—খাটিয়ে মানুষের বৌ আয়েসী হবে—সুধীর মার এখন রাতদুপুর। "উঁ" করে একটা শব্দ করে পাশ ফিরে শুলো। আবার টুকতে গেলে খ্যাঁক করে উঠবে। সাধুচরণ বিরক্তভাবে বিড বিড করে। ইষ্টনাম জপ করতে করতে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়েও উঠল—"ওরে ওঠ ! ওঠ ! সিঁদ কেটেছে চোরে !"

"কখন্ ?—কোনখানে ?"—বলে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল সুধীর-মা।

"আমার সুবুদ্ধি কিনা, ডেকে বলতে গিয়েছিল কখন্ !"—খিঁচিয়েই উঠল

এবার সাধুচরণ, বলল—"ঐ তোর পাশেই সিঁদ, হাঁ করে রয়েছে। ঘুমুলে তো জ্ঞানগম্যি থাকে না।"

"ওমা তাই তো!"—বলে ভয়ে আঁৎকে উঠে নাতিটাকে কোলে টেনে নিয়ে সিঁদটার দিকে চেয়ে রইল সুধীর-মা। চৌকি থেকে হাতখানেক দূরে ওরই শিয়রের কাছে সিঁদটা। প্রথমটা যেন যা হয়েছে তার চেয়ে যা হতে পারত—তারই কাল্পনিক বিভীষিকায় বাকরোধ হয়ে বসে রইল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর সম্বিত ফিরে এলে বলল—"কী সব্বনাশ! কী হবে!"

"কী সব্বনাশ! কী হবে!"—আবাব ঝেঁঝে উঠল সাধুচরণ। নিজে নেমে ততক্ষণ খোঁজাখুঁজি লাগিয়েছে, ঝেঁঝেই বলল—"আগে নাব, দেখ কি হয়েছে, না, কি হবে!…"

"গেছে নিয়ে!"—মাথার বালিশের নীচে থেকে ডান হাতটা বুলিয়ে নিয়ে এসে বলল সুধীর-মা। তারপর বোধহয় একটু আশ্বা ধরে বালিশটা উল্টে দিয়েই কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে উঠল—"আমাব পানের ডিবেটা নিয়ে গেছে গো!"

সাধুচরণ তখন কাঁপা হাতে লোহার সিন্দুকটা দেখছে। তালাটা ঠিকই আছে, তবুও ঘুনসি থেকে চাবি খুলে নিয়ে তালায় পরাচ্ছিল, খিঁচিয়ে উঠে বলল—"তোকে সুদ্ধ যে নিয়ে যায়নি এই আমাব বাবার ভাগ্যি! ঘুম, না, চণ্ডাল রে বাবা! শিয়রের কাছে সিঁদ কাটলে—বালিশের তলা থেকে ডিবেটা নিয়ে গেল! তবু…"

—গরগর করতে করতে মাটিতে পোঁতা সিন্দুকটার ভেতরে হাত চালিয়ে দেখল সাধুচরণ। বন্ধ করে দিয়ে উঠে এসে বলল—"ওঠ, বাড়ি-ঘর দেখ, ডিবে ভেন্ন যেন আব চুরি করবার জিনিস নেই বাড়িতে!…"

গরগর করতে করতেই বেরিয়ে গিয়ে ছেলে ষষ্ঠীচরণের ঘবের দরজায় ঘা দিয়ে ডাকল—"ষষ্ঠে ওঠ, বাড়িতে চোবে সিঁদ দিয়েছে!"

বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ সাধুচরণ। জাতিতে গন্ধবণিক। হাটে একটা পাকাপোক্ত বড মুদিখানার দোকান আছে। তা ছাড়া লগ্নী কারবার।

খুব হিসাবী এবং সাবধানী। বাপ গুরুচরণের কাছ থেকে একটা ছোট দোকান পেয়েছিল, বাড়িয়ে বাড়িয়ে এখন এতটা। চাপা দেওয়ার চেষ্টা থাকলেও, শাঁসাল মানুষ বলে বেশ খানিকটা তল্লাট জুডে নাম আছে। সিঁদাড নজরও নিশ্চয় বহুদিন থেকেই আছে, কিন্তু হাত পড়ল এই প্রথম।

তবে খুব বেশি কিছু সরাতে পারেনি। সাধুচরণের ঘর থেকে ঐ রূপোর ডিবেটা আর খাটের তলা থেকে এঁটো বাসনগুলো আর স্টীলের ছোট ক্যাশবাক্সটা, যেটাতে ক্যাশ আনে দোকান থেকে সাধুচরণ। এ ছাড়া বড ঘর—যাতে সাধুচরণের বিধবা বোন ছেলেমেয়েদের নিয়ে শোয়, সেখান থেকে গেছে কিছু কাপড়চোপড। তা কম নয় নেহাত। কালই ষষ্ঠীচরণের শ্বশুরবাডি থেকে পৌষালী তত্ত্ব এসেছিল ; পাডা থেকে যারা দেখতে এসেছিল তাদের দেখিয়ে একেবারে বড সিন্দুকে না পুরে একটা ট্রাঙ্কেই রেখে দেওয়া হয়েছিল, আরও সব দেখতে আসবে ; ট্রাঙ্কটাসুদ্ধ নিয়ে গেছে। বডমানুষ শ্বশুর, শালখানাই ছিল আড়াই শ' টাকার ওপর।

ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ সাধুচরণ। সিঁদ কেটে চুরি বাড়িতে, প্রথমটা একটু হৈচৈ উঠল, তবে সেটা চেপে দিল, বাডির বাইরেও যেতে দিল না। বেশ ভালো করে খোঁজখবর নিয়ে সবাইকে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পডতে বলল। যুক্তি দেখাল, রাত থাকতে লোক জড করে কোন লাভ তো নেই, সকাল হলে থানায় খবর দিলেই হবে। এরপর সদরঘরে গিয়ে কাগজকলম নিয়ে চোরাই মালের একটা ফিরিস্তি রচনায় লেগে গেল।

রচনাই বলতে হয়। মালের মধ্যে দামী রকম যা গেছে তা ঐ কুটুম্ববাডির তত্ত্ব। মিনাকরা রূপার পানের ডিবাটা গিন্নি কাশী থেকে টাকা পঞ্চাশ দিয়ে কিনেছিল। সকডি বাসন-কোসন যা গেছে তা নিত্য-ব্যবহার্য, মামুলি ; এলুমিনিয়াম আর এনামেলেরই বেশি। সব খতিয়ে দাম ফেলে সাধুচরণ দেখল ন'শ টাকার ওপরে যায় না। পুরনো, নিত্যব্যবহারজনিত ক্ষয়—এসব ধরলে (হিসাব মতো ধরতেই হয়) টেনেটুনেও শ' ছয়েকের ওপরে তোলা যায় না। সাধুচরণ ওটাকে তেরোশ' করল, অবশ্য মালের ফিরিস্তি কিছু বাডিয়ে।

ক্যাশ অর্থাৎ নগদ একটি পয়সা যায়নি। ওটা সাধুচরণের খাস এলাকার জিনিস, যদি কখনও ডাকাত পডে তাহলেই ভয় আছে। ক্যাশবাক্সর পাই-পয়সাটি পর্যন্ত গুনে-গেঁথে সব প্রথমে লোহার সিন্দুকে ভরে ; বাগানে নিয়ে গিয়ে চোর যখন ভাঙল তখন তার মুখের চেহারাটা কিরকম হয়েছিল কল্পনা করে আনন্দই পেল।

আনন্দটা বাড়ালও। কাল হাটবার ছিল, খুচরো-পাইকারিতে প্রায় হাজার খানেকের কাছাকাছি বেচেছে। অত নয়, আবার সবার বিক্রির ওপর নজর পড়বে, ফিরিস্তিতে ক্যাশবাক্স ভাঙা খাতে—তবুও একটা মানানসই অঙ্ক ধরে রাখল—চারশ' টাকা, তেতাল্লিশ নয়া পয়সা। সর্বসাকুল্যে সতের শ'

টাকা তেতাল্লিশ নয়া পয়সা হল। সাধুচরণ নিজের সর্বনাশটাকে পৌষ মাসে রূপান্তরিত করবার ব্যবস্থাটুকু সেরে মনে মনে একটু হাসল। অবশ্য বামাল যদি ধরা পড়ে। ঘরের মাল পর্যন্ত টেনে বের করিয়ে ছাড়বে। এক ধরনের ফটকা খেলা, রোজদিন খরিদ-বিক্রিতে যা করছে। । না হল গেলো শ' ছয়েক টাকা ; কী আর করা যাবে ?

সকাল হলে খানিকটা হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করে লোক জড়ো করল, তারপর যথাপদ্ধতি থানায় গিয়ে ডায়েরী করে এল দুখানা গ্রাম পেরিয়ে।

নিজের কথাই শুধু ভাবল সাধুচরণ, এ ধরনের সর্বনাশে আরও কতকগুলি জীবের পৌষ মাস যে বাঁধা, নিশ্চয় অভিজ্ঞতার অভাবেই সেটা আন্দাজ করতে পারেনি।

ডায়েরী করে ফিরে এসে দেখে গ্রামের চৌকিদার অর্জুন ভুঁইমালি উর্দি চড়িয়ে তার টাঙ্গিটা হাতে করে বারান্দায় বসে আছে, চারিপাশে কৌতূহলীদের একটি ছোটখাট ভিড। চেনা লোক, হাটবারে একটা বাঁধা পাওনা আছে। দুটো ভালোমন্দ কথা জিজ্ঞেস করে নিয়মিত নিয়ে যায়।

"অর্জুন যে ! শুনেছ বোধহয় ?"—বলতে বলতে এগিয়ে আসতে, নেমে অর্জুনও এল এগিয়ে। বলল—"না শুনব কেন ? সেই কথাই তো বলছিলাম এদের। বলি, কার কাজ কেবা করে, খোলা ফেটে বামন মরে। চুরি আপনার ঘরে না, অর্জুন চৌকিদারের ঘরে ? আমার এলাকা, আমিই গিয়ে তো হুজুরে খবর দোব। ডায়েরীও যে করা হবে তারও তো একটা পদ্ধতি আছে, তা আপনি কি করে জানবেন ?—বাজারের ওঠা-নামার হিসেব রাখতেই দিন কাবার। কানে যেতেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে দেখি বেরিয়ে গেছেন।...তা হুজুর কখন আসবেন বললেন ?"

"ঘণ্টা দুয়েক লাগবে বললেন। এখন সাড়ে ন'টা আন্দাজ হয়েছে।"

চোখ তুলে একটু হিসাব করল অর্জুন। বলল—"তার কমে তো হবে না। আমার এত্তালাটার জন্যে ওপিক্ষে করতে হবে তো। সেইটেই আসল কিনা। তা ইদিকে আসুন। কি লেখালেন বলুন, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যি রেখে লেখাতে হবে তো। ভয় নেই, ভুলচুক যা করেছেন সে সবও ঠিক করে দোব'খন। চলুন, তাহলে একবার সরেজমিন সবটুকু দেখে নিই।...তোমরা সব ওদিকেই থাকো, পেছনে পেছনে আসতে হবে না, তামাসা নয় ; তামাসা যখন দাঁড করাব, তখন দেখতেই পাবে তার সমারোহটা।"

বাহির ভেতর ঘুরে ঘুরে সব দেখে বাগানে এল। খানিকটা তফাত থেকেই হেঁট হয়ে খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে দেখে বলল—"এঃ, একটু যে ভুল করে বসেছেন! ঐজন্যেই বলছিলাম না? আগে খবরটা আমাকেই দেওয়া উচিত ছেল।"

"ভুলটা কি হল?"—একটু শুষ্ক কণ্ঠেই প্রশ্ন করল সাধুচরণ।

"চোরের পায়ের দাগের সঙ্গে গেরস্তর পায়ের দাগ যে মিশে গেছে! যথাবৎ ছেড়ে দিতে হবে, কাছে গিয়ে কখনও ঘাঁট ঘাঁটি করতে আছে? যাক, সামলে নেব'খন।...ওগুলো কি দত্তমশাই? অনেকটা যেন বাঁধাকপির মতন দেখতে।"

"বাঁধাকপিই।" সাধুচরণ উত্তর করল—ষষ্ঠের বাগানের শখ, বম্বের ওদিকে কি একটা নাম, সেখান থেকে বিচি আনিয়ে করেছে..."

"আর ওগুনো?—বেগুন? না দেখলে বিশ্বাস হয় না যে!...আর ওগুনো?"

"টমেটো।"

"ইস!...এক কাজ করুন তাহলে।...শুনুন, এদিকে আসুন।"

কেউ না থাকলেও একটু পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে গলা নামিয়ে বলল—"একটা ভালো করে ডালি...(জিভ কেটে) আরে না, না, সোজা পাঠাতে আছে? সব্বনাশ! গোটাতিনেক ঐ কপি, তদনুরূপ বেগুন, টমেটো, পালংশাক, আর যা সব রয়েছে, একটি থলেয় করে আমার ওখানে দিয়ে আসুক। নেন না, তবে (একটা চোখ বুজে) নেওয়াবার হদিস আমার জানা আছে।...হ্যাঁ, বলুন তো, ডায়েরীটা কিরকম করলেন শুনে রাখি।...ও, হ্যাঁ, এই দেখুন ভুলেই যাচ্ছিলাম। ছেলের শ্বশুরবাড়ির তত্ত্ব—জনাইয়ে কুটুম্বিতে করেছেন তো?"

"জনাইয়েই।"—সাধুচরণ জানাল।

"তাহলে তারা নিশ্চয় ওখানকার নাম করা মনোহরা—সন্দেশটা বাদ দেয়নি। কিছু সাজিয়ে দিতে হবে ডালির একধারে। এগুলো হচ্ছে পদ্ধতি। হ্যাঁ, এবার বলুন কি ডায়েরী করলেন।"

এগারটা—বারোটা গেল, বেলা যখন একটা একজন কনস্টেবল এসে উপস্থিত হল। দারোগা ঘণ্টা দুই পরে আসছি বললে যে তাঁকে আসতেই হবে এমন কোন কথা নেই। না এলে গেরস্থকে খবর দেওয়াও তাঁর এলাকা নয়। কনস্টেবলটা এসে আবার জানাল তিনি একটা খুনের কেসে আটকে

পডায় পারবেনই না আসতে, তাঁর জুনিয়ারকে হুকুম হয়েছে লোক্যাল এনকোয়ারি করতে। ও নিজে ওপরপড়া হয়ে অফিসে খবর নিয়ে জেনেছে তিনিও আজ চারটের আগে আসতে পারবেন না। বলল—হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হত, হয় সব গেরস্থকেই আহারনিদ্রা ত্যাগ করে—কখন্ যে হুজুর এসে পড়বেন ঠিক থাকে না তো। তাই, নেহাৎ দত্তমশাইয়ের বাড়ি বলেই একটু ফুরসুৎ করে ছুটে এসেছে খবরটা দিতে।

এরপর ও-ও একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঠোঁট-নাক-চোখ নিয়ে মুখের ডানদিকটা একটু কুঁচকে প্রশ্ন করল—"তা, খাতিরের কি ব্যবস্থা করছেন? অতবড় অফিসারটা আসছেন। খোদ কর্তার পরেই তো।"

"সেকি! তাঁর চা-জলখাবারের আয়োজন থাকবে বৈকি।"

"তা তো থাকবেই। সে তো রামা-শ্যামাকেও করতে হয়। কিন্তু আবার কার বাড়িতে আসছেন সেটা দেখতে হবে তো। এই এদিকে দেখুন…"

একটু ঘুরে দর্শকদের দিকে পেছন করে পেটের কাছে হাত দুটো নিয়ে গিয়ে খুলে, মুড়ে, আবার খুলে দিল। অর্থাৎ কুড়িটা টাকা, প্রথম পদার্পণের অভ্যর্থনা হিসাবে। সাধুচরণ শুষ্ককণ্ঠে বলল—"তা যদি নেন তো দিতে হবে বৈকি। তবে যে শুনেছিলাম, নগদ কিছু ছোঁন না।"

জিভ কাটল কনস্টেবল, বলল—"আরে ছো! এসব কথা কি বেরোয়? তবে নেন সে কি এখানে আর নিজের হাতে? আমায় দিয়ে রাখুন। এইবার একটু ঘুরে ফিরে অকুস্থানটা দেখে রাখতে হবে তো?—তারই ফাঁকতালে।"

তাই করতে হল সাধুচরণকে, ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে যখন ওরা বাগানে গিয়ে ভাঙা ট্রাঙ্ক আর ক্যাশবাক্সটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অবশ্য বাজে লোকদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। নোট দুখানা হাত-বদল হলে, যেন পরের জিনিস বওয়া এইভাবে হাতের মধ্যে অবহেলাভরে মুড়ে নিয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে বলল—"হ্যাঁ, বাগান বটে! শুনেই আসছিলাম—বল্লভপুরের দত্তদের বাগানের কথা, তা দেখছি একবর্ণ মিথ্যে নয়। হাত ময়লা করা কুষ্টিতে লেখেনি, সে দেখতেই পাচ্ছেন, পরের দায় খালাস করতেই জন্ম, তবে আপনার ফসল কিছু খেতেই হবে আমায়। অবিশ্যি, যদি ভাবেন যতীন কনস্টেবল উপকার করতে এসে…"

"এ আর এমন কি জিনিস?"—একটু শুষ্ককণ্ঠেই বলল সাধুচরণ—"তবে দেখবেন, ব্যাটা কঠিন ঘা দিয়েছে, একেবারে হাজার দেড়েকের ওপর…"

একটু এগিয়ে নিয়ে এল গলাটা যতীন কনস্টেবল, বলল—"জানেনই তো,

লড়াই জিততে সেপাইরা, নাম হয় সেনাপতির। থানায় যে ক'জন কনস্টেবল আছি—কর্তে-মর্মাতে তারাই, তার মধ্যে আবার, বলতে নেই, এই বান্দার ওপরই হুজুরের একটু নেকনজর বেশি। ওদিকটা আপনার কিছু ভাবতে হবে না। তারপর—আমরাও তো ছাপোষা মানুষ—মাথার ঘাম পায় ফেলে—মাস গেলে কিই বা পাই বলুন।…কিন্তু সে পরের কথা পরে…"

বেলা যখন চারটে আরও একটু বিশিষ্ট পুলিসী সাজে একজন সাইকেল থেকে নেমে হাতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে এসে উপস্থিত হল। চৌকিদার অর্জুন ভুঁইমালী উপস্থিতই ছিল, দূর থেকে দেখেই জানিয়ে দিল, ছোট হুজুর নয়, হাবিলদার সায়েব। তিনিও নিশ্চয় খুনের ব্যাপারটায় আটকে গিয়ে থাকবেন।

হাবিলদার অবশ্য সেসব কিছু বলল না। অধিকন্তু, ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে এমন একটি গুরু-গাম্ভীর্যের সঙ্গে সোজা পুলিসী পা ফেলে পরীক্ষাটা চালাল, যাতে সে যে বড়কর্তা নয়, ছোট কেস বলে তাকে পাঠানো হয়েছে, এ ধারণাটা কারুর মনে এসে পড়তে না পারে। টেবিল চেয়ার পাতিয়েই রেখেছিল অর্জুন, সব দেখেশুনে এসে একটা জবানবন্দী নিল সাধুচরণের। শেষ হলে সামনের দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে একটু যেন চিন্তা করে চৌকিদারকেই প্রশ্ন করল—"পুকুরটা ছাঁকানো হয়েছিল?"

সাধুচরণের বাড়ির চৌহদ্দিরই একদিকে বেশ একটা মাঝারি গোছের পুকুর। বাগান নিয়ে নিশ্চয় একটু আতঙ্ক শুরু হয়ে গিয়ে থাকবে মনে, সাধুচরণই উত্তর দিল—"আজ্ঞে, ঐ দুটো বের করেছিল—ট্রাঙ্ক আর ক্যাশবাক্স, বাগানেই পাওয়া গেল, তাই আর পুকুরের দিকে…"

"দেখতে হবে জাল টেনে। চোর যে শুধু আপনার বাড়িতেই হানা দিয়েছে, কে বলতে পারে? কিছু বেরুলে এনকোয়ারিতে সুবিধে হয়।"

পরে অর্জুনের দিকে চেয়ে একটু কড়া চোখেই বলল—"কেন, এটা তোমার তো বলে দেওয়া উচিত ছিল। যাও এখুনি হাজির করো জেলে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে।"

পাশেই জেলেপাড়া, দেরি হল না। ওরা যতক্ষণে এল ততক্ষণে সাধুচরণ ডেকে নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানা থেকে চা-জলপান করিয়ে নিয়ে এল। সামনে দাঁড়িয়ে ক'ক্ষেপ জালটানা দেখে কপালে তর্জনী ঠেকিয়ে একটু চিন্তা করল হাবিলদার; সাধুচরণ পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, বলল—"আসুন বাগানটা

আর একবার দেখব।"

প্রবেশ করে বলল—"বাগানটাও তো দেখছি চোরে তছনছ করে গেছে, কপিগুলো সন্থ কাটাই বলে মনে হয়। ডায়েরীতে লিখিয়েছেন?"

এ যে কোন চোরের কাণ্ড, বলবার উপায় নেই তো। সাধুচরণ জানাল—"না, সেটা লেখান হয়নি।"

"আপত্তি আছে?"

"আজ্ঞে, আপত্তি কি?"—নিশ্চয় একটু আক্রোশের সঙ্গেই বলল সাধুচরণ। তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলল—"কিন্তু সেখানকার ডায়েরী আর এখানকার জবানবন্দীর সঙ্গে মিলবে না যে।"

"সে ভার আমার। কাঁচামাল, ওসব বাজারে এসে পড়বেই, নজর রাখা সুবিধে হয়। তাহলে এক কাজ করুন; আরও কিছু কপি কাটিয়ে, বেগুন টমেটো তুলিয়ে—আলুও তো রয়েছে দেখছি—কিছু খুঁড়িয়ে নিয়ে...আর ঐ যে বললাম—বাগানটা একটু তছনছ করে রাখতে হবে। আসুন, আমি চৌকিদারকে বলে দিয়ে যাচ্ছি। কাল সায়েব আসবেন, তার আগে যেন সব ঠিক থাকে।"

একটু আড়ালে চৌকিদারকে টিপে দিয়ে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সাইকেলে উঠে বেরিয়ে গেল।

চলে গেলে অর্জুন চৌকিদার, কি করে তছনছ করতে হবে ঠিক করবার জন্য সাধুচরণকে নিয়ে বাগানে গিয়ে একটু খিঁচিয়ে বলল—"নাঃ, অর্জুন জাল টানাতেও জানে না, ফসল কাটাতেও জানে না, বলে আজ ষোল বছর ধরে এই কাজ করছে এই এলাকায়, আর তুমি বছর দুই হাবিলদার হয়ে এসেছ।... চেষ্টা করছিলাম বাঁচাবার, তা যা রাঘব বোয়ালের পেট!...আহা মায়াও হয় বাগানটার জন্যে!..."

চার থেকে নিয়ে সের ছয়-সাত পর্যন্ত গোটা ছয় রুই আর কাৎলা, আরও পাঁচটা কপি; বেগুন, টমেটো; মনখানেক আলু—যাতে বেশ বোঝা যায় বাগানটার আর কোনও বস্তু রাখেনি চোরে।

—অবশ্য, কোন্ রাঘব বোয়ালের পেটে গেল, বা ক'টা রাঘব বোয়ালের, সেটা জানবার কোন উপায় রইল না।

খুনের কেসটাতে দারোগাবাবু একটু বেশিরকম আটকে পড়েছেন, পরদিন আসতে পারলেন না। পরদিনও নয়, তারপর সপ্তাহ খানেক কেটে গেছে।

অর্জুন চৌকিদার অবশ্য রোজ আসে হুজুরের এস্তেজারে, যতীন কনস্টেবলও দিনতিনেক এল, একদিন হাবিলদারও ঘুরে খোঁজ নিয়ে গেল। …কেস নাকি ওদিকে সাজানো হচ্ছে, হুজুর একবার দেখে মিলিয়ে সদরে পাঠিয়ে দেবেন। তিনজনেই বলে, তিনজনেই নজর রেখেছে, সাধুচরণের চিন্তা করবার কিছু নেই।

বাগানে তছনছ হওয়ার মতোও আর কিছু নেই বলা চলে। পরদিনই যে হুজুরের আসবার কথা ছিল, খাতির হিসাবে, নন ভিজিয়ে রাখবার জন্য কনস্টেবল্ যতীন বলল—ছোট সায়েব আসবেন বলে যে কুড়িটা টাকা চেয়ে রেখেছিল, সেটা হাবিলদারকেই দিয়ে দিতে হয়, সেই তো তাঁর কাজ করে গেল। হাজার চেষ্টা করলেও এসব কথা তো নিজেদের মধ্যে জানাজানি যায়ই হয়ে। এখন, হাবিলদারের খাতিরের মূল্যই যদি টাকা কুড়ি হয় তো খোদ কর্তাকে কমপক্ষেও টাকা পঞ্চাশেক না দিলে, ইত্যাদি।

পাগলের মতো হয়ে গেছে সাধুচরণ। বাগানের দিকে পা বাড়াতে চোখে জল আসে। ইতিমধ্যে দুটো চারটে করে পুকুরের প্রায় আরও আধমন মাছ গেছে বেরিয়ে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে নিজের কারবারে। বাজার দেখে কেনাকাটা হচ্ছে না, এদিক সামলাতে দোকানেও নিয়মমতো যাচ্ছে না বসা। ওদিকে ষষ্ঠীচরণেরও নূতন বিয়ে। সব মিলিয়ে যে লোকসানটা যাচ্ছে তা যাচ্ছেই, তার ওপর এদিকে পুকুর-বাগানের মতো দোকানের ওপরও টান পড়েছে—অবশ্য কর্তাদের নাম করেই; ভালো চালটা, ভালো ঘি'টা, সোনামুগের একনম্বর ডালটা…

এর পর হঠাৎ সব যেন ঠাণ্ডা মেরে গেল, হয়তো পুকুর-বাগান খালি হয়ে যাওয়ার জন্য এবং আর টাকা টানবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যও। অর্জুন ভুঁইমালীর দেখা নেই, শুনল কনস্টেবলটাও বদলি হয়ে গেছে। প্রথমটা একটু অস্বস্তিই লাগল সাধুচরণের। ফসলে-নগদে অনেকগুলিই তো গেল, সব যদি বৃথাই যায় তো আপসোসের কথা বৈকি। একবার নিজেই গিয়ে থানায় তদবির করে কেসটা জাগিয়ে-তুলবে কিনা ভাবছে, এমন সময় সেটা আপনিই হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইল। খুব ভালোভাবেই।

হাটের দিন। ক'দিন বাদে বেশ একটু উৎসাহের সঙ্গে দোকান খুলিয়ে ঠিকঠাক করে গদিতে বসেছে, ধীরেন এসে চুপিচুপি খবরটা দিল। বিক্রির দিকে তিনজন যে লোক আছে তাদের হেড। পুরনো কর্মচারী।

ধীরেন জানাল চোরাইমালের একটার সন্ধান পাওয়া গেছে, রূপোর

ডিবেটার। চারখানা গ্রাম বাদ দিয়ে নবাবগঞ্জের হারু শেঠের এ নিয়ে বদনাম আছে। বেরিয়েছিল বাজারে জিনিসটা নিয়ে, তবে এখন পর্যন্ত খদ্দের পায়নি। এই সময় পুলিসে হানা দিলেই চোরের নাম বেরিয়ে পড়ে। তারপর এদিকে চোর ওদিকে হারু শেঠ—ডবল আসামী নিয়ে মোকদ্দমা গনগন করে এগিয়ে চলে। দুজন দাগী চোরের নামও জানাল ; কানাঘুষো হচ্ছে।

সাধুচরণ নির্বাক নিষ্পন্দ হয়ে চেয়ে রইল ওর দিকে, যেন মনে মনে তোল করে দেখছে।

তারপর দারুণ আক্রোশেই হোক বা বিতৃষ্ণাতেই হোক, মুখটা বিকৃত হয়ে আসতে দেখে ধীরেনই বলল—"কী অত ভাবছেন? শুধু একবার অর্জুন ভুঁইমালীর কানে নামটা তুলে দেওয়া—তাহলেই…"

"ঢের হয়েছে!!"—একেবারে সিঁটকে-মিটকে উঠে নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতদুটো কপালে জড়ো করল সাধুচরণ, তারপর ঝেড়ে দিয়ে বলল—"আর খুঁচিয়ে থানা পুলিস নয় বাবা! তার চেয়ে আমার চোর বেঁচে থাক—তার তবু রাত জেগে মেহনতের রোজগার।…উঃ, এখনও চন্দ্র-সূয্যি উঠছেন কি করে আকাশে!…

মাথা ঠিক ছিল

ভদ্রলোককে গোড়া থেকেই খাপছাড়া মনে হচ্ছিল, রাত্রিটার জন্য সঙ্গীও যে হয়ে পড়লাম তাও কতকটা এই জন্যই। অতঃপর বিপদেও পড়লাম ঐ জন্যই এবং তা থেকে উদ্ধারও যে পেলাম তাও খানিকটা ঐ খাপছাড়াপনার জন্যই।

পাটনায় যাব, রাত্রি ন'টা পাঁচের দিল্লী-এক্সপ্রেসটা ধরে। বাসে করে স্টেশনের দিকে যাচ্ছি, বেশ দেরি হয়ে গেছে ও কয়েক জায়গায় ট্রাফিক কনট্রোলে, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি, ঘনঘন ঘড়ি দেখছি।

উনি একটা বাস ষ্টপে উঠলেন। "থামো, থামো! বাঁধকে!"—বলে বেশ সময়ও নিলেন, কি কারণে ঠিক বুঝতে পারলাম না, ভিড়ের জন্য ঠিকমতো নজর যায় না দোরের দিকে। এরপর "সরো…সরুন"—বলতে বলতে ভেতরের দিকে ঢুকে পড়ে আমার সামনে এসে বেঞ্চটা দেখে নিয়ে বললেন—"একটু জায়গা হয় না?"

জায়গা একেবারেই নেই, সবাই চুপ করেই রইলাম। আমার পাশের

লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন—যাবে কোথায়। সুবিধা না হতে তার পাশের যুবকটিকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল পরের ষ্টপেই নামবে। এসে যেতে, তার সীটে বসে পড়ে—"বাঁধকে—বাঁধকে!" বলে তাকে নেমে যেতে একটু সাহায্যও করলেন, তারপর থেকেই প্রতি ষ্টপেই কিন্তু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য উদ্ব্যস্ত করে তুললেন কন্‌ডাক্টার ড্রাইভার দুজনকেই। আমি চুপ করেই আছি, দেরি হয়েছে, ওঁর তাগাদায় যদি কিছু কাজ হয়, একটি পাশের ভদ্রলোক কিন্তু একটু অধৈর্য ভাবেই বললেন—"একটা একসিডেণ্ট্ করবে শেষকালে মশাই?—আপনি তো বলছেন।"

"লোককে গাড়ি ধরতে হবে তো মশাই, ওকালতি তো করছেন। দরকার কি আর লোক চড়াবার?"—রুখে উঠে জবাব দিলেন ভদ্রলোক।

"নামতে দিতে হবে তো?"

—উত্তরটা শুনে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন আর কোন জবাব না দিয়ে। এই সময় আমি হাত ঘড়িটা উল্টে দেখায় প্রশ্ন করলেন—"কি, আপনারও ট্রেন ধরা তো?"

বললাম—"হ্যাঁ।"

"ঐ নিন, একা নয় আমি। আর, ট্রেনের সময়ের বাস—মিলিয়ে নিন, এর আদ্দেক লোক যদি ট্রেনের প্যাসেঞ্জার না হয় তো বলবেন জগু ভট্‌চাযের মতন মিথ্যেবাদী…"

আক্রোশভরে ওঁর দিকে চেয়ে বলে গিয়ে অসম্পূর্ণ রেখেই আমার দিকে ঘুরে প্রশ্ন করলেন—"তা, যাবেন কোথায়?"

"পাটনা"—উত্তর করলাম আমি।

"পাটনা!"—উল্লসিত হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন—"আমিও পাটনা। দেখুন রাজযোটক! দিল্লী এক্সপ্রেস তো?"

"তাই ভেবেই তো বেরিয়েছি। কিন্তু আবার যদি ট্রাফিক কনট্রোলে আটকে দেয়"—হাত-ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললাম—"আর তো মাত্র পনেরো মিনিট।"

"অথচ সেকথা বলুন, 'ফোঁস' করে ওঠবার লোকের…"

—এটাও অসম্পূর্ণ রেখেই আবার একবার ওদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এসে বললেন—"টিকিট কেনা আছে?"

বললাম—"না, সেই তো আরও ভাবনা।"

"বললাম না? রাজযোটক আর কাকে বলে? আমারও ঐ অবস্থা। চলুন, এক যাত্রায় আর পৃথক ফল কেন?"

পাশের ভদ্রলোকটি শোধ নিলেন এতক্ষণে সুযোগটুকু পেয়ে। গাড়িটা একটা ষ্টপে এসে দাঁড়িয়েছে, নামবার জন্যে উঠে পড়ে বললেন—"রাজযোটক তো বিয়েতেই হয় জানতাম। গাঁটছড়া বেঁধে পাটনা যাচ্ছেন নাকি ?"

—বলতে বলতেই ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে নেমে গেলেন।

কথাটার অপপ্রয়োগ হয়ে গেছে বুঝে একটু থতমতই খেয়ে গেছেন জগুবাবু, সামলে নিয়ে বললেন—"নেমে গেলেন তাই, নইলে এস্‌সা জবাব দিতাম।... মরুকগে, কতরকম মানুষ দিয়ে খোদা যে তাঁর এই আজব চিড়িয়াখানা সাজিয়েছেন—মত তো নেননি, মত নিলে দিতে পারতাম, কি বলেন ?"

হেসে বললাম—"অতি সত্যি কথা।"

"তাহলে নেমেই টিকিট দুটো কিনে নেওয়া। আপনার কোন্ ক্লাশ ?"

বললাম—"সেকেণ্ড। অধম তারণ।"

"আমারও তাই। লাগেজ-টাগেজ আছে নাকি ?"

"না, হঠাৎ কাজ পড়ে যাওয়ায় যেতে হচ্ছে, এই একটা সুটকেস মাত্র।"

"আশ্চর্য কাণ্ড দেখুন, আমারও ঠিক তাই। এক টেলিগ্রাফ পেয়ে এই তাড়াতাড়ি ছুটেছি। তাই না বলছিলাম—রাজ—যো..."

—সামলে নিয়ে চুপ করে গেলেন। পুল পেরিয়ে গাড়িটা বাস-ষ্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতটা উল্টে দেখলাম আর মাত্র দশ মিনিট বাকি। উঠে পড়ে বললাম—"নিন, উঠুন, টাইম একেবারে নেই।"

ভিড়ের মধ্যে পা বাড়িয়ে গলার আওয়াজ শুনে ঘুরে দেখি উনি আর এক ফ্যাসাদ নিয়ে পড়েছেন। একটি স্ত্রীলোক বুকে একটি ঘুমন্ত শিশুকে চেপে ভিক্ষার জন্য হাত পেতে রয়েছে আর উনি সুটকেসটা হাতে নিয়ে প্রবল বেগে হাত নেড়ে বলে যাচ্ছেন—"না—না, কক্ষনও নয়, একটি পয়সা নয়—গতর খাটিয়ে খাওগে—এই ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমাদের—একটা ছেলে কোলে করে..."

বললাম—"আসুন আপনি, আর মোটে আট মিনিট, এখনি ওপর থেকে ভিড় ঠেলে উঠলে..."

"এগুলোও একটু দরকার মশাই, সোস্যাল ডিউটি—উচ্ছন্ন যাচ্ছে দেশটা এই করে।...কেন বাপু, দেখেও শিখতে পার না। ঐ তো হিন্দুস্থানী মেয়েরা, তোমার চোখের সামনেই ফুটপাথে বসে নেবু বেচছে—কপি নিয়ে বসেছে..."

"আমি তাহলে এগুচ্ছি।"

এগিয়েই গেছি দোরের কাছাকাছি, সেখান থেকে বলতে উনিও ওকে ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন। ফুটপাতে ভিড় ঠেলে চলতে চলতে অনুযোগ করলেন—"শুধু কি ট্রাফিক কনট্রোল? আবার এই সব রাস্তা আগলে দাঁড়াবে—একরকম রাস্তা আগলানই নয় কি? বলুন না?"

"আসুন তাড়াতাড়ি।"—এইটুকু বলবারই সময় ছিল, কেননা ট্রাফিক পুলিস হাত তুলে গাড়িগুলো আটকে রাখায় রাস্তা টপকে স্টেশনে গিয়ে ওঠার তখনও সুবিধা রয়েছে। 'আমরা বাসষ্ট্যাণ্ডের ভিড় ঠেলে পৌছুতে পৌছুতে কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়ে হুইসিল বাজিয়ে দিল। লম্বা লাইনে একগাদা বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট গাড়ি, রিকসা, ঠেলাগাড়ি জমে ছিল, একটুকু ফাঁক না দিয়ে জলের তোড়ের মতো বেরিয়ে যেতে লাগল। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা, কিম্বা নেমে পড়ে মৃত্যুবরণ করা। জগুবাবু একটু দেখে অধৈর্যভাবে বলে উঠলেন—"নে না বাবা! খুব ডিউটি বাৎলাচ্ছিস। এদিকে ট্রেন ধরতে হবে যে মানুষটাকে!"

পুলিসটাকে লক্ষ্য করেই অবশ্য। তবে সেই হট্টগোলে না তার কানে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, গেলেও না কোনও কাজ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। হয়তো ওটুকু শুধু আমার জন্যই, একটু বিরক্তভাবে মুখটা গম্ভীর করে যে দাঁড়িয়ে আছি, যদি একটু নরম হই।

বললাম—"ঐ স্ত্রীলোকটিকে ধমকাতে যে সময়টুকু গেল তাইতেই না আটকে যেতে হল।"

"তাহলে স্বীকার করছেন যে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে চারিদিকে—যা বলছিলাম এখুনি।"—একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

উত্তর আর কী দোব এর? এই সময় পুলিসটাও ঘুরে দাঁড়িয়ে যানবাহন আবার আটকে দিতে রাস্তাটাও খালি হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেলাম স্টেশনের ফুটপাতে।

হাতঘড়িতে দেখলাম আর মাত্র মিনিট পাঁচেক আছে। এটুকুর মধ্যে ভিড় ঠেলে বিরাট হল পেরিয়ে টিকিট কেটে দিল্লী একস্প্রেস ধরা—একেবারে অসম্ভবের কোঠায়ই পড়ে। চলতে চলতেই কথাটা বলতে উনি দাঁড়িয়ে পড়ে অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে আমার মুখের দিকে চাইলেন। বললেন, "আপনি তো আশ্চর্য নৈরাশ্যবাদী মশাই! আজকের দুনিয়ায় চালিয়ে যাচ্ছেন কি করে তাহলে?"

কি ছিল কথাটার মধ্যে, বলার ভঙ্গিতেও, এবার হাসি চাপতে পারলাম না আমি। বললাম—"থাকে আশার কিছু আপনার মতে তো তা থেকে তো বাদই পড়বে। এগোন তাড়াতাড়ি তাহলে।"

ঘুরেই একটা ভিড়ের সামনে পড়ে যেতে বললেন—"এই নিন, এগুতে দিলে কেন এগুব না। চলে আসুন ভেতর দিয়ে।...হ্যাঁ, যেখানে যা ব্যবস্থা। ...বলছিলাম, হাল ছেড়ে বসব কেন একেবারে? গিয়ে হয়তো দেখবেন, কোথায় কোন্ স্ক্রুটা ঢিলে হয়ে ইঞ্জিন ধুঁকছে, অত রোয়াবের দিল্লী এক্সপ্রেস আধঘণ্টা লেট। ভুগেছি যে। কোন্‌টে এরা ঠিক চালাতে পারছে মশাই! খেতে দিতে পারছে? পরতে দিতে পারছে? কোন্‌টে পারছে যে দিল্লী এক্সপ্রেস সময়ে ছাড়বে বলে হাত পা এলিয়ে দিয়ে বসে থাকতে...ঐ যাঃ, আর কোথায় যাচ্ছেন?"

বকতে বকতেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থেমে যেতে আমিও দাঁড়িয়ে পড়ে প্রশ্ন করলাম—"কি হল?"

"চোখ-কান বুজে থাকার অব্যেস দেখছি। ঐ তো সাত নম্বর প্ল্যাটফরম্ —গার্ডের হুইসিল শোনা গেল—রাক্কুসে ইঞ্জিনটাও গাঁক গাঁক করে সাড়া দিয়ে উঠল—তাহলে আর কিসের আশায় এগিয়ে যাচ্ছেন?"

উল্টো চাপ, অত দুঃখের মধ্যেও বুঝি হেসে ফেলি। কোন রকমে সামলে নিয়ে বললাম—"তাহলে?"

"তাহলে—জনতা এক্সপ্রেস—এই সাত নম্বরের—ন'টা পঞ্চান্ন। "খালি থার্ড ক্লাশ তো?"

"সম্মানে বাধবে আপনার?"—একটু ব্যঙ্গের স্বরে প্রশ্ন করলেন। বললেন —"আমি তো মনে করব বাঁচল কটা টাকা। কে দেয় মশাই আজকের বাজারে?"

"না, সেকথা বলছি না। বড্ড ভিড় তো।"

"পশ্চিমের শেষ গাড়ি, অন্তত হাজার চারেক লোক যাচ্ছে গাদাগাদি হয়ে —তাগড়া তাগড়া সব..."

"সেই কথাই আমিও বলছি..."

"তার মধ্যে আর দুজন ক্ষীণজীবী বাঙালীর জায়গা হবে না? আসুন, অত নিরাশ হলে কাজ হয় না আজকের দুনিয়ায়।"

ঘুরে থার্ড ক্লাস টিকিট ঘরের কাছে এসে ওঁর মুখটাও গেল শুকিয়ে। পাক

দিয়ে দিয়ে কিউ-এর লাইনটা এসে দাঁড়িয়েছে তা প্রায় হলের একদিকের আধখানা জুড়ে। অবশ্য 'জনতা'র এখনও প্রায় তিন কোয়ার্টার দেরি। কিন্তু কিউ-এর অবস্থা দেখলে বোধ হয় না যে তা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শেষ হবে, এখন গিয়ে সব পেছনে দাঁড়ালে। জগুবাবু কপালে একটা আঙুল চেপে মাথাটা হেঁট করে ভাবছিলেন, হঠাৎ মুখ তুলে বললেন—"হয়েছে! আসুন আমার সঙ্গে। না, দাঁড়াবেন এখানে?"

কেমন একটা বিশ্বাসও এসে গেছে লোকটার ওপর, ঠিক যে কেন তা বলতে পারি না। বললাম—"চলুন না, সঙ্গেই যাই।"

ভদ্রলোক এখান থেকে লোক্যাল ট্রেনের কাউণ্টারের কাছে এসে ঘুরে ঘুরে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। খুবই অদ্ভুত ঠেকছে, শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে বললাম—"এ তো লোক্যাল সেকশন মশাই, এখানে দিল্লীর টিকিট…"

বিরক্তভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন, মুখটা কুঞ্চিত করে বললেন—"দয়া করে মাথাটা একটু ঠিক রাখতে দিন তো মশাই। আপনিও রাখুন যতটা পারেন।"

আর একটু খোঁজাখুঁজি করে মাথাটা দুলিয়ে বললেন, "নাঃ, কাজ পড়েছে কিনা আর থাকবে কেন?…আসুন।"

আবার আগের সেকশনটায় নিয়ে গেলেন, এবার ঘুরে একবারে পেছনের দিকে একটা টিকিট ঘরের কাউণ্টার থেকে একটু তফাতে। 'কিছু' নেই, শুধু কয়েকজন স্ত্রীলোক একটু ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় সব ভদ্রবেশে, টিকিট কেনারই ব্যাপার। জগুবাবু দূর থেকে দাঁতে নখ খুঁটতে খুঁটতে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে ঐ দিকে দৃষ্টি ফেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলেন, তারপর নিজের মনেই বলে উঠলেন—"না, খ্যাক্ করে উঠবে।… আসুন, কিউই সম্বল, মাঝে পড়ে খানিকটা দেরি করিয়ে দিলে। আপনার কম্ম নয়, আমিই দাঁড়াচ্ছি, শুধু দেখবেন, কেউ পকেট মারছে কিনা। পারবেন?"

একটু ব্যঙ্গের টোনেই, মেজাজটা ক্রমেই রুক্ষ হয়ে আসছে। বললাম—"এ আর শক্ত কি? পাশে দাঁড়িয়ে একটু নজর রাখা।"

"শক্ত। অপরের পকেটে নজর রাখতে নিজেরটা ফাঁক করে দিয়েছে। ভুক্ত-ভোগী।"

সেটাও যেন আমারই দোষে এইভাবে মুখটা করে দাঁড়ালেন গিয়ে ফটকের পেছনে।

মাত্র মিনিট খানেক। জন তিনেক ওঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, কপালে

তর্জনী রেখে হেঁট হয়ে এক-পা এক-পা করে এগুচ্ছিলেন, হঠাৎ—"হয়েছে! হয়েছে!"—করে উঠে বেরিয়ে এসে আমার হাতটা ধরে একরকম টেনে নিয়েই চললেন বাইরের দিকে। বলতে বলতেই চললেন—"অবিশ্যি, যদি থাকে এখনও রাত্রি হয়ে গেছে তো—চলুন ভাগ্যপরীক্ষা…"

লোক্যাল সেকশন্ পেরিয়ে বাইরে এলেন। আমায় ধরেই রয়েছেন। কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ে প্রতিরোধের বা প্রতিবাদের ক্ষমতাটাও হারিয়েছি আমি। ভিড় পাৎলা হয়ে আসছে, রাস্তা খালি, পেরিয়ে বাস-স্টাণ্ডে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমায় একটা টান দিয়ে বলে উঠলেন—"রয়েছে! জয় মা জগদম্বা!"

সেই স্ত্রীলোকটি। সেইভাবেই শিশুটিকে বুকে চেপে একটা বাসের পাশে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছিল, আমায় ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে বললেন—"ও মেয়েটি! শোন তো বাছা।"

হঠাৎ একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে গেল। এই একটু আগেই অতখানি বকাবকি করেছেন, স্ত্রীলোকটি নিশ্চয় চিনতে পেরে অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে, বাসেরও এদিকের যাত্রীসব মুখ ঘুরিয়ে বিস্মিত ভাবে আছে চেয়ে। আমার অবস্থা, আবছা আবছা যেন আন্দাজ করতে পারলেও যেখানে ছেড়ে দিয়েছেন বিমূঢ়ভাবে সেইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, পা বাড়াতে পারছি না।

মেয়েটি না এগুতে উনিই গেলেন এগিয়ে। পকেট থেকে পাঁচ বা দশ পয়সা এই রকম মাঝারি গোছের একটা কিছু বের করে ওর হাতে দিয়ে বললেন—"এই নাও। এইবার—একটু আসতে হবে আমার সঙ্গে—কিছু ভয় নেই মা—এই স্টেশনের মধ্যে—পাচ মিনিটও নয়—এসো, লক্ষ্মী মা আমার এসো, পাঁচ মিনিটও নয়—আবার যেমন চাইছ সেই রকম চাইবে এসে—"

দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে স্ত্রীলোকটি, বাস থেকে কয়েকজন বয়স্ক যাত্রী বললেন—"যাও না, মা বলে যখন ডাকছেন—ভদ্রলোক…নিশ্চয় পুষিয়েও দেবেন…"

একবার ওঁদের দিকে চেয়ে নিয়ে অগ্রসর হল স্ত্রীলোকটি। উদ্দেশ্যটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার কাছে, আর কোনও প্রশ্ন করলাম না। এখন পরিসমাপ্তিটা কি ভাবে হয় তাই নিয়েই শুধু একটা কৌতূহল লেগে রইল। রাস্তা পেরিয়ে আবার স্টেশনে প্রবেশ করলাম তিনজনে, তারপর পাৎলা ভিড়ের

মধ্যে দিয়ে থার্ড ক্লাস ওয়েটিং হলে সেই মেয়েদের টিকিটঘরের খানিকটা তফাতে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা, ওরই মধ্যে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে। স্ত্রীলোকটি বেশ একটু হতভম্ব হয়ে পড়েছে। সত্যই ভিখারিণী হোক বা লোক-দেখানো হোক, সাজটা ঠিকই আছে ; একটা আধ-ময়লা চওড়া রাঙা পেড়ে শাড়ি, মাথার মাঝখানটায় বেশ-খানিকটা ছেঁড়া, গ'য়েও দু-এক স্থানে, আঙ্‌রাখার বালাই নেই, হাতে দু'গাছা করে তামার চুড়ি। কৃত্রিম হোক, স্বাভাবিক হোক, মুখের ভাবটা বেশ করুণই'ছিল, তারপর একটা অনিশ্চিতের বিমূঢ়তা এসে গিয়ে আরও আতুর দেখাচ্ছে।

জগুবাবুর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর দিকে চেয়ে কপালে তর্জনী রেখে কি একটা ভাবছিলেন ; মাথাটা একবার দুলিয়ে নিজের মনেই বললেন—"না, চলবে না।" একবার ঘাড় হেঁট করে নিজের দিকে চাইলেন। গলায় একটা পুরনো আধ ময়লা মটকার চাদর জড়ানো ছিল, খুলে নিয়ে বললেন—"এইটে ভালো করে গায়ে মাথায় জড়িয়ে নাও তো মা!...দ্বিধার কিছু নেই, নাও।"

মেয়েটি দ্বিধাগ্রস্তভাবেই হাত বাড়িয়ে নিতে বললেন—"ও ভাবে হবে না তো, ছেলেটিকে আমার কোলে দাও। দাঁড়াও টাকাটা বের করে নিই।... আপনারটাও দিন মশাই।"

দুজনে ভাড়ার টাকাটা একসঙ্গে করে ওর হাতে দিয়ে বললেন—"এইবার দাও খোকাকে। নিজের, না, কমিশন বেসিসে?...যাই হোক, সে খোঁজে আমার দরকার নেই। তুমি দাও।"

নিঃসঙ্কোচে ওর কাছ থেকে নিয়ে বুকে ঐ রকম করে চেপে মাথায় আস্তে আস্তে ঘা দিলেন কয়েকবার। বাচ্চাটা উঠে পড়বার মত হয়েছিল—"না, না। এই যে রয়েছি মা"—বলে একটু দোলা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে মেয়েটিকে বললেন—"নিলে তো জড়িয়ে? হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। এবার যাও তো মা ওদের মধ্যে ভিড়ে। একেবারে ভয় করবে না। কিছু বলে দু'কথা শুনিয়ে দেবে, আমরা রয়েছি। টিকিটবাবুকে বলবে—দুখানা পাটনার টিকিট। যাও লক্ষ্মীটি, কোন ভয় নেই। ফেরত যা দেবে মুঠোয় করে নিয়ে আসবে। যাও!"

মিনিট তিন-চারের মধ্যেই মেয়েটি দুখানা টিকিট, একটা এক টাকার নোট আর তার সঙ্গে কিছু খুচরা নিয়ে এল। টিকিট দুটো তুলে নিয়ে জগুবাবু বললেন—"ওটা তুমিই রাখো।"

মেয়েটি চাদরটা খুলে দিতে যাচ্ছিল, একটু ভেবে নিয়ে বললেন—"ওটাও তোমারই থাক, অনেকদিন পরেছি।"

আমার হাতে একটা টান দিয়ে বললেন—"চলুন, এখনও গাড়ি হয়তো প্ল্যাটফর্মেই দেয়নি মশাই।..."

আর কিছু নয়, শুধু মাথাটা ঠিক রেখে যাওয়া একটু।

জ্যাঠামশাই

অরুণা সদর দরজার পাল্লা দুটো প্রায় একত্র ক'রে একটুখানি ফাঁকের মধ্যে দিয়ে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি বাইরে ফেলে দাঁড়িয়েছিল। রবিবার, দুপুর গড়িয়ে গেছে। ছটা দিনের পর এই একটা দিন পুরোপুরি নিজের করে পাওয়া, আড্ডা দিয়ে স্বামী নিরুপম এখনও ফেরেনি।

ভেতর বাড়িতে, মনে হল রান্না বা ভাঁড়ার ঘরে ঝন ঝন করে কি একটা শব্দ হল। হয়তো বেড়াল বা ইঁদুর, কিম্বা একসঙ্গে দুটোই। ঘুরে একটু বোঝবার চেষ্টা করছে, নিরুপম এসে উপস্থিত হল। প্রশ্ন করল—"এখানে এ ভাবে দাঁড়িয়ে যে!"

ওর প্রশ্নে ঘুরে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়েই রইল অরুণা, হঠাৎ কোন উত্তর জোগাল না মুখে। বেশ ভালো লাগে বৈকি; তুমি নেই—তাই একজনের ভাবনার অন্ত নেই, ঘর-বার এক করে অতন্দ্র প্রতীক্ষায় রয়েছে দাঁড়িয়ে। আলগাভাবে একটু জড়িয়ে ভেতরের দিকে পা বাড়িয়ে বলল—"এসো, বড্ড দেরি করে ফেলেছি আজ।"

একটু অনুতপ্ত কণ্ঠেই। যেতে যেতে প্রশ্ন করল—"বাবা এসেছেন?"

"এসেছিলেন; এইমাত্র কাপড় গামছা নিয়ে চান করতে গেলেন……ওগো, সর্বনাশ হয়েছে, বাঁচাও আমায়!"...

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চকিত হয়ে উঠেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নিরুপম। "কী সর্বনাশ হয়েছে!"

"বাবা বকাবকি করতে করতে বেরিয়ে গেছেন—আজ দেরি হয়ে গেছে—পুকুরে আহ্নিকও করবেন না–বাড়িতে যোগাড় করে রাখতে বলে গেছেন আমায়।"

"বেশ তো। তা এর মধ্যে সর্বনাশটা কোথায়?" বধূর অসংলগ্ন কথা তার সঙ্গে আলুথালুভাব দেখে বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করল নিরুপম।

দাঁড়িয়ে পড়েছে উঠানের মাঝখানে এসে। রোদের বেশ তাত, জড়িয়ে

ধরেই বলল—"উঠে এসো বারান্দায়। ব্যাপাখানা কি?"

আরও বিহ্বল হয়ে উঠেছে অরুণা, চোখ ছুটিও ছলছল করে উঠেছে। কথা যেন জোগাচ্ছিলই না, আর একবার তাগাদা দিতে ধরা গলায় বলল—"বাবা বলছিলেন একটা কে বদমাইস লোক ভালো করে খোঁজ নিয়ে—যে বাড়িতে পুরুষ কেউ নেই, বাইরে রয়েছে—বাইরে থেকেই নাম ধাম জেনে মেয়েদের ভুজুং-ভাজুং দিয়ে ভালো করে খেয়েদেয়ে নাকি সরে পড়ছে—স্থবিধে বুঝে কিছু—কিছু—কিছু—আদায় করে নিয়েও.…"

ভাঙা ভাঙা ভাবে বলতে বলতে দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো।

শুধু বিমূঢ় নয়, নিতান্ত বিব্রতও হয়ে পড়েছে নিরুপম। সমস্ত ব্যাপারটা এত অহেতুক, ওরও যেন কোন ভাষা জোগাচ্ছে না। একটু বিরক্তিও তো ধরে, সেই টোনেই প্রশ্ন করল—"কিন্তু তুমি তার জন্যে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছ কেন?—দেখো তো কাণ্ড, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে!"…

তারপর একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় আবার একটু অনুতপ্ত হয়েই পিঠে হাত দিয়ে বলল—"কেউ ছিলাম না বলে ভয় করছিল? ভয় কি অরু?—দিন-দুপুর—গ্রামের মাঝখানে…"

"এসে গেছে এ বাড়িতেও"—আদর পেয়ে স্বামীর বুকে মুখটা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে, নিরুপম কাঁধের দু'ধারে হাত দিয়ে একটু সামনে ঠেলে ধরেই বলল—"এসে গেছে কি গো!! তোমাকে ঠকিয়ে খেয়ে আদায় করে নিয়ে গেছে কিছু?—কী বললে?—কী আদায় করে নিয়ে গেল?—এসো ঘরে, গুছিয়ে বলো দিকিন একটু স্থির হয়ে। এসো লক্ষ্মীটি—যদি গিয়েই থাকে ঠকিয়ে করবার আর কি আছে?"

ঘরে গিয়ে পাশে বসিয়ে প্রশ্ন করে করে যা জানতে পারল তা মোটামুটি এই—

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আগেকার কথা। অরুণা ঝিয়ের সাহায্যে এদিকের সব ঠিকঠাক করে নিয়ে হেঁসেলে এবার রান্না শুরু করবে, সামনেই বারান্দায় ঝি বাটনা বাটছে, সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হল। ঝি হাত থামিয়ে "কে?" বলে সাড়া দিতে, নিরুপমের বাবার নাম নিয়ে প্রশ্ন হল, তিনি বাড়ি আছেন? নেই বলতে লোকটি বলল—"একবার বাইরে আসতে পার? দরকার আছে?"

অরুণার কথাতে ঝি মসলাবাটা ছেড়ে দরজার হুড়কো খুলে দাঁড়াল।

অরুণাও উঠে গিয়ে থামের একটু আড়াল হয়ে দাঁড়াল।

বেশ গোলগাল চেহারা লোকটার, মাথায় কাঁচা পাকা চুল, একগোছ টিকি, গায়ে পিরাণের ওপর একটা মটকার চাদর, ময়লাই, হাতে একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ। ঝি গিয়ে "কোথা থেকে আসছেন আপনি?" বলে দাঁড়াতে বলল—"তাহলে দেখছি আমায় চেন না।" নিরুপমের বাবার নাম করে জিজ্ঞেস করল—তিনি গেছেন কোথায়? কখন আসবেন? ঝি জানাল—তিনি নিরুপমের মাকে তাঁর ভাইপোর অন্নপ্রাশনে বাপের বাড়ি রেখে আসতে গেছেন, আজই দুপুরের গাড়িতে আসবার কথা। শুনে প্রশ্ন করল—"নিরু কোথায়—আমাদের নিরুপম?" ঝি জানাল, তিনি গ্রামেই আছেন, রবিবার, একটু ঘুরে-ফিরে খানিকটা দেরি করেই ফেরেন সাধারণত। একটু কি ভাবল, বলল—"সে অবশ্য চিনতেও পারবে না—আমি এর আগে যে বার দুই এসেছিলাম, ও তখন কলকাতায় থেকে কলেজেই পড়ছে কিনা। যাই তাহলে, কারুর সঙ্গেই দেখা হল না।"

যেন চলেই যাচ্ছে এইভাবে একটু ঘুরতে ঝি বলল—"একটু না হয় বসেই যান না, ওঁদের আসতে তো দেরি হবে না।" থমকে গিয়ে একটু হেসে বলল—"পিছু ডেকে দিলে? তাহলে তো যেতেই হয় বসে একটু। আমাদের তো খেষ্টানি ব্যাপার নয়, গুরুবংশ, এসব খটকাগুলো মেনে চলতে হয়।" ঝিয়ের সঙ্গে ভেতরে আসতে আসতে বলল—"তোমাদেরও গুরুবংশ হচ্ছি আমরা। ঠিক আমি অবশ্য তোমাদের গুরু নয়, গুরু আমার দাদা ঈশ্বরচরণ—নাম শুনেছ নিশ্চয়, হয় তো দেখেও থাকবে—আমি হচ্ছি তাঁর মধ্যম। ইটি কে, আমাদের নিরুর বউ বুঝি?"

গুরুদেবের ভাই শুনতেই অরুণা তাড়াতাড়ি নেমে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করল। আধ ঘোমটা দেওয়া ছিল, লোকটা বলল—"আমায় দেখে কি ঘোমটা দেয় মা? বাপ-খুড়োর মতন যে আমি। তা তুমি কবে এলে বাড়ি আলো করে?" ঝি-ই জানাল—সামনের মাঘে দু'বছর হবে। একটু চোখ তুলে হিসেব করে বলল—"তাই তো হবে।" দাদা এসেছিলেন, মনে আছে কিনা। নিরুর বাবার আমাকেও নিয়ে আসবার জন্যে সে কী ঝোলাঝুলি!—ভিন্‌গাঁয়ে শিষ্যি-বাড়িতে একটা ক্রিয়া ছিল, পেরে উঠলাম না। তা এবার যাই। বসা তো হল।"

এত শুনে আর তো ছেড়ে দিতে পারে না। যে গাড়িতে শ্বশুর আসছেন সেই গাড়িতে ফিরে যেতে হবে ওঁকে। পাশের গ্রামে কিছু দেবোত্তর জমিজমা

আছে, দেখেশুনে ফিরে যাচ্ছেন।

ঝি আর অরুণা অনেকটা জিদ করেই রাজী করাল থাকতে। খাওয়া হয় নি, এদিকে কায়েতের বাড়ি পক্কান্ন খান না—স্বপাকেরও সময় নেই। ওঁকে হাত পা ধুইয়ে ঘরে বসিয়ে দুজনে মিলে লুচি, পাঁচ রকম ভাজা-ভুজি—ঘিয়েই ভাজা, মোহনভোগ, ক্ষির দিয়ে বেশ ভালো করে বসে খাওয়াল।

দম বন্ধ করে শুনছিল নিরুপম, প্রশ্ন করল—

"তারপর? চলে গেছে?"

"না।"

তবে!"

স্বামীকে কাছে পেয়ে, তারপর সবটা মন খোলসা করে বলে নিয়ে বড় হালকা বোধ হচ্ছে নিজেকে অরুণার, হঠাৎ মুখটা দুহাতে ঢেকে এবার একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠল।

বিস্ময়ের যেন কূল পাচ্ছে না নিরুপম, বলল—"হেসে উঠলে যে!"

"ওপরের ঘরে রয়েছে..."

"ওপরের ঘরে!!"

হাসিতে কাঁপতে কাঁপতে শুধু মাথাটুকু দোলাতে পারল অরুণা কোন রকমে। সব কিছুর ওপর আবার ঘটা করে পা টেনে নিয়ে সেবা করতে যাওয়ার বাড়াবাড়িটা ওকে থামতেই দিচ্ছে না কোনমতে।

"ওপরে কি করছে!"—প্রশ্ন করল নিরুপম।

"ঘুমুচ্ছে।"—হাসিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল স্বামীর ঘাড়ে।

ও-ব্যাপারটাও শুনল নিরুপম। চাপ খাওয়ায় শরীরটা এলিয়ে পড়েছে, অরুণা আর ঝি জিদ করেই একটু আরাম করে নেওয়ার জন্যে ওপরের ঘরে নিয়ে গেল। খাটে উঠে শুয়েছে, অরুণার কেমন একটু ভক্তির ভাব এসে গেল—গুরুদেবের নিজের ভাই-ই তো, খাওয়াল-দাওয়াল, এবার একটু সেবা করবার ইচ্ছা হওয়ায়, ও খাটের কিনারায় দাঁড়িয়ে একটু পা টিপতে আরম্ভ করতেই ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকাতে লাগল। এর পরেই ঝি বাকি পাট সেরে দরজার খিল এঁটে দিতে বলে বেরিয়ে গেছে, অরুণাও আস্তে আস্তে আসছে নেমে এমন সময় শ্বশুর ঐসব কথা বলতে বলতে ঢুকলেন। উনি একটা গাড়ি আগেই এসে পড়েছেন।

ঝোঁকের ওপর এ পর্যন্ত বলে গিয়ে অরুণা আবার সেই রকম ত্রস্ত-বিহ্বল হয়ে উঠল। বলল—"ছাখো পোড়ারমুখী আবার হাসছি।...কী হবে গো?

মনে করেছিলাম না হয় উঠিয়ে দিই, তারপর বাবা কখন এসে পড়বেন—হয়তো সামনাসামনিই পড়ে যাবে—সাহস হচ্ছিল না—এই সময় তুমি এসে পড়লে। না, আমায় বাঁচাও—বাবা এক্ষুনি এসে ঐ ঘরের সামনে দিয়েই পুজোর ঘরে যাবেন—হেঁটোয় কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতবেন আমায়…"

হাসিতে-ব্যাকুলতায়, ভয়ে-নির্ভরতায় এমন রূপটি বোধ হয় আর কখনও ফোটেনি বধূর। একটা উপায়ের আভাস যেন আসছে একটু একটু করে মাথায়, নিরুপম একটু হেসে, আলগা ভাবে চেপে ধরে বলল—"দেখি কি করতে পারি।…যা করব বা বলব তাতে তুমি কিন্তু যেন কিছু বলতে যেও না, দূরে দূরেই থেকো বরং, যেন কাজ নিয়ে রয়েছ কিছু। গুরুর ভাইয়ের কথা চলবে না, ধরে ফেলবেন বাবা। যাও, আহ্নিকের ব্যবস্থাটা করে দিয়েছ বাবার ?…"

"নিরু এল বৌমা ? বড্ড দেরি করছে যে…বলতে বলতে কর্তা ভেতরে ঢুকলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই "মা কৈ গো ? যাই আমি এবার"—বলে 'গুরুঠাকুরের ভাইও' ওপরের বারান্দার ধারে এসে দাঁড়াল।

সামনাসামনি হয়েই। দুজনেরই চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। একজনের বিস্ময়ে আর নিশ্চয় ভয়ে, অন্য জনের—বিস্ময়ে তো বটেই, তার সঙ্গে—শিকার সামনে পেলে হয় তো বাঘের দৃষ্টি ঐরকম হয়ে ওঠে।

নিরুপম প্রস্তুতই ছিল, বলল—"বাবা, শ্বশুরবাড়ি থেকে আমার জাঠশ্বশুর এসেছেন। এখুনি আবার চলে যেতে হবে ওঁকে—একটা সতেরোর গাড়িতে। আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।"

"তোমার জাঠশ্বশুর ? কৈ, আগে…"

—অবশ্য চোখ দুটো একটু নরমই হয়ে এসেছে।

নেই জাঠশ্বশুর নিরুপমের, সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলেন, নিরুপম বলল—"আমার নিজের জ্যাঠামশাই নয় তো, শ্বশুরমশাইয়ের মামাতো ভাই। বিয়ের সময় আসতে পারেননি, তাই আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়নি। আমার সঙ্গে সেবারে গিয়ে দেখা হল।"

জাঠশ্বশুরের ওপর থেকে নামবার মতো অবস্থা নেই, একবার চোখ তুলে দেখে নিয়ে নিরুপম বাবাকেই বলল—"আসুন না ওপরে।"

উঠতে উঠতেই বলল—"আপনি ভাগ্যিস এক ট্রেন আগে এসে পড়েছেন, নৈলে এবারেও দেখা হত না।…আমার বাবা, জ্যাঠামশাই। এর আগে আপনাদের দেখাসাক্ষাৎ ছিল না।"

ধূর্ত লোক, এই ব্যবসা করছে, প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেও সামলে নিল। ভেতরে যাই থাক, বাইরে যা শুনছে তার সঙ্গে মিল রাখাই আপাততঃ যুক্তিসঙ্গত এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়ে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে সাধ্যমতো একটা গদ গদ ভাবই মুখে-চোখে টেনে এনে বলল—"আসুন বেহাই মশাই। নিতান্ত দেখা হওয়ার সৌভাগ্যটা আছে কপালে লেখা, তাই আপনিও একটা ট্রেন আগে এসে পড়েছেন, আমারও অরুমায়ের হাতের সেবা খেয়ে একটু আলস্য এসে গিয়েছিল।"

ভাঁওতার মধ্যে আস্তে আস্তে পঁড়ে যাচ্ছেন কর্তা ছেলে-'কুটুম' উভয়েরই। প্রতিনমস্কার হয়ে গেছে যথারীতি, একটু কুটুম্ব-সম্মিত অভিযোগের সুরেই বললেন—"কিন্তু এক্ষুনি যে চলে যাচ্ছেন শুনছি! বাঃ, একি অন্যায় কথা! তা কখনও হয়? এতদিন পরে যদি পায়ের ধূলো পড়ল···"

নিরুপম বলল—"সে আমি অনেক করে বলেছি। উপায় নেই বললেন। পাশের গ্রামে কি একটা কাজে এসেছিলেন···"

"দেবোত্তর সম্পত্তি আছে কিছু।"—ও জুগিয়ে দিল।

"হ্যাঁ, ঠিক, তাই বললেন তখন, দেখা-শোনা করে ফিরবেন···"

"অরুকে অনেকদিন দেখিনি"—বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলল—"ভাবলাম, এসেছি যখন, একটা ট্রেন ছেড়ে না হয় দেখেই যাই।"

আশ্চর্য হয়ে উঠছে নিরুপম ভেতরে ভেতরে ক্ষমতাটা দেখে। তবু কিন্তু সংযত হয়ে নিজের প্ল্যান অনুযায়ীই বলল—"তবে, কথা দিয়েছেন একবার এসে দুটো দিন কাটিয়ে যাবেন।"

"হ্যাঁ, তা কিন্তু যেতেই হবে বেহাই মশাই, আশা করে থাকব। উপস্থিত—যখন বলছেন···কৈ গো বৌমা, তোমার জ্যাঠামশাই যাচ্ছেন যে। এই সময় তোমার যত কাজ পড়ল? এঁকে তো ধরে রাখতে পারলে না একটা দিনও। কি করে বলি—সেয়ানা মেয়ে?"

ভাঁওতায় ডুবে গেছেন একেবারে। অরুণা আস্তে আস্তে উঠে এল, বলল—"রইলেন না যে কোন মতেই।" গলবস্ত্র হয়ে পায়ের ধূলোও নিল।

—কতখানি সেয়ানা মেয়ে হলে সম্ভব হয় শ্বশুর অবশ্য বুঝতে পারলেন না।

নিরুপমও পায়ের ধূলো নিল। চাপা রাগে সর্বাঙ্গ রি-রি করছে।

তিন জনেই নেমে এগিয়ে দিলেন। অরুণা দরজা পর্যন্ত। কর্তা আর নিরুপম আরও খানিকটা বেরিয়ে। বেহাই আর জামাইয়ের যেটুকু উচিত।

জামাই নিরুপম আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। বাড়ি ফিরেই বলল—"আমি না হয় গাড়িতে তুলেই দিয়ে আসব বাবা?—কখনও তো আসেননি এদিকে।"

"গেলে অবশ্য মন্দ হয় না। কিন্তু তোমার তো স্নানও হয়নি এখনও।"

"এসে সেরে নোব তাড়াতাড়ি। গাড়ির দেরিও নেই আর। একটা দিন বৈ তো নয়।"

বেরিয়ে গেল। এবং বেশ সূক্ষ্ম হিসাবের সঙ্গেই কাছাকাছি গিয়ে পড়ল। পো-তিনেক পথ। মাঝামাঝি টানা মাঠের মাঝখানে একটা পুরনো ইটের পাঁজা, কিছু আগাছা জন্মে একটু আড়ালের মত হয়েছে। এদিকে জনমানব নেই, আশ্বিনের রোদ মাথার ওপর ঝাঁ ঝাঁ করছে। রশি কয়েক দূর থেকে নিরুপম হাঁক দিল—"জ্যাঠামশাই, একটু দাঁড়াবেন?"

লোকটা ঘুরে দাঁড়াল, প্রশ্ন করল—"আমায় ডাকছ বাবাজী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা ভুল হয়ে গেছে, তাই তাড়াতাড়ি ছুটে আসতে হল।" —বেশ পা চালিয়ে আসতে আসতেই বলল।

এবং এর পরে আর বিলম্বও নয়। এসেই, কিছু বুঝে ওঠবার আগেই টিকির গোছাটা হাতে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে মাটিতে গুঁজড়ে দে মার! দে মার!—কিল-চড-লাথি, যেমন সুবিধা পাচ্ছে। বেশ আশ মিটিয়ে নিয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল—"এইটুকুই ভুল হয়ে গিয়েছিল ওখানকার আদর-যত্নে। যাও, আর এ-তল্লাটে কোথাও যেন দেখতে না পায় কেউ।"

বিশ্বাস নাই করলেন

কাহিনীটি বিশ্বাস করা শক্ত হবে জেনেও লিপিবদ্ধ করে রাখছি।

তবে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা যদি উঠলই তো এই বা কে কবে বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে, কলকাতার বুকের ওপর নিত্য সন্ধ্যায় এমন একটা কাণ্ড ঘটতে থাকবে—যার একটা উপায় বের করতে মন্ত্রিপরিষদ থেকে পৌরসভা, মায় ট্রাফিক-পুলিস পর্যন্ত সবাই যাবে হিমসিম খেয়ে? ট্রাফিক জ্যাম্, অর্থাৎ যানবাহনের অচলাবস্থার কথা বলছি। বিশেষ করে বড়বাজারের প্রায় আধাআধি থেকে নিয়ে গঙ্গার পুল, পরে হাওড়ার বাস-স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত। ট্রাম, বাস—একতলা, দোতলা—প্রাইভেট গাড়ি, ট্যাক্সি, টেম্পো, রিক্সা, মোটর

গাড়ি, ঠেলাগাড়ি, অশ্বযান, মুটে, হকার—যা কিছুর নমুনা আছে কলকাতায় সব এই মাইলখানেক ধরে একটা চাপ বেঁধে যায়। একবার যেটা একটু ঢুকে পড়ল তার আর পিছু হটে বেরুবার উপায় থাকে না, মিশ্র-পিণ্ডটা আস্তে আস্তে এগুতে থাকে। এটা বাড়ির গাড়ি, ঘণ্টায় পঁচিশ-ত্রিশ মাইল, ওটা ঠেলাগাড়ি, ঘণ্টায় দেড় মাইল, এ-ধরনের কোন তারতম্য নেই। সবকিছুই ঘণ্টায় মাত্র এত গজ। যানবাহনের জগতে এমন অপূর্ব সাম্যবাদ কুত্রাপি দেখা যায় না। হাজার হাজার বিচিত্র যানের অধৈর্য নিনাদে সমস্ত জায়গাটায় কান পাতা যায় না। তবু তারই মধ্যে আবার দেখেছি নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় ট্রামের ড্রাইভার পাশের ঠেলা গাড়িওয়ালার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল, তারপর উভয়েই বালিয়া জেলার অধিবাসী আবিষ্কার করে 'খৈনি-চুনা' সহযোগে পরিচয়টা অন্তরঙ্গতার স্তরে এনে ফেলায় প্রবৃত্ত হল।

করে কি লোকে? কাটিয়ে দিতে হবে তো কোনরকম করে এরই মধ্যে? রকমারি আছে। এ যা বললাম সেটা অবসর বিনোদন; যে-অবসরটা অযাচিত এবং অনিবার্যভাবে ঘাড়ে এসে পড়েছে। কিন্তু বিনোদ শুধু ট্রাম-বাসের ড্রাইভার-কণ্ডাক্টারেরই হতে পারে, আর সবার কাছেই তো সমস্যা। এতবড় সহর কলকাতা, এত মানুষ, কত বিচিত্র রকমের প্রয়োজন তাদের, কত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, অথচ জাঁতিকলে পড়ে ছটফট করা ছাড়া যেন উপায় নেই।

এইরকম একটা ছটফটানি ধরেছে আমাদের মিত্তিরমশাইয়ের। এক ট্যাক্সিতেই চলেছি আমরা, যদিও পূর্বে কোন পরিচয় ছিল না।

এক ট্যাক্সিতে রয়েছি আমরা এমহার্স্ট স্ট্রীটের চৌমাথা থেকে। হাওড়া আসতে হবে, ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-রিক্সা একটা যা-হয় কিছুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। একটা ট্যাক্সিই গেলাম পেয়ে। রাস্তার ওদিক দিয়ে যাচ্ছিল, হাঁক দিতে ঘুরে এসে এদিকে দাঁড়িয়েছে, পাশের একটা গলি থেকে মিত্তিরমশাই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে আমার আগেই দোরের হ্যাণ্ডেলটা ধরে বললেন— "হাওড়া যায়গা?" সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে হাঁক দিতে আরও তিনজন সরু গলির মুখ থেকে এক এক করে বেরিয়ে এল। একজন যুবা, বেশ ফিটফাট হয়ে সজ্জিত, তার পেছনেরটি পুরুত বলে মনে হল এবং তার পেছনেরটি বেরিয়ে আসতেই বোঝা গেল বিবাহের ব্যাপার। লোকটার এক হাতে একটা বড় পুঁটলি, একহাতে টোপর, সাজগোজে বোঝা যায় নাপিত।

বেশ একটু হতচকিত হয়ে গেছি। তারপর ব্যস্তভাবে—"ওঠ, উঠে

পড়ো।”—বলে উনি দরজাটা খুলতেই বললাম—“কিন্তু আমি ধরেছি ট্যাক্সিটা।”

“বাঃ, তা কি করে হবে।”—একটু গা-জুরি করেই হ্যাণ্ডেলটা চেপে ধরলেন ভদ্রলোক।

বললাম—“জিজ্ঞেস করুন ড্রাইভারকে।”

ড্রাইভার একজন পাঞ্জাবী। আমাকেই সমর্থন করতে হাতটা আলগা হয়ে গেল ভদ্রলোকের। আমার দিকেই চেয়ে একটু ব্যাকুলকণ্ঠেই বললেন—“আমার যে বড্ড দরকার, দেখতেই পাচ্ছেন।”

বললাম—“যাবেন কোথায়?”

“হাওড়া স্টেশন।—কটা বাজল বিট্‌ঠল? ঠিক করে দেখে বলো।”

ছেলেটি হাতঘড়ি দেখে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে জানাল—“সাতটা পাঁচ।”

“ঐ নিন, ট্রেন ধরতে হবে। আর সময় কোথায়?”

ড্রাইভারকে বললাম—“আমি হাওড়া হয়েই বেরিয়ে যাব, এঁদের নামিয়ে দিয়ে যেতে আপত্তি আছে?”

ওদের থাকে না আপত্তির কিছু। ডবল ভাড়াই পায়। সেই থেকে একসঙ্গে আসছি। ওদের জন্য পেছনকার সীট ছেড়ে দিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে বসেছি আমি।

মহা ব্যস্তবাগীশ মানুষ।

প্রত্যেকের হাতেই একটা করে সুটকেস, নাপিতেরটা বেশ বড়ই, উঠে পর্যন্ত চমকে চমকে উঠে একবার এটা একবার ওটা খুলে লণ্ডভণ্ড করছেন—“ওরে দ্যাখ ওটি ছাড়েনি তো! আন তো দেখি, সেটা দিয়েছে কি না।”

তারই ফাঁকে ফাঁকে ড্রাইভারকে তাগাদা—“চালাও ঠিক করে। সামনে ট্রাম তো পাশ কেটে বেরিয়ে যাও—এ কি কাণ্ড!”

“জরিমানা দিবে বাবু?”

“জরিমানাই বা দিতে হবে কেন? আর ড্রাইভার দেখিনি; না আর ট্যাক্সি চড়িনি? কটা বাজল বিট্‌ঠল? ঠিক করে দেখে বলো।”

ছেলেটি হাত উল্টে গণনা করছে, হঠাৎ চমকে উঠলেন—“তোমার রূপোর জাঁতি! জাঁতিটা কোথায় ফেললে? ঐ নাও, একটা অনর্থ হবেই।”

“আপনি তো সুটকেসে রেখে দিতে বললেন, হারিয়ে যাবে বলে।”

“বলিনি আমি।”

"বললেন তো।" নরম হয়েই বলল ছেলেটি। বেশ সুবোধ-সুশীল গোছের।

"বলিনি!"—চটেই উঠলেন মিত্তিরমশাই। বললেন—"দেখাও কোন্ সুটকেসে রাখতে বলেছি। আনো দেখি।"

একটা একটা করে তিনটে সুটকেস খুলে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, জাঁতি নেই। মিত্তিরমশাই গা এলিয়ে দিলেন পিঠের গদিতে। হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন—"জানি একটা কিছু হবেই।"

আমি রাস্তার একঘেয়েমিটা ভাঙবার জন্যেই মাঝে মাঝে ঘুরে দেখছিলাম, বললাম—"তখন যেন মনে হল আপনি একটা সুটকেস থেকে বের করে পকেটে কি রাখলেন।"

মিত্তিরমশাই ক্লান্তভাবে গদিতে এলিয়েই এমনভাবে আমার পানে চাইলেন যেন এর মধ্যে আমার প্রবেশ করে জটিলতা বৃদ্ধি করা তাঁর মোটেই রুচিকর নয়। স্থূল শরীর, একটা চিনে-কোট পরা। মিনিটখানেক সামনেই চেয়ে থেকে কি মনে হতে দুহাতে ওপর থেকে পকেটগুলো চেপে চেপে ভেতরের পকেট থেকে জাঁতিটা বের করলেন। একবার দেখে নিয়েই ও সম্বন্ধে আর একটিও কথা না বলে ব্যস্তভাবে গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন—"কোথায় এল মোটর তোমার ড্রাইভার—? একি, এখনও যে চিৎপুর পেরোওনি মনে হচ্ছে। মজালে দেখছি তুমি আজ!"

"কলকাতার হ্যারিসেন রোড আছে বাবু, ইয়াদ রাখতে হবে।"

মিত্তিরমশাই একেবারে ক্ষেপে উঠলেন—"আমার ছেলের বিয়ে, আটটা সাঁয়ত্রিশ থেকে লগ্ন, দশটা সাতান্নয় শেষ। ট্রেন ধরতে হবে—শ্রাবণ মাসে এই শেষ দিন—এরপরেই ভাদ্দোর, আশ্বিন, কার্তিক গিয়ে—একেবারে অঘ্রাণের সেই সাতাশে—আর তুমি কি না আমায় হ্যারিসন রোড দেখাচ্ছ!...দেখছেন তো?—কাকে যেন বলছি।"

শেষের সাক্ষী মানাটুকু আমাকেই। এরকম বিরক্ত করলে যা অবশ্যম্ভাবী তার কথাটাই বলতে হল—"এই ভিড়ে তাড়াহুড়ো করে শেষে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে বসবে?"

চটে উঠলেন আমার দিকে চেয়ে—

"আপনিও তো বেশ, বাঙালী হয়ে ওর সঙ্গে একজোট হয়ে গেলেন! আর এই যে বিয়েটাই পণ্ড হতে চলেছে—চার মাসের মধ্যে আর দিন নেই, এটা তাহলে আপনার মতে আর অ্যাক্সিডেন্ট নয়? বাঃ, বেছে বেছে খুব লোককে

সঙ্গী করেছি তো! কোথায় একটু বুঝিয়ে বলবেন—বসেও রয়েছেন সামনে, না, আরও ওরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে যাচ্ছেন।···ওকি, একেবারে যে থেমে গেলে!"

"লাল সিগ্‌ন্যাল নজর না আসছে!"—নির্বিকারভাবেই প্রশ্ন করল ড্রাইভার।

চিৎপুরের চৌমাথায় অটোমেটিক সিগন্যাল। মিত্তিরমশাই ওর প্রশ্নে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন—

"না, পড়ছে না নজরে লাল সিগন্যাল—যে চোখে সর্ষেফুল দেখছে তার নজরে পারে না পড়তে। তুমি ব্যাক করো, ফিরে যাই, অন্য ব্যবস্থা দেখি। তোমায় আর ঘটা করে লাল সিগন্যাল দেখাতে হবে না আমায়।"

বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। ড্রাইভার হলদে সিগন্যালের জন্যে নির্বিকারভাবে সামনে চেয়ে আছে, সঙ্গে সঙ্গেই স্টার্ট দিতে হবে তাকে, আমিই বললাম—"একবার দয়া করে পেছন দিকটা দেখলেই বুঝতে পারবেন সেটা আর সম্ভব কিনা। ওকে বলে তো লাভ নেই।"

গলা বাড়িয়ে ঘুরে পেছন দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ পর্যন্ত সেইভাবেই থেকে গেলেন মিত্তিরমশাই। আমরা ততক্ষণে পড়ে গেছি জাঁতিকলে—পেছনে গাদাখানেক ট্রাম, মোটর, বাস, রিক্সা, মোষের গাড়ি, ঠেলাগাড়ি আরও এসে পড়ে লাইনটা প্রতি সেকেণ্ডে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। পাশে তো রয়েছেই। এক ইঞ্চি নড়বার জায়গা নেই।

একসময় মাথাটা টেনে নিয়ে আমার দিকেই চেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—"বেশ মশাই, খুব তামাশাটা করলেন যা হোক!"

"আমি কি তামাশা করতে গেলাম বলুন?" বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলাম আমি। বললাম—"এ তো নিত্যই হচ্ছে, রোজদিনকার ব্যাপার।"

"বাঃ। বাঃ! চমৎকার! রোজদিনকার ব্যাপার, অথচ দিব্যি তো খাতির করে নিলেন তুলে গাড়িতে। বলিহারি যাই মশাই!"

এরপর যে একেবারে চুপ করে গেলেন তার কারণ অবস্থাটা সম্পূর্ণ বাক্যাতীত হয়ে পড়ল। ক্লাইভ স্ট্রীট পর্যন্ত কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে গেল গাড়িটা—সব গাড়িগুলোই—তারপর যে অবস্থাটা দাঁড়াল তাকে আর চলা বলা যায় না। দু'গজ চলে আবার দাঁড়িয়ে যায়; তারপর হয়তো গজখানেকের পর আবার পাঁচ মিনিট নট-নড়ন-চড়ন, আবার হয়তো গজ তিনেক। যানবাহনের শব্দের সঙ্গে মানুষের কণ্ঠ মিলে একটা নারকীয় কলরোলে জায়গাটা

ছেয়ে গেছে, তার মধ্যে মিত্তিরমশাই সামনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন। ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে নিয়ে হাওড়ার পুল পর্যন্ত এই মিনিট পাঁচেকের পথে যে পুরো একটা ঘণ্টা লাগল আমাদের, তাতে মাত্র দুবার পুত্র বিট্‌ঠলকে ঠিক করে ঘড়িটা দেখে সময়টা জানাতে বললেন। তাও কী যে বলল তাতে যেন কান নেই। তারপর গাড়ি পুলের ওপর উঠতে আবার গলা খুলল ওঁর।

হয়তো ভেবেছিলেন বড়বাজার পেরিয়ে নানা পথে নানা দিকে ভিড়টা চারিয়ে গিয়ে একটা সুরাহা হবে, উল্টে স্ট্যাণ্ড রোডের ভিড়টা এসে পড়ে অবস্থা আরও বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়তে একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠলেন। আমায় উদ্দেশ করে বললেন—"মশাই শুনছেন?···আপনি তো দেখছি দিব্যি নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছেন।"

একটু ব্যঙ্গের টোনেই।

বললাম—"তাছাড়া উপায় কি? কিছু যখন করবার নেই। আজ আবার কানে যাচ্ছে···"

"কী কানে যাচ্ছে আবার আপনার মশাই।"—একেবারে সামনে ঝুঁকে পড়লেন।

বললাম—"শুনছি একটা বাস কি করে একপেশে হয়ে গিয়ে ট্রাফিক একেবারে আটকে দিয়েছে।"

"তাহলে! আমার উপায় কি হবে ভেবে দেখেছেন?—বিট্‌ঠল ক'টা বেজেছে, ঠিক করে দেখে বলো।"

"আটটা তিপ্পান্ন"—হাত উল্টে নাকে চশমা ঠিক করে নিয়ে বলল বিট্‌ঠল।

"আ-ট্টা তিপ্পান্ন! ঐ নিন, লগ্ন আরম্ভ হয়ে গেছে ওদিকে, সে তো ট্রাফিক জ্যামের জন্যে আটকে থাকবে না।···ও মশাই! কানে তুলছেন না যে!"

বাক্যালাপ বৃথা জেনে আমি আবার ঘুরে বসেছিলাম, ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করলাম—"আমায় বলছেন?"

"আর কাকে বলব?···অন্য লগ্ন আর আছে পুরুতমশাই? খুঁজে পেতে দেখলে?—"

"চার মাস তেরো দিনের মধ্যে আর কিছু নেই, এক লহমাও নয়।"—গম্ভীরভাবে উত্তর করলেন পুরুতমশাই।

"ঐ শুনুন!"—আমার দিকে চেয়ে বললেন মিত্তিরমশাই।

—"তাহলে তো এ ব্যাটার বিয়ে শিকেয় তোলা রইল—জন্মের মতন।

সব কথা বলিনি বোধহয় আপনাকে ?”

বললাম—“ফুরসত কোথায় আপনার ? ড্রাইভার আর সুটকেসগুলো নিয়েই তো পড়ে রইলেন।” এবার আমিই একটু ব্যঙ্গের সুর ধরলাম।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে একটু চেয়ে রইলেন। একবার দুদিকে ঝুঁকে মোটরের দুটো পাশ দেখে নিলেন, বোধহয় নেমে হেঁটে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভেবে। কোন উপায়ই নেই দেখে ব্যাকুল মিনতির সুরে বললেন—“তা হলে শুনুন দয়া করে। বের করুন একটা উপায়—”

যা বলে গেলেন তার একটা সংক্ষিপ্তসারই দেওয়া চলে এখানে—

সারা জীবন সামরিক বিভাগে কমিসেরিয়েটে কাজ করে বছরখানেক হল বদলি হয়ে কলকাতায় এসে রয়েছেন। আর বছর তিনেক রয়েছে চাকরি। আশা করেছিলেন এখান থেকেই রিটায়ার করবেন, তাই মেছুয়াবাজারে একটা বাড়িও কিনে নিয়ে গোছগাছ করে নিচ্ছিলেন, হঠাৎ হুকুম বেরিয়েছে ইম্‌ফলে বদলি। তার মানে, চাকরির শেষ কটা বছর ঐখানেই।

এইটি বড় ছেলে। চব্বিশ বছর বয়স হল। ঝাঁসি থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে কলকাতাতে একটা ভালো ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মে কাজ পেয়েছে। জন্মায় দক্ষিণ ভারতের পুণায়। বছর বারো পর্যন্ত ওই অঞ্চলেই কাটে, বিটঠল ডাক নাম যে পড়ে গেছে সেটা আর ঘোচেনি, বাংলার মুখ তো এই প্রথম দেখা। ভালো নাম পান্নালাল।

ইম্‌ফলে গেলে আর এখন রিটায়ার করবার আগে ফেরবার আশা নেই। বিটঠলের বিয়েটা দিয়ে দিতে চান। মেয়েটির বাপ ওঁর কমিসেরিয়েটের বন্ধু বাসুদেব ঘোষ। বাড়ি উত্তরপাড়ায়। সেখানেই চলেছেন। বাসুদেব দুবছর হল রিটায়ার করেছেন।

প্রথমেই যা চোখে ঠেকল তার কথাই বললাম আমি—“কিন্তু বরযাত্রী তো দেখছি না।”

“সে অনেক কথা মশাই, বলতে গেলে আর রাত ফুরুবে না। এখন ছেলেটাকে কি করে ঝুলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে যেতে পারি তার একটা বুদ্ধি দিন না দয়া করে।”

যে-ধরনের মানুষ, অনেক কথা থাকা বিচিত্র নয়, আমি ওদিকটা বাদ দিয়েই বললাম—“কি বুদ্ধি দিই বলুন না। মেয়েকে হাতের কাছে না পেলে তো বিয়ে হবে না।”

“উঃ!” অধৈর্যভাবে শব্দ করে উঠলেন মিত্তিরমশাই। হাত দুটো ঝেড়ে

দিয়ে বললেন—"এত বড কলকাতা শহর একটা বিয়ের কনে পাওয়ার উপায় নেই। কী দুর্দৈব।"

ক্ষেপে গেল নাকি মানুষটা! বাক্যব্যয় বৃথা জেনেও বললাম—"ধরুন যদি যেতই পাওয়া। সেখানে সে কনেটির কি হবে তা হলে? তাঁরা তো ঠিকঠাক হয়ে বসে আছেন।"

ভদ্রলোক আমার দিকে চোখ পাকিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন—"তা হলে নেহাত না বলিয়ে ছাডলেন না মশাই। তার উপায় হয়েই যাবে।"

বেশ উঁচু গলাতেই আমিও তর্কের স্বরে বললাম—"উপায়টা কি বলুনই না, শুনি!"

"পূর্বরাগ বোঝেন? লভ্—আজকালকার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে।"—বেশ গলা ছেড়ে দিয়েছেন।—"তিরিশ বছর পরে দেশে ফিরে এসে দেখি, কি পূর্বরাগের ঘটারে বাবা! ইস্কুলে পূর্বরাগ, কলেজে পূর্বরাগ, অফিসে পূর্বরাগ, ট্রামে পূর্বরাগ, বাসে পূর্বরাগ, উঠতে পূর্বরাগ, বসতে পূর্বরাগ—পূর্বরাগে পূর্বরাগে সারা দেশটা মথুরা-বৃন্দাবন করে তুলেছে! বন্ধুর মেয়ে, সে নিজেরই মেয়ে, বলতে জিভে আটকায়, সে বেটিকেও এই ব্যাধিতে ধরেছে। পাডার ছেলে, এখনো ডাক্তারি পডছেই, শেষ হয়নি বাস্থ গোবেচারি মানুষ, আমি বললাম—খবদার এ-ব্যাপারে আস্কারা দিও না। এদিকে এ-ব্যাটাই বা বছরখানেকে কি কাণ্ড করে বসে আছে বা আমি মরলে কি করবে কে জানে মশাই? শেষে দুই বন্ধুতে পরামর্শ করে এই একরকম চুপি চুপিই বর নিয়ে গিয়ে···"

ঠিক এই সময় সেই অদ্ভুত যোগাযোগটা হয়ে গেল, গোড়াতেই 'অবিশ্বাস্য' বলে সেটার কথা উল্লেখ করেছি। মিত্তিরমশাই ডানদিকে চেয়ে একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন।

হাওডাগামী যানবাহনগুলো আবদ্ধ হয়ে চারটি লাইনে রয়েছে দাঁডিয়ে। আমাদের ডানদিকে একটি লাইন, বাঁদিকে দুটি। সবশেষে ফুটপাতে জনস্রোত। গাডি থেকে নেমে সেখানে কারুর পৌঁছবার উপায় তো নেই-ই, অধিকন্তু বাস, মোটর, অশ্ব, গো-যান, রিক্সার দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ওদিকে ঠিকমত নজরেও পডে না।

আমাদের গাড়িটার বাঁ দিকে একটি বাস, ডানদিকে একটি প্রাইভেট মোটরগাডি। মিত্তিরমশাইয়ের বক্তৃতা চলছে, এই সময় ডানদিকের এই গাড়িটি রাস্তা পেয়ে গজ দেড়েক এগিয়ে যেতে, আমাদেরই মত একটি ট্যাক্সি

পাশে এসে দাঁড়াল। এবং সত্যিই তাতে একটি যেন বিয়ের কনেই। আমারও দৃষ্টিটা গিয়ে একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল। অল্প আলো যে গিয়ে পড়েছে তাতে, সমস্তটুকু ঠিক মত দেখতে না পাওয়া গেলেও একটি গোলাপী রঙের ভেলের (veil) নীচে সাদা জরি দিয়ে বাঁধা খোঁপাটুকু বেশ স্পষ্ট এবং তা থেকে সমস্তটুকু আন্দাজ করে নেওয়া যায়। বয়স আঠার-উনিশ হওয়া অসম্ভব নয়। পাশে এদিকের দরজার ধারে একটি ভদ্রলোক, প্রায় মিত্তির মশাইয়ের বয়সী এবং বসেও আছেন মিত্তিরমশায়ের মত থমথমে মুখ করে। ওদিকেও অপেক্ষাকৃত কম বয়সের একজন। মেয়েটি মাঝখানে; সামনের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে। অবিশ্বাস্য যোগাযোগের আর একটি ব্যাপার, মেয়েটির কোলে একটি গোড়ের মালা। মাঝে মাঝে সাদা রাংতার স্তবকগুলো চিকচিক করছে। পাশে রজনীগন্ধার একটা বড গুচ্ছ।

মিত্তিরমশাই মুখটা আমার দিকে এগিয়ে নিয়ে আসতে আমি একটু ঝুঁকে পড়লাম; চাপা গলায় বললেন—"মশাই, কী কাণ্ড বলুন তো!"

ভাবলাম অবশ্য, সত্যিই মানুষটা পাগল হয়ে গেল নাকি, কিন্তু অস্বীকার করব না যোগাযোগের আকস্মিতায় আমার মাথাটাও যেন গুলিয়ে আসছে। একটা নিতান্তই সুদূর সম্ভাবনা—শত যোজনেরও ওদিকে—কিন্তু দোষ কি একটু ঠুকরে দেখতে?…অন্তত এই দুর্ভোগের মধ্যে একটু অবসর-বিনোদনের জন্যও।

ওর কথায় একটু তাচ্ছিল্যভাবে হাসলাম আগে, তারপর হাতটা চেপে ধরতে বললাম—"দাঁড়ান তাহলে, তাড়াহুড়োর কাজ নয়।…অবশ্যই যা ভাবছেন তা নয় নিশ্চয়…"

যা অটল গাম্ভীর্য, বার দুই কেশে নিয়ে একটু সাহস সঞ্চয় করে নিতে হল, তারপর একটু ঘাডটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললাম—"আপনাদেরও আমাদের মতন দুর্ভোগ দেখছি। মেয়েকে বোধ হয়…"

"একে দুর্ভোগ বলেন আপনি!"—ভদ্রলোক ফেটে পড়বার জন্য যেন একটা সুযোগই খুঁজছিলেন, গলা খুলে দিলেন একেবারে—"অভিধানে এর ভাষা নেই।…তোরা পারবি না তো গদি ছেড়ে নেমে আয় না—অন্ন নেই, বস্ত্র নেই—কোন দিকটা দেখবেন?—দেখিনি কলকাতা মশাই?—এই তার চেহারা?—একটু নড়েচড়ে বেড়াবে লোকে তারও উপায় নেই—কি নিগ্রহ বলুন দিকি? এই ঘণ্টার পর ঘণ্টা—আদ্দেক কলকাতার লোক জমে গেছে—সেখানে তাদের কথা ভাবুন তো—হা-পিত্যেশ করে বসে আছে—ফুল, সভাপতির মালা, সব

আমাদের কাছে—নাচ, তার আসলটা—গিয়ে পড়ব তবে মান থাকবে তাদের…”

“সভার ব্যাপার ?”—প্রশ্ন করলাম আমি। বললাম—“তার সময় নিশ্চয় উৎরে গিয়ে থাকবে। কটায় আরম্ভ ছিল ?”

“উৎরে তো গেছেই, সময় তো আর ট্যাক্সি-বাসের মতন দাঁড়িয়ে থাকবে না। আরম্ভ তারা যাহোক তাহোক করে করেই দিয়েছে। সাহিত্যসভা। প্রধান অতিথি, সভাপতি—এঁদের ভাষণগুলো আগেই প্রোগ্রামে ফেলে দিয়ে হাঙ্গাম মিটিয়ে রাখতে বলেছিলাম—পরে কে আর শোনবার জন্যে বসে থাকবে ? শেষের দিকে নাচ-গান। রীণারও দুটো তার মধ্যে, একটা বড় আবৃত্তি—‘বলাকা’—দুমাস ধরে রিহার্সেল দিচ্ছে…”

“আপনারই মেয়ে ?”

“নৈলে এ-দুর্ভোগ মাথায় করে বসে থাকি ?”

আমি এদিকে মনে মনে একটা প্ল্যান কষে যাচ্ছিলাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে, বললাম—“দুর্ভোগ বৈকি ! আমাদেরই মতন অবস্থা দেখছি।”

“আপনাদেরও সভা ?”

“তার চেয়েও গুরুতর। ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছি।”…“আচ্ছা, এক অবস্থার কথায় মনে পড়ে গেল—কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে এর আগে। নামটা একবার বলতে পারেন দয়া করে ?”

“বটকৃষ্ণ বসু।”

পেড়ে ফেলুন আসল কথাটা মশাই।”—মিত্তিরমশাই হাতে একটা চিমটি কেটে অধৈর্যভাবে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন। মুখটা একেবারে আমার মুখের কাছে নিয়ে এসেছেন। চাপাগলাতেই বললাম—“উতলা হলে চলে ? বসু-মিত্তির, গোত্রের মিলটা তো হল।”

উনি আমার হাতটা চেপে বসে রইলেন। একটু একটু কাঁপছেন উত্তেজনায়।

ওদিকে ঝুঁকেই আছি। মনে করার ভঙ্গিতে চোখদুটো কপালে তুলে কতকটা স্বগতভাবেই—(যদিও সজোরেই) আওড়ালাম—“বটকৃষ্ণ বসু—বটকৃষ্ণ বসু…”

তারপর ওঁর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম—“আচ্ছা, শিবপুরে আপনাকে কোথাও দেখেছি কি না বলুন তো—কোন সভা-সমিতিতে ?”

কলকাতার লোক, কখনও না কখনও আসবেই এপারে।

“শিবপুরে নয়, বাজেশিবপুরে।” বললেন উনি।

নাপিতকে বললাম—"তুমি এখানটায় এসে বসো তো গুণধর, আলাপ করি একটু। ভেতরে ভেতরেই এসো, নামবার তো জো নেই।"

জায়গা বদল করতে করতেই ওঁকে উদ্দেশ করে বললাম—"শিবপুর—বাজে-শিবপুর তো আমরা আলাদা ধরি না।"

খরুট-পঞ্চাননতলা থেকে নিয়ে গঙ্গার ওপারে যে কোন জায়গা সম্বন্ধে ঐ কথাই বলতাম। প্রশ্ন করলাম—"কোনও সভা-সমিতিতে নিশ্চয় ?"

"ছেলে দেখতে, রীণার জন্যেই। এই তো মাস দু-একও হয়নি।"

"বললাম না ?"—মিত্তিমশাইয়ের দিকে চেয়ে টীকা করলাম আমি। উনি ইতিমধ্যে পুরুতমশাইয়ের সঙ্গে জায়গা-বদল করে নিয়ে পাশে বসেছেন। বললাম—"সাজানো ঘর, একঘর মানুষ···"

"সভাই তো এক রকম।" সায় দিলেন মিত্তিরমশাই। একেবারে কাছাকাছি, আর কথা কয়ে বলবার উপায় নেই, মিত্তিরমশাই বুড়ো আঙুল দিয়ে পাঁজরটায় খোঁচা দিয়ে তাগাদা দিলেন।

"কার বাড়িতে বলুন তো"—বসুমশাইকেই প্রশ্ন করলাম। বললাম—"একটু যেন গোলমাল করে ফেলছি।"

"নবীন চৌধুরীর বাড়ি।"

"হয়ে গেল ঠিক ?"

"কোথায় মশাই ? কেউ বলছে এত লেখাপড়া জানা আমাদের চলবে না, কেউ আবার এম-এর কমে রাজী নয়। কোথাও হয়তো খাই মেটাতে পারছি না—এমন ভাঙা রাশ মেয়েটার। এখানে আবার—যে দোষ কেউ ধরেনি আজ পর্যন্ত···"

"কী দোষটা ধরেছে ?"—আমরা দুজনেই ঝুঁকে পড়লাম। বললেন—"ছেলে নিজে দেখতে এল। গিয়ে বলেছে নাকি একটু খাঁদা।"

অল্প একটু চাপাই নাকটা। কিন্তু, যেমন হয়. তাতে ঘোরাল বেড়ের মুখটি যেন আরও মানানসই-ই করে দিয়েছে। আমি মিত্তিরমশাইকেই বললাম—"এই মেয়েকে খাঁদা বলে মিত্তিরমশাই! দেখুন তো। যদি আপনার বিটুর সঙ্গেই কথা হত (নামটা একটু মিষ্টি করেই বললাম) ছেড়ে দিতেন ?"

(ওঁর) তখন এমন অবস্থা মেয়ের নাক একেবারেই না থাকলেও নিয়ে নেন। অনুভব করছি উদ্বেগে সমস্ত শরীটাই কাঁপছে। বললেন—"মা আমার তো পরী।"

"আছে নাকি ওঁর ছেলে ?"—একটু অবহিত হয়েই প্রশ্ন করলেন বসুমশাই একরকম।

"ঐ তো পাশেই বসে। বর বেশেই। বলছিলাম না ?—আপনার চেয়ে আমাদের নিগ্রহ ঢের বেশি। বিয়ে করতে বেরিয়ে আটকে গেছে, যেতে হবে সেই উত্তরপাড়া। এদিকে লগ্ন শুরু হয়ে গেছে, শেষ দশটা সাতান্নয়। তার মানে এ-বিয়ে হল না আর কি।"

"কেন ?"—বেশ আগ্রহের স্বরেই প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক, বিটুঠলকে বার কয়েক দেখেও নিয়েছেন। বললাম—"সে অনেক কথা। এমন কিছু আছে যার জন্যে তাঁরাও পাড়াতেই দিয়ে দেবে বিয়ে। এদিকে ইনিও আর অপেক্ষা করতে পারছেন না।"

"নিন না আমার মেয়েটিকে দয়া করে!" ওরও গলা কেঁপে গেছে। প্রশ্ন করলেন—"কি করে ওঁর ছেলে ?"

বললাম—"সেদিক দিয়ে হীরের টুকরো। চেহারা দেখছেনই, এদিকে ইঞ্জিনীয়ার, কলকাতাতেই একটা বড় ফার্মে কাজ করছে। মেছুয়াবাজারে মিত্তিরমশাইয়ের নিজের বাড়িও রয়েছে। চান মেয়ের বিয়ে দিতে আপনি ?"

"আজ হয় তো কাল নয় মশাই। আসুন না একদিন আমার বাড়িতে—জোড়াসাঁকোয়..."

..."ঐখানেই তো আটকাচ্ছে। তাই তো ভাবছি, এমন যোগাযোগ, অথচ যেন বিধাতার ইচ্ছে নয়। আপনি বলছেন—আজ হয় তো কাল নয়, ওঁর আবার এখুনি না হলে কোন উপায় নেই। নিজে মিলিটারিতে কাজ করেন, ছেলের বিয়ে দিয়ে পরশু চলে যাবেন সেই কোন্ ইম্‌ফল, না কালিমপঙে। আর তিন বছর এ-মুখো হতে পারবেন না, তাই..."

"কিন্তু এখুনি কি করে হবে ? এখানে এই পুলের ওপর, এই অবস্থায়।..."

সম্ভব-অসম্ভবের মাঝখানে পড়ে উদ্বেগ-আশা-নিরাশায় ভদ্রলোক যেন কি রকম হয়ে গেছেন, কী যে বলবেন, কী ভাবে বলবেন ঠাহর করে উঠতে পারছেন না। শেষে আমতা-আমতা করে বললেন—"অন্তত দেনা-পাওনার কথা ঠিক করতে..."

অর্থাৎ আমাদেরই যা স্বার্থ, কতকটা তোষামোদেরই ভাব কন্যা কর্তার।

আমি হো-হো করে হেসে উঠে এক বিয়ের আসরই জমিয়ে তুললাম, বললাম—"দেনা-ছেলে, পাওনা-মেয়ে, এর অধিক কথা তো আমরা জানি না মশাই।—তারপর এখনই হওয়ার কথা—পাত্র-পাত্রী, পুরুত-নাপিত, টোপর-ফুল-মালা, সব মজুত। লগ্নও রয়েছে এখনও। এদিকে গঙ্গার পুল, মা নীচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছেন—এরচেয়ে পবিত্র বিয়ের আসরও তো..."

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়ে যাক্ !! লাগিয়ে দিন !! উলু-উলু-উলু !!—শুভস্য শীঘ্রম !!"

হ্যাঁ, ওদিককার কথাটা বলাই হয়নি। নানা রকম শব্দের সে একটা মিশ্র কলরোল উঠছিল, কখনও বেশি, কখনও কম, সেটার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই আমাদের কথাবার্তা চলছিল এবং তাতে পাশেই যে বাস দাঁড়িয়ে আছে তার এদিকের আরোহীরা আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা যতই পেকে আসতে লাগল তাদের কৌতুক ততই জমে এসে নানারকম মন্তব্য ভেসে আসছিল মাঝে মাঝে, অবশ্য সবই উদ্দীপক আর উৎসাহজনক। আমার কথা শেষ হয়ে আসার সঙ্গে ওদিক থেকে নানা কণ্ঠে উলুধ্বনি উপলব্ধি আর কৃত্রিম শঙ্খের নিনাদে একেবারে বিবাহ-প্রাঙ্গণের কলরোলটা উঠে আর সব শব্দই দিল চেপে।

এবং তারই মধ্যে—বিশ্বাস করুন বা নাই করুন—দুটো গাড়ির দরজা একটু করে ফাঁক হয়ে বর-পুরুত গিয়ে কনের গাড়িতে উঠল।

হেমন্ত-গোধূলি

প্রথম দেখা কামারকুণ্ডু স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। দুটো লাইন মিশেছে এখানে; নীচে দিয়ে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড, ওপরে উঁচু বাঁধ দিয়ে একটা পুল হয়ে তারকেশ্বর ব্র্যাঞ্চ। জংশন স্টেশন, তবে দুটো লাইনের কোনটাতেই তেমন ভিড় থাকে না। মধ্যে কামারকুণ্ডু। দুটো রেললাইন ছাড়া আরও একটা টানা রাস্তা আছে, প্ল্যাটফরম্ থেকে একটু সরেই। গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড। তিনটেতে মিলে স্টেশন কেন্দ্র করে খানিকটা জায়গা একটু জমকে দিয়ে আবার চারিদিকের উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

হেমন্তের বিকাল, সূর্যাস্ত হওয়ার আগেই আকাশে সন্ধ্যার বিষণ্ণতা এসে পড়েছে কিছু কিছু। অল্প একটু আগে একেবারে তিনখানা গাড়ি এসে তিনদিকে বেরিয়ে গেল; ওপরের লাইনে দুটো, নীচে হাওড়া বর্ধমানে একটা। স্টেশনটা হঠাৎ একটু বেশিরকম গমগমে হয়ে ওঠে, অপেক্ষমাণ যাত্রীদের প্রায় সব ক'জনই তিনটে গাড়িতে বেরিয়ে যাওয়ায় তেমনি হঠাৎ আরও বেশিরকম নিঝুম হয়ে পড়ল।

সঞ্জয় নেমেছে ওপরের একটা গাড়ি থেকেই, অর্থাৎ তারকেশ্বর লাইনের। দু' স্টেশন আগে হরিপাল থেকে আসছে, যাবে হাওড়া-বর্ধমানের ডাউন লাইনে

ডানকুনিতে। নেমেছে সাড়ে পাঁচটায়। ওর গাড়ি একঘণ্টা পরে। ওপরের প্ল্যাটফরমেই একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল সঞ্জয়।

খেয়াঘাটের মত স্টেশনের প্ল্যাটফরম্ও মনের ওপর একটা নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে সময়টা যদি সন্ধ্যা ঘেঁষা হয়, আর খেয়ার নৌকা বা গাড়ির থাকে বিলম্ব। উঁচু প্ল্যাটফর্মে টানা হাওয়ায় বেশ ভালো লাগতে লাগতে মনটা আস্তে আস্তে বিষণ্ণ হয়ে এল সঞ্জয়ের। দুটো প্ল্যাটফরম্ই শূন্য, ওর মনে হল এ যেন জীবনেরই সন্ধ্যা, দিনের কাজ সেরে আর সবাই বেশ ঘরে ফিরে গেল, ও-ই রইল একা পড়ে। বড়ই অসহায় বলে মনে হল যেন নিজেকে, বড়ই নিঃসঙ্গ। ওর খেয়ার নৌকার জন্যে আবার কতদিন থাকতে হবে পথ চেয়ে।

হেমন্ত-গোধূলির ব্যথাতুর সুর, ও-পরিবেশে না এসেই পারে না। অনেকক্ষণ ধরে তার মধ্যে ডুবে রইল সঞ্জয়। এক সময় একটি ছোট যাত্রী-দলের অনুচ্চ কোলাহলে একটু চটকা ভেঙে যেতে দেখল দিনের শেষ চিহ্ন মুছে দিয়ে সূর্য পশ্চিম দিগন্তরেখার নীচে বিলীনপ্রায়।

হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে উঠে পড়ল। ডানকুনিতে নামবে, কি সোজাই বেরিয়ে যাবে তখন তাড়াতাড়িতে ঠিক করতে না পারায় এই পর্যন্তই টিকিট কিনেছিল। একটা আবার কিনতে হবে। তারপর নীচের লাইনের ডাউন প্ল্যাটফরমে গিয়ে বসাই ভালো এবার।

তাই যদি করত—করতে পারত বলাই ঠিক—তাহলে মনটা অন্যমনস্ক হয়ে এ-ভাবটা যেত কেটে। এবং সে-ক্ষেত্রে এ কাহিনীটা সে-ভাবে শুরু হয়ে যে-ভাবে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে গেল তার কোন সম্ভাবনা থাকত না।

ওপর থেকে নেমে আসতে আসতে নীচের লাইনের ডাউন প্ল্যাটফরমের হঠাৎ এক জায়গায় দৃষ্টি পড়তে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়েই পড়ল সঞ্জয়। একটা গাছের চারিদিকে গোল করে গাঁথা রাঙা সিমেন্টের বেঞ্চে একটি মহিলা কোলে একটা বোধ হয় প্ল্যাস্টিকের বাস্কেট নিয়ে চুপ করে বসে আছে, পাশে জুতো-মোজা হাফপ্যান্ট বুশ-শার্টে ফিটফাট করে সাজানো একটি বছর আটেকের ছেলে। দৃষ্টি তার হঠাৎ আটকে গেল তার কারণ প্ল্যাটফরম্টা একেবারে নির্জন। তাহলেও উত্তরপাড়া কি শ্রীরামপুরের প্ল্যাটফরমে নিশ্চয় দৃষ্টি আকর্ষণ করত না। কিন্তু এই সুদূর মফস্বল স্টেশনে, যেখানে মেয়েযাত্রী অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর, এরকম রুচিসম্পন্ন গৃহস্থ মহিলার এ ভাবে, এমন সময় একা গাড়ির প্রতীক্ষা করা কেমন যেন অস্বাভাবিক বলে বোধ হয়। তার ওপর বর্ষীয়সীও

নয়, এক নজরেই যেমন মনে হল—চব্বিশ-পঁচিশের বেশি বয়স হবে না। বয়সের দিকে মনটা যেতে সঞ্জয়ের হুঁশ হল এ-ভাবে ওদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ শোভন হচ্ছে না। দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে নীচের ধাপে পা দিতে ছেলেটি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল, সঞ্জয়ের মনে হল মহিলাটিই কিছু বলায়। দাঁড়িয়ে উঠেছে ওরই দিকে চেয়ে, সঞ্জয় আর পুলের রাস্তা না ধরে লাইন টপকেই এগিয়ে গেল, প্রশ্ন করল—"আমায় কিছু বলবে?"

মেয়েটিও উঠে দাঁড়িয়েছে, সেই উত্তর করল—"একটু মুশকিলে পড়েছি। আপনি এখানেই থাকেন?"

"না"—উত্তরটুকু দিয়ে সঞ্জয় প্রশ্ন করল—"মুশকিলটা কি?"

দৃষ্টি ব্যাকুলভাবে একবার চারিদিক দিয়ে ঘুরিয়ে এনে মেয়েটি অসহায়ের মত বলল—"কি রকম জায়গা! তিনটের সময় একটা গাড়ি ছিল, সেটা মিস্ করে একেবারে সাড়ে তিনঘণ্টা পরে এইটে। এটাও আবার শুনছি প্রায় লেট থাকে। এমনিই তো সন্ধ্যে হয়ে এল!"

আবার সেইভাবে দৃষ্টিটা বুলিয়ে আনল চারিদিক দিয়ে।

"কোথায় যাবেন আপনারা?"—প্রশ্ন করল সঞ্জয়।

"ডানকুনি। দেখুন না, এইটুকু, মাত্র ঘণ্টাখানেকের রাস্তা, অথচ একটা গাড়ি ফেল করে এই ঝাড়া সাড়ে তিনঘণ্টা···"

—অনুযোগের সুরেই বলে যাচ্ছিল, সঞ্জয় বাধা দিয়ে বলল—"একটা কথা, সেই থেকে একঠায় এইভাবে বসে আছেন?"

"কি করব? এখানে, না হয় স্টেশনে। তার চেয়ে এখানে বরং···"

"চা'টা কিছু খাওয়া হয়নি?"

"তার জন্যে তো···"

"ছেলেটি রয়েছে তো সঙ্গে। একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি আসছি আমি।"

প্ল্যাটফরম্ থেকে কয়েক পা গিয়েই গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, কাছাকাছি জায়গাটা একটু একটু করে জমে উঠছে সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। পাশাপাশি দু তিনটা খাবারের দোকানও রয়েছে। সঞ্জয় একবার স্টেশনটা ঘুরে বেরিয়ে গিয়ে একটা ঠোঙায় করে কিছু খাবার নিয়ে এল।

কাছাকাছি এসে মেয়েটির বিস্মিত চোখের ওপর চোখ রেখে বলল—"আপনি আপত্তি করবেন জানি। আনতুম না—সময়ই থাকত না আনবার—স্টেশনে গিয়ে জানতে পারলাম গাড়িটা লেটই, প্রায় তিন কোয়ার্টার, তায়

আবার বাচ্চাটি সঙ্গে রয়েছে কিনা···ধর তো খোকা। চায়ের কথাও বলে এসেছি। আমি একটু জলের ব্যবস্থা দেখি।"

স্টেশন থেকেই ঘটি আর গেলাস যোগাড করে জল এনে দেখল এদের খাওয়া হয়ে গেছে। জল খাওয়া হয়ে গেলে ও-দুটো ফেরত দিয়ে চায়ের ভেণ্ডারকে সঙ্গে করেই নিয়ে এল।

মাটির ভাঁডে পাশাপাশি দু কাপ বেঞ্চের ওপর রেখে দিলে মেয়েটি বাস্কেটের মুখ খুলে দাম দেওয়ার জন্য ভ্যানিটি ব্যাগটা বের করবে, সঞ্জয় বলল—"দাম দিয়ে দিয়েছি। কতই বা আর?"

"এর সঙ্গে খাবারের দামটাও তো রয়েছে।"—মেয়েটি অপ্রতিভভাবে হেসে উত্তর করল।

"তাহলে অন্তত ছেলেটির জন্যে যা লেগেছে সেটুকু বাদ দিন।"

একটু হাসল মেয়েটিও। আস্তে আস্তে ব্যাগটা আবার বাস্কেটের মধ্যে পুরে দিয়ে ভাঁডটা তুলে নিয়ে একটু ঘুরে বসল।

একটু দেরি করে পান করা অভ্যাস বোধ হয়, সোজাসুজি ভালো করে দেখবার একটু সময় পেল সঞ্জয়। যদিও দেখবার যেন কিছু নেই, বরং যেটুকু আছে তাতে মনটা আরও উদাস করে ওপর প্ল্যাটফরমের সেই ব্যথাতুর ভাবটাই ফিরিয়ে আনল।

পায়ে একটা কালো স্ট্র্যাপশু, কালো সরু ফিতে-পাডের সাদা শাড়ি, সাদা-সিধেভাবেই পরা, একটা সাদা ব্লাউস, বাঁ হাতে একটি রুলি, ডান হাতটা খালি। এই বর্ণহীন নিরাভরণতার মধ্যে যে করুণ কাহিনীটা রয়েছে ইঙ্গিতের আকারে সেটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সীমন্ত-রেখায়। সেখানেও সিন্দুর নেই। সেই হেমন্ত-গোধূলির সুর—যে সঙ্গে থাকবে তাকে আগেই খেয়াঘাটে বিদায় দিয়ে একলা বসে থাকার। ছেলেটি রয়েছে, কিন্তু সে তো স্মৃতিটাকে স্পষ্ট করে আরও জাগিয়েই রেখেছে মর্মন্তুদ সুরটা।

চা শেষ হলে ভাঁডটা ফেলে দিয়ে ঘুরে বসল মেয়েটি; রুমালে হাত মুখ মুছে বলল—"ধন্যবাদ। যদিও অযথা এতখানি পরিশ্রম করে লজ্জায়ই ফেলেছেন।"

"কিছু না।"—উত্তর করল সঞ্জয়। বলল—"সময়টুকু পাওয়া গেল, তাই ভাবলাম—ছেলেটি রয়েছে···তা আপনি এসেছিলেন কোথায় এদিকে? অজানা জায়গা আপনার যেন মনে হচ্ছে।"

"অজানাই।"—উত্তরটা দিয়ে মেয়েটি যেন একটু বিব্রতভাবে বেঞ্চটার দিকে দেখে নিয়ে বলল—"কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন যে।"

গোল বেঞ্চে একজন অপরিচিতা মেয়ের সঙ্গে বসার অসুবিধা আছে। একেবারে কাছাকাছি বসা যায় না, আবার, একটু দূর হয়ে পড়লে দুজনের মুখ দুদিকে ঘুরে যায়। কথাটা বলে মেয়েটি উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, সঞ্জয় বলল—"তাতে কি হয়েছে? আপনি উঠবেন না।"

তখনই আবার মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা করে এগিয়ে অল্প একটু ব্যবধান রেখে তেরছা হয়ে বসে পড়ে বলল—"অজানা যে, বোঝাই যায় সেটা। কি সূত্রে এসেছিলেন?—এভাবে, একলাই বলতে হয়।"

মেয়েটি চোখ তুলে কি একটু ভাবল, যাতে অন্তরে যে-সুরটা উঠেছে তার জন্যই সঞ্জয়ের মনে হল, হয়তো নিঃসঙ্গতার কথাটা তোলা ঠিক হয়নি। একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল—"যদি আপত্তি থাকে, তো না হয় থাক।"

ঘুরে মুখের ওপর দৃষ্টি রাখল মেয়েটি। সঞ্জয়ের মনে হল মন থেকে কিছু একটা যেন মুছে দিয়ে একটু হেসেই বলল—"নাঃ, আমি ভাবছিলাম আরও তো একলাই আসতে হত, তাই ঠিকও করেছিলাম। খোকা বললে—জিদ ধরেই বসল, সঙ্গে আসবে···"

"রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' "—একটু হেসে মন্তব্য করল সঞ্জয়। "তাই অনেকটা। নারে খোকা?"

পদ্যটা নিশ্চয় জানে, ও-বয়েসের প্রায় সব ছেলেমেয়ের মতই। "ধ্যেৎ।"—বলে ঘাড় কাৎ করে একটু হাসল খোকা।

মেয়েটি বলল—"বীরপুরুষের খানিকটা নিগ্রহ গেল। কিন্তু আমি ভাবছি—জিদ করে না এলে এই জনমানবহীন প্ল্যাটফরমে একলা এই তিন ঘণ্টা যে কী করে কাটত!"

"জায়গাটার ওপর যেন আতঙ্ক ধরে গেছে আপনার।"—আবার একটু হেসে বলল সঞ্জয়।

"অস্বীকার করতে পারি না।"—হেসেই উত্তর দিয়ে মেয়েটি আগেকার প্রশ্নে এসে পড়ে বলল—"আমি এসেছিলাম একটা ইণ্টারভিউয়ে—এইখান থেকে মাইল চারেক দূরে একটা গ্রামে—মেয়ে স্কুলের একটা চাকরি। হয়তো হয়েও যাবে, কিন্তু মুখপাতেই যা অভিজ্ঞতা···"

"রাস্তাঘাট খারাপ?"

"না, সেদিক দিয়ে সুবিধে আছে, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড থেকে অল্পই ভেতরে যেতে হয়, সেটুকুও খারাপ রাস্তা নয়। ট্রেনের অবস্থার কথা বলছি। একটা যদি ছেড়ে গেল···"

"ভালো না লাগে নেবেন না।"

এর পরে আবার এমন একটা নিস্তব্ধতা এসে গেল যে সঞ্জয়ের মনে হল এটুকু বলাও একটা ভুল হয়ে গেল আবার। ঘরের কাজ ফুরিয়ে না এলে কি কেউ ঘর ছেড়ে বেরোয়? এই সন্ধ্যায় তো ঘরের দীপ জ্বেলে একজনের জন্য প্রতীক্ষাই করবার কথা। কতদিন যে করেছিল এক সময় তারই কথা হয়তো মনে করিয়ে দিয়ে আজ পদেপদেই আঘাত দেওয়ার একি দুর্ভাগ্য ওর। ভালো করতেই এসে না?

কি করে এ নিস্তব্ধতাটুকু ভাঙবে, ভাঙতে গিয়ে আবার হয়তো কি নূতন স্মৃতি জাগিয়ে তুলবে সেই কথাই ভাবছিল সঞ্জয়। ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করে প্রসঙ্গটা বদলেই ফেলতে যাচ্ছে, মেয়েটি আবার দিক-লগ্ন দৃষ্টি হঠাৎ ঘুরিয়ে এনে একটু সচকিত হয়ে উঠেই বলল—"এই দেখুন ভুল! আপনিও আমাদের জন্যে আটকে পড়লেন না তো?"

"না, আমিও এই ট্রেনেই যাব।"

"এই ট্রেনেই!"—স্পষ্ট একটু উল্লসিত হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন করল—"কোথায় নামবেন?"

"ডানকুনিতেই।"

"ওখানেই বাড়ি?"—প্রশ্নটা করে একটু ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে থেকে বলল—"এই জন্যে জিজ্ঞেস করছি, আমারও বাড়ি ওখানেই। কিন্তু কখনও আপনাকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।"

সঞ্জয় বলল—"বাড়ি নয় আমার ওখানে। আমি থাকি উত্তরপাড়ায়। একটু কাজ আছে, সেরে বাস ধরে চলে যাব।"

"ভালোই হল"—স্বস্তির স্বরেই বলল মেয়েটি। আমারও বাড়ি ঠিক ডানকুনির মধ্যে নয়। একটু ভেতরের দিকেই যেতে হয়, উত্তরপাড়ার বাসেই। বেশ হল।"

এরপর আলাপটা একটু ছড়িয়ে পড়ল। খানিকটা করে দুদিকের পরিচয়। ওর বাড়িতে বিধবা পিসিমা, বুড়োই হয়ে এসেছেন। একটি ভাই, স্কুল ফাইনালে পড়ছে, আর এই খোকা। দৃষ্টি ছেলেটির ওপর গিয়ে পড়তে একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

সঞ্জয় প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে খোকাকে নিয়েই পড়ল। নাম কি?

খোকার নাম তপনকুমার বসু।

'বীরপুরুষ' হয়ে বড় যে এসেছে সঙ্গে; পারে রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' আবৃত্তি করতে?

হ্যাঁ পারে খোকা।

করুক না আবৃত্তি তাহলে।

একেবারেই হল না। তারপর সঙ্কোচ কাটিয়ে প্রস্তুত হয়েছে খোকা; গাড়ির সার্চলাইট এসে পড়ল। লক্ষ্য করা হয়নি, প্ল্যাটফরমেই ঢুকছে গাড়ি।

ডানকুনিতে নেমে একসঙ্গেই তিনজনে স্টেশন থেকে বেরিয়ে আধাআধি এসেছে, উত্তরপাড়ার বাসটা টানা হর্ন দিয়ে রেলের গেট পেরিয়ে বেরিয়ে গেল। দাঁড়িয়েই পড়ল মেয়েটি। অসহায়ভাবে সঞ্জয়ের দিকে দৃষ্টি তুলে বলল—"যাঃ! আবার সেই কখন্। এদিকে রাত হয়ে গেছে! খানিকটা পরেই রাস্তাও তো ভালো নয় যে রিকশা করে নোব।"

"সে তো চলেই না, একা মেয়েছেলে।" উত্তর করল সঞ্জয়।—একটু ভেবে নিয়ে বলল—"আর একটা রিকশা করে সঙ্গে গেলে কেমন হয়। পরে ওখান থেকে পরের বাস ধরে নোব।"

"কিন্তু আপনার তো কাজ রয়েছে এখানে।"

"কাল এসে সেরে গেলেও হবে।"

রেলের গেটে কিছুটা দেরি হয়ে গেল, একটা মালগাড়ি এসে পড়েছে আপ্ লাইনে। পথও প্রায় মাইল-খানেক। রিকশা থেকে নেমে মেয়েটি বলল—"একটু না হয় আসুন না। এক মিনিটও নয় আমাদের বাড়ি। এত খুশী হবেন পিসিমা!"

"কখন্ এসে পড়বে বাসটা"—সঞ্জয় উত্তরে বলল।

এসেই পড়েছে। হর্নের শব্দের সঙ্গে দুটো হেড্ লাইট্ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"যাঃ!"—নিরাশ হয়ে বলে উঠল মেয়েটি—"একদিন কিন্তু নিশ্চয় আসুন; কী উপকার যে করলেন আজ!"

মোটরের আলো পড়ে চোখ দুটি চিকচিক করে উঠল। বাস থামিয়ে নমস্কার বিনিময় করে উঠে পড়ল সঞ্জয়।

সমবেদনাই। কিন্তু হেমন্ত-সন্ধ্যার সুর ধরে এমন গাঢ়ভাবে মনটাকে রাঙিয়ে দিয়েছিল যে, মন নিয়ে একটু বিচারে বসতে হল সঞ্জয়কে। এ যেন একটা আজানা অনুভূতি—ঐ যে সজল চোখে 'উপকারের' কথা, সেইটুকু ধরে। —কত যে করার আছে, কত যে করা যায়, কত যে করা উচিত··· কীই বা পেরেছে করতে ও?···

ভয় হয়। বিশ্বাস হয় না নিজেকে। ঐ বর্ণহীন সীমন্তরেখার একটা অলঙ্ঘ্য মর্যাদা আছে। সমবেদনার ছদ্মবেশে যদি অন্য কিছু তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়! বোঝা যায় কি নিজের মনকে সব সময়?

এর পর মাসখানেকের মধ্যে ঐ পথ ধরে যাওয়া আসা করল সভয়ে, তিনবার দিনমানেই, একদিন সন্ধ্যার মুখে। কিন্তু নামল না। এর পরই ঘটনাস্রোত যেন আপনিই ওর পথ ঘেঁষে এসে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল।

ওদের ওখানের মেয়ে-স্কুলের সহকারী সম্পাদক শেখর ওর বন্ধু। একদিন এসে বলল, একটি শিক্ষিকার জায়গা খালি হয়েছে, ওর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যদি কেউ থাকে তো চেষ্টা করে। গ্র্যাজুয়েট হওয়া চাই।

চোখ তুলে ভাবতে একটু বেশি সময় নিতে দেখে বলল—"শুধু পরিচিত হলেও চলে, সত্যি অভাবগ্রস্ত অথচ ভালো, এইরকম।" একটু অনুযোগের স্বরে বলল—"এবারেও সিনিয়ার মেম্বার নীলরতনবাবু তাঁর নিজের ক্যাণ্ডিডেট্ বসাতে চান্। বাঃ! তা কেন হবে! খাস জমিদারী নাকি!"

স্রোতটা যেন দুদিক থেকে চাপ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল সঞ্জয়কে। বলল— "আছে। ঠিক যেমন চাইছিস সেইরকমই।"

সেইদিনই বিকালে মেয়েটির বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হল। রাস্তার ধারেই তপনের সঙ্গে দেখা। খেলা করছিল, ছুটে এসে বলল—"কৈ এলেন না তো আর?"

"এই তো এসেছি।"—ওদের মতই একটু রসিকতা করল হেসে সঞ্জয়। প্রশ্ন করল—"সবাই আছেন বাড়িতে?"

"হ্যাঁ।" এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বলল তপন।—"জয়া পিসি এইমাত্তোর স্কুল থেকে এলেন।"

"কে জয়া পিসি!"—দাঁড়িয়েই পড়ল সঞ্জয়।

"বাঃ! সেদিন এক সঙ্গে এলাম সবাই, ভুলে গেলেন!"

"তোমার মা নয়?"—কী প্রশ্ন করছে যেন হুঁশই নেই সঞ্জয়ের।

"মা কি করে হবেন!"—কৌতুকের আর অন্ত পাচ্ছে না তপন। 'পিসি'-র ওপর একটু জোর দিয়ে বলল—"পিসিমা তো।"

"কেরে—তপু?"—বলে দরজার কাছে এগিয়ে এল জয়া। হঠাৎ আনন্দে বিস্ময়ে চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অনুযোগ করল: "বাঃ, খুব এলেন তো!"

সেদিনের সাজ। পিসিমার কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করে দিল: সেদিন

যাঁর কথা বলেছিল, যিনি না এসে পড়লে যে কী আতান্তরে পড়তে হত!···

"আমি এলাম বলে।"—বলে চলে গেল। আনন্দে, চাপা উত্তেজনায় একটু একটু কাঁপছে।

সব সেকেলে বর্ষীয়সীর মত পিসিমারও বকার অভ্যাস আছে। প্রশ্নও করতে হল না, আপনি সব বলে গেলেন পরিবার কাহিনী, বিশেষ করে ভাইঝিকে কেন্দ্র করে। বড ভালো মেয়ে, বড় বুদ্ধিমতী। বি-এ পাস করে এম-এ-ই পড়বে ঠিক করছে এই সময় হঠাৎ বিধি বাম হলেন। নিজে পড়বে কি, কোনওরকমে কাজল আর তপুকে পড়ানোই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল···

অবাঞ্ছনীয় প্রসঙ্গটা এসে পড়তে সঞ্জয় নিজেই অন্য প্রশ্ন তুলে চাপা দিতে যাচ্ছিল, জয়া এসে পড়ল।

শুধু স্কুলের সাজ বদলেই নয়। একটা ট্রেতে করে চা-জলখাবারও সাজিয়ে নিয়ে। একটু অনুযোগের স্বরেই বলল—"ওঁকে আর সে-সব শোনানো কেন পিসিমা? মনে করে এতদিন পরে যদিবা একবার এলেন···"

স্কুলের সাজ বদলে এসেছে, কিন্তু প্রায় সেইরকমই। পিসিমাও অনুযোগের সঙ্গেই বললেন—সঞ্জয়কে সাক্ষী মেনে—"বলি কি সাধ করে বাবা? নিজের দিকেও তো একটু চাইতে হয়। এই বয়সে সব সাধ আহ্লাদ খুইয়ে···"

এবারেও তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে দিল সঞ্জয়; এবার তার আসার উদ্দেশ্যটা এনে ফেলে। জয়াকেই আগে শোনাবে বলে রেখে দিয়েছিল।

চাকরিটা হয়ে যেতে যাওয়া আসা, মেলা-মেশাটা স্বভাবতই গেল বেড়ে। একটি কৃতজ্ঞ পরিবার নিবিড়ভাবেই ওকে আপন থেকেও আপন করে নিতে তৎপর হয়ে উঠল।···

এ-কাহিনীর নটে গাছটি এইখানেই মুড়িয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তা পারল না। হয়তো সম্ভবই ছিল না হওয়া।

সম্ভব ছিল না, সেদিন সন্ধ্যায় কামারকুণ্ডুর প্ল্যাটফরমে ঘনিয়ে আসা সেই অহেতুক সুরটুকুর জন্য, যেটা সদ্য-সদ্যই মূর্তি পেল জয়া-তপনের মধ্যে। একটু যে ভুল ভাঙল—তপন জয়ার ছেলে নয়, অতীত স্মৃতির শেষ অবলম্বন নয়, ভাইপো, এতে সেই ব্যথার পূরবীতে কি কোনও পরিবর্তন এনে দিতে পারল? পারল না যে, তার কারণ জয়ার জীবনের যা মূল ট্রাজেডি সেটা তো যেমনকার তেমনিই গেল থেকে।

কটা মাস গেল কেটে। যেটা সমবেদনায় হয়েছিল শুরু সেটা মনের অজ্ঞাত

কন্দরে কি রূপ নিচ্ছে পরিচয় আর অন্তরঙ্গতার অনুকূল বায়ু পেয়ে ঠিক বুঝতে পারে না সঞ্জয়। শুধু একটা ইচ্ছা, ওর ভালো করবার, ওর ললাট থেকে চিন্তার ছায়া মিটিয়ে দেওয়ার একটা দুর্বার বাসনা যেন পাগল করে দিতে লাগল সঞ্জয়কে। দিন দিনই। তার জন্য যে-কোন আত্মত্যাগ যেন অল্পই বলে মনে হয়। কাজটা ভালো, ছোট্ট পরিবারটি সুখী, জয়াও (যদিও জয়াকে বাহ্যতঃ কবে অসুখী দেখেছে তাও মনে পড়ে না), তবু ওরই মনের অতৃপ্তি কেন যে ছড়িয়ে থাকতে দেখে জয়ার মুখে বুঝে উঠতে পারে না সঞ্জয়।

তারপর একদিন বুঝল। হয়তো শিউরে উঠেই থাকবে প্রথমটা। সঞ্জয় ছেড়ে দিল আর ওদিকে যাওয়া, প্রায় মাস দুই। তাতে ফল এইটুকুই হল, দেহটাকে সারিয়ে নিতে মনটার একমাত্র আশ্রয় হয়ে উঠল জয়াদের ছায়াস্নিগ্ধ নিলয়টুকু। হাসিখুশির সব ছবিগুলি যায় মুছে। কি করে বুঝতে পারে না, শুধু একটি ছবি দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেই প্রথম দিনের ছবি—সামনের বেঞ্চটিতে দিনশেষের মলিন আলোয় নিজের নিঃসঙ্গতা নিয়ে আছে বসে জয়া। এবার উল্টো স্রোত বইল। আর একবার মন নিয়ে বিচারে বসল সঞ্জয়। তাতে একটা জিনিস আবিষ্কার করল—ও যদি চরম আত্মোৎসর্গ ই করতে চায় জয়াকে সুখী করবার জন্য, তার পথ তো রয়েছে খোলা, অবশ্য জয়া যদি রাজী হয়। জানে, যুগটা একেবারে প্রতিকূল না হলেও, এখনও খানিকটা লোকলজ্জা খানিকটা সমাজভয় আছেই। উপায় নেই বলেই আর ভয় নেই। তাইতেই ওর আত্মত্যাগ আরও মহীয়ান হয়ে উঠবে।

তপন যে জয়ার সন্তান নয় এতে পথ খানিকটা সুগমও হয়েছে।

দুমাস পরে আবার একদিন গিয়ে উঠল।

পরিস্থিতিটা ছিল বেশ অনুকূল। রবিবার, একটা ম্যাচ দেখতে কাজল আর তপন গেছে ডানকুনিতে বেরিয়ে।

জয়া মুখভার করেই অভ্যর্থনা করল—"পড়ল মনে সঞ্জয়দার! আজ ঠিক এক মাস সাতাশ দিন পরে এলেন!"

"আশা করেছিলাম কাজল গিয়ে একদিন খোঁজ নিয়ে আসবে।"

একটা উত্তর দিল সঞ্জয়, তোয়েরই ছিল, তবে মুখভারটুকু ভালোই লাগল; দিনগোনাটুকু আরও ভালো। ঠিক করে নিল আজই বলবার দিন, নৈলে আর হবে না।

চা-জলখাবার খেয়ে, পিসিমার সঙ্গে খানিকটা গল্প করে ওরা দুজনে ঘাটে গিয়ে বসল। একটা মাঝারি আকারের খিড়কির পুকুর আছে। বাঁধানো

ঘাট, কাজল-তপন থাকলে চারজনে বসে গল্প-সল্প করত।

দেরি করল না সঞ্জয়। বুকটা দুরু দুরু করছে। নিতান্তই এক-আধটা এদিক-ওদিক কথা শেষ করে বলল—"এক মাস সাতাশ দিনের কথা বলছ জয়া, কিন্তু আর হয়ত একেবারেই না আসতে পারি।"

"কেন !!"—উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে একেবারে কয়েকটা প্রশ্ন করে বসল—"বাইরে চলে যাচ্ছেন কোথাও ? ভালো লাগে না এখানটা ? আমাদের কিছু দোষত্রুটি হয়ে গেছে নাকি সঞ্জয়দা ?"

একটু চুপ করে রইল সঞ্জয়, বুকের দুরু দুরুটা বেড়ে গেছে, তারপর ঢোক গিলে বলল—"পিসিমা কি তোমার খুব সেকেলে জয়া ?"

"হঠাৎ যে একথা ?"

"আজ একটা কথা বলতে এসেছি তাঁকে, তিনি রাজী না হলে আমার এখানে আর আসা সত্যই বন্ধ রাখতে হবে। অবশ্য তার আগে তোমার মত দরকার। তোমায় নিয়েই তো কথা।..."

চুপ করে রইল জয়া মাথা হেঁট করে। যে দিন গোনে তার বুঝতে দেরি হবে কেন ? তার বুকও যে দুরু দুরু করেই ওঠে। চুপ করেই বসে রইল একটু, তারপর লজ্জার দিকটা এড়িয়ে প্রশ্নের আকারেই একটা বেশ মাঝামাঝি উত্তর গড়ে নিল। বলল—"সব কিছুই তো তাঁর ওপর নির্ভর করে। কি বলবেন না বলবেন আমি কি করে জানব ?"

হেসে জিজ্ঞেস করল—"কিন্তু হঠাৎ একেলে কি সেকেলে একথা জিজ্ঞেস করলেন যে ?"

কি করে কোন্ ভাষায় বলবে যেন ভেবে উঠতে পারছে না সঞ্জয়। কিন্তু লগ্নটা আজ এত সদয় হয়েই এসেছে যে বলে দিয়ে নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষা না করলেও তো নয়।

ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল কথাগুলা—"আমি বলছিলাম—বলছিলাম জয়া—তোমার সিঁথিতে সিঁদুর—মানে তাহলে আমি যে আশঙ্কা করছিলাম..."

অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে আছে জয়া, কৌতুক লজ্জাটাকেও যেন ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। একটু চেয়ে থেকে বলল—"কী আপনার আশঙ্কা কি করে জানব ? কিন্তু কিছু না হলে সিঁদুর যে আসবে কোথা থেকে তাও তো..."

—বলতে বলতেই দুহাতে মুখ ঢেকে খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

সবচেয়ে হাসির কথাটা কিন্তু সঞ্জয়ের কাছেই রয়ে গেল। ওর এক এক

সময় মনে হয় (হাসিও পায় বৈকি তাতে) যে, জয়াকে পাওয়ার মধ্যে কোথায় যেন একটা খুঁৎ থেকে গেল। যেন যথেষ্ট করা হল না ওকে পেতে। যেন চরম আত্মত্যাগ করে উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হল না। যেন, যেমন আশা করেছিল (কিম্বা আশঙ্কাই), কুমারী না হয়ে জয়া যদি বিধবাই হত অর্থাৎ বিধি তপনের ওপর বাম না হয়ে যদি জয়ার ওপরই হতেন তো আপসোসের আর কিছুই থাকত না।

মাননীয় প্রধান অতিথি

একটা মাঝারি গোছের রেল স্টেশন, এ ছাড়া জায়গাটার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না। সম্প্রতি এখান থেকে একটা ব্র্যাঞ্চ লাইন বেরুনোয় আস্তে আস্তে জমকে উঠছিল, একটা কারণে গতিবেগটা হঠাৎ একটু বেড়ে গেছে। মাস দুই হল, ব্র্যাঞ্চ লাইনের পরবর্তী স্টেশনের তেলকলের মালিক নটবর পাল একটা সিনেমা-হলও খুলে দিয়েছে। সমস্ত তল্লাটের মধ্যে নটবরদের গ্রামটাই বর্ধিষ্ণু। একটা তেলকল, একটা চালকল, হাই স্কুল, বাজারটাও বড়ই, তবু অনেক দেখেশুনে এইখানেই হলটা খুলল নটবর। জংশন স্টেশনটা আট-দশ মাইলের মধ্যে অনেকগুলি গ্রামের কেন্দ্রস্থল। রেল তিন দিক থেকে খদ্দের টানবে। একটা বাস-রুটেরও ওপরে পড়ে। নটবরদের গ্রামটাও এমন কিছু দূরে পড়ে না, মাইল চারেকের ভেতরেই। সিনেমার নেশা জমে এলে গেঁয়ো লোকেদের পক্ষে কিছুই নয় ; এপাড়া ওপাড়া।

একেবারে পাকা হল নয়, নটবর সেরকম কাঁচা কাজ করে না। শাল-বাল্লার ফ্রেম করে তাতে করোগেট-লোহার চাদর ঠোকা, ওপরে করোগেটের ছাউনি। নাম দিয়েছে 'অন্নপূর্ণা'। এখন সপ্তাহে দুটো দিন 'শো' দিচ্ছে, মঙ্গল আর শুক্রবার। লোক হচ্ছে মন্দ নয়। একটা দিন বাড়াবার কথা ভাবছে নটবর। ঘরটা খাড়া হওয়ার পর থেকে জায়গাটা যেমন নূতন করে আপনিই জমে উঠছে, তেমনি নটবরেরও চেষ্টার অন্ত নেই। জংশন হওয়ার আগে মাত্র একটি তেলেভাজা আর চিঁড়ে-মুড়ির দোকান ছিল, আর একটা বাঁশের বাতার বেঞ্চিপাতা টী-স্টল। এখন স্টেশন থেকে বেরিয়েই যে টানা রাস্তা, তার ওপর পাশাপাশি দুটো খাবারের দোকান, দুটো পান-বিড়ির, একটা মুড়ি-মুড়কি, চিঁড়ের মোয়া, বাতাসা, তামাক নিয়ে মুদিখানা ; একটা কাটাকাপড় আর স্টেশনারির দোকান,

একটা চপ-কাটলেট-চা-বিস্কুটের। শেষের দুটো নটবরের নিজের, নাম যথাক্রমে 'অন্নপূর্ণা ভ্যারাইটিজ' এবং 'অন্নপূর্ণা কেবিন'। এই কেবিন আর একটা যে হেয়ার কাটিং সেলুন আছে এ দুটো শুধু সিনেমার দিনই খোলে। বাকি দোকানগুলোয় কিছু কিছু বিক্রয় রোজই হয়, বাড়ছেও। যেটুকু মন্দা যায়, সিনেমার দুটো দিনে পুষিয়ে যায়। বিশেষ করে নটবরের দোকানে। সিনেমা আসায় লোকেদের রুচি হু হু করে বদলে যাচ্ছে। শুধু রসনারই নয়, পোশাক-প্রসাধন সম্পর্কেও, মেয়ে-পুরুষ উভয় মহলে। সেলুনটাতে তো চারজন লোকে হিমসিম খেয়ে যায়। ওরাও রোজ একজন করে থাকবার কথা চিন্তা করছে।

সমস্তটুকু আমি যে জানলাম তা নিতান্তই আকস্মিকভাবে। গোবর্ধনের কাছে। নইলে অত দূরে সিনেমার দৌলতে একটা অঞ্চল কি করে দ্রুত সভ্যতার আলোকে এসে পড়ছে, তা নিয়ে আমার কোন আগ্রহ বা কৌতূহল থাকবার কথা নয়।

বাইরের বারান্দায় বিকেল বেলায় একাই বসে ছিলাম, গোবর্ধন এসে সামনের মোড়াটায় বসল। একেবারে দিন পনের আসেনি,একটু যেন শুকিয়েও গেছে।

কারণটা জিজ্ঞেস করতে বলল—"শেষের কথাটাই আগে বলে নিই দাদা, একটা জন্মের সাধ মিটিয়ে এলাম; কাল রাত্রের ব্যাপার। সাহিত্য-সভায় প্রধান অতিথি হয়ে এলাম। আজকাল তো একজোড়া করে ডায়াসে তুলছে—সভাপতি আর প্রধান অতিথি। কোন্‌টে বড় দাদা?"

বললাম—"পতিই যখন সেক্ষেত্রে ওটাই তো হওয়া উচিত।"

"তাই হতে পারতাম, নিজেই সাহস করলাম না। ভেবে দেখলাম, শুধু বুকে মালা ঝোলালেই চলবে না তো, পেটেও কিছু থাকা চাই। তার চেয়ে বাড়ির অতিথি-অভ্যাগত, কিছু আবোল-তাবোল হয়ে গেলেও ক্ষ্যামাঘেন্না করে নেবে। ঠিক করিনি?"

হেসে প্রশ্ন করলাম—"ব্যাপারখানা কি?"

"আগে একটু চায়ের কথা বলে আসি দাদা ভেতরে, তার সঙ্গে আরও কিছু যদি এসে পড়ে। খাটুনিটা তো বেশ গেল কটা দিন।"

ভেতর থেকে ফিরে এসে বসতে বসতে বলল—"অবিশ্যি সে দিকটাও তাল বুঝে ম্যানেজ করে নিলাম—অতিথিকে মুখ খুলতে হল না, সভাপতিকেও নয়; কিন্তু গোড়া থেকে সবটা না শুনলে ঠিক বুঝবেন না হয়ত। ব্যস্ত আছেন?"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছ।"—বললাম আমি।

"তা পাচ্ছি, তবে নেহাত যে ভুল বলছি তাও তো নয়। আমাদের ব্যস্ত থাকা মানে হাত-পা-মুখকে ব্যতিব্যস্ত করা। আপনাদের তো তা নয়। যখন দেখছি ওগুলো গুটিয়ে দিব্যি চুপচাপ বসে আছেন তখনই হয়ত শখ করে মাথার মধ্যে একগাদা ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী নিয়ে নাহক হয়রান হচ্ছেন। আমি সেই কথা বলছি।"

হেসে বললাম—"বল তুমি। বরং ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ীর অভাবই যাচ্ছে আমার আপাততঃ।"

"তা যদি বললেন তো 'অন্নপূর্ণা হল'-এর মত বোঝাই করে দিতে পারি দাদা। শুনুন তা হলে—"

"সরষের তেল যোগাড় করা থেকে শুরু হল। আর সবগুলোর দেখাদেখি এটাও তো বাজার থেকে উধাও হয়েছে। কাকীমা বললেন—'আমার মামার বাড়ির দিকটা দেখবি একবার? একবার যেন শুনেছিলাম পাশের গ্রামের নটবর পাল একটা কল দাঁড় করাচ্ছে।'

মেয়েলি কথা। সারা দেশটায় পালে-পাল কত নটবর পাল কলে-কলে দেশটা ছেয়ে দিয়েও এই দশা, যত করবে ওঁর মামার বাড়ির নটবরে! তার ওপর নিজের মামার বাড়িরই কবে মুখ দেখেছি মনে নেই, এ আবার—মারও নয়, কাকীমার মামার বাড়ি। তবু গেলাম কাকীমার একখানা চিঠি নিয়ে। পাপ মুখে বলতে নেই দাদা, কি যাত্রা করে যে বেরিয়েছিলাম, একেবারে গোড়া থেকেই প্রধান অতিথি।"

"কি রকম?"—ওর বলবার ভঙ্গিতে হেসে প্রশ্ন করলাম আমি।

"দাদু, মানে কাকীমার মামা, পনের টাকা মাইনের কেরানী হয়ে গিলেণ্ডারের ফার্মে ঢোকেন। এ যুগের কথা নয়। ডেলি প্যাসেঞ্জারির সঙ্গে পুরুতগিরির ব্যবস্থাটা ধরে রেখেছিলেন, বড়বাবু হয়ে রিটায়ার করে এসে গুরুগিরি আরম্ভ করে দিলেন। দেখলাম বেশ খলিফা লোক দাদা। এই সময় নটবর পালের মাথায় নূতন ফিকির ঢুকেছে, তাক বুঝে গেঁথেও ফেললেন! তার গুরুবল দরকার তো।

আমায় একটা চিঠি দিলেন তার নামে। সেটা নিয়ে গিয়ে দেখা করলাম। অবশ্য কাজ হল, গুরুর আদেশ, তবে ব্যবসায়ী লোক তো, একটু ল্যাজে খেলাল। এক-আধ টিন কেন, ইচ্ছে করলে সমস্ত দেশটাই তেলে ভাসিয়ে দিতে পারে, তবে জিনিসটা যে সোজা নয়, এটা একটু জানিয়ে না দিলে, যা হাহাকার

যাচ্ছে, গুরুর চিঠি নিয়ে আরও সব নাতির দল জুটতে কতক্ষণ? বললে প্রতিটি ছটাক তেল কল থেকে চুঁয়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের খাতায় তার হিসেব উঠে যাচ্ছে। গুরুদেব আদেশ করেছেন, তাঁর অসীম কৃপা, কিন্তু ওরই মধ্যে থেকে একটু একটু করে সরিয়ে জমা করতে হবে। দুদিন দেরি হতে পারে, তাড়াহুড়া আছে আমার? না থাকে তো দুটো দিন থেকে গেলে ভাল হয়। তার সঙ্গে—গুরুদেবের নাতি, ওর এমন সৌভাগ্য কি হবে?—এসবও আছে। বেশ নধর তেল-চুকচুকে শরীরটি, নেওয়াপাতি ভুঁড়ি, কথাবার্তাও বেশ তেলা।

দুদিন! থাকতে দিলে যে দুমাস কামড়ে পড়ে থাকতে রাজী আছি একথা আর কি করে বোঝাই তাকে। চারিদিকে 'হা-তেল, হা-তেল'—এ সময় কলুর বাড়িতে তেলে ভাসতে থাকা গুরুদেবের নাতিরই কি কম সৌভাগ্য?

বেশি পারা গেল না দাদা, গোবরারও চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস আছে তো। তবে, একবার ঢুকতে পারলে ভেতর মহল পর্যন্ত নেওটা হয়ে যাওয়ার ক্ষমতাটুকু আছে আপনার আশীর্বাদে, পাঁচটা দিন খাঁটি তেল খেয়ে, হেলাফেলা করে সর্বাঙ্গে মেখে, একটি ভরা টিন, তার সঙ্গে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তেল দিয়ে পিছলে আসবার জন্যে ছোট একটা খোলা টিনও নিয়ে যখন ফিরে এলাম তখন বাড়িতে কেউ চিনতেই পারে না আমায়। ঐ পাঁচদিনে শুকনো নাড়িতে কম তেলটা তো শোষেনি, তেলে-তেলে ত্যালাপোকা হয়ে এসেছি কি না।"

হেসে বললাম—"কই, তার তো কিছুই দেখছি না। বরং মনে হচ্ছে আগে যেটুকু বা ছিল, সেটুকুও কিসে শুষে নিয়েছে।"

চা আর হালুয়া করে পাঠিয়ে দিয়েছে ভেতর থেকে; শেষ করে, রুমালে হাতমুখ মুছে গোবর্ধন বলল—"তারপরেই যে-ছুটোছুটি যে-হয়রানিটা গেল তাতেই সব তেলানি ঘুচিয়ে দিলে কি না। তা যদি বললেন তো ঐ যে পাঁচটা দিন ছিলাম ওখানে, তার মধ্যে সব দেখেশুনে আমিও একটু লোভে পড়ে গেলাম! কি ফলাও ব্যবসা! কি কারবারী মাথা! শুধু নিজের গাঁটুকুতেই নয় তো, লক্ষ্মী বাইরে পর্যন্ত উছলে পড়েছেন। কদিনেরই বা কথা? এই নতুন লাইনটা বেরুবার পর থেকে…"

এর পর জংশন স্টেশনের পুরো বিবরণটা দিয়ে বলল—"নটবর লোক ভাল দাদা। আমি ভ্যাগাব্যাণ্ডি করে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আপনি সাহিত্য বিক্রী করে কবে দুটো বই বিক্রি হবে তার জন্যে হা-পিত্তেশ করে বসে আছেন, তা বলে যে টাকার রস বুঝেছে, কি করে পাঁচশটাকে পাঁচ হাজার করা যায় তার জন্যে ফন্দি-ফিকিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে খারাপ বলতে হবে? বলুন?"

সুযোগ পেলেই খোঁচা দেয়, হেসে বললাম—"তা কি করে বলা যায়?"

"আমি কালোবাজারের কথা ধরেই বলছি কিন্তু দাদা।"

কথাটা বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার পানে। হেসে বললাম—"তেল যখন পেয়েই গেছ।"

"খোঁচাটা দিতে ছাড়লেন না দাদা শেষ পর্যন্ত।"—গম্ভীরভাবে বলে আবার আরম্ভ করল—"থাক, যা বলছিলাম। আমি যে একটু লোভে পড়ে গেলাম তা এই ভেবে যে এমন একটা শাঁসাল লোক যত হাতে থাকে ততই ভাল। তবে ওর দিকটাও যে একেবারে না ভাবলাম এমন নয়। একটা লোক এমন একটা গঠনমূলক কাজ করছে (কি ভেবে একটু আড়ে চেয়ে নিল গোবর্ধন) আমার যতটুকু সাধ্য করি না কেন?

বুদ্ধিটা আমার হঠাৎই জুগিয়ে গেল দাদা। হপ্তায় দুটো দিন করে যে সিনেমা হয় একথা আগেই বলেছি। মঙ্গলবার আর শুক্রবার। আমার কপালে একটা শুক্রবার পড়ে গেল। যতটুকু জানি, তার চেয়ে জানাবার ক্ষমতাটুকু দিয়েছেন ভগবান, নটবর আমায় সাহিত্যের ভাষায় বলতে গেলে একজন 'উদীয়মান' কেউ বলে ঠাউরে নিয়েছে; বলল—'চলুন ঠাকুর, আমার ভাগ্যি একটা শো'ও পড়ে গেল, দেখে আসবেন চলুন।'

এর আগে একদিন জায়গাটা দেখিয়ে ওর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমায় সবটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। সে দিনেও অনেক কথা হল।

ডেলি দুটো করে 'শো'। আমরা সন্ধ্যেরটাই দেখলাম। তাইতেই প্রথম শো-এর বেরুতে এবং দ্বিতীয় শো-এর ঢুকতে যা দেখলাম তাতে বুঝলাম ভিড় নিতান্ত মন্দ হচ্ছে না। বাস-ট্রেনের সুবিধেটা আছে, তা ছাড়া মাঠ ভেঙে চারিদিকের গ্রাম থেকেও লোক জোটে মন্দ নয়। দোকানগুলোয় বেশ ভিড়, বিশেষ করে নটবরের দুটোতে—'অন্নপূর্ণা কেবিন' আর 'অন্নপূর্ণা ভ্যারাইটিজ'-এ। কেবিনে একদিকে কাঠের পার্টিশন দিয়ে পর্দা ঝুলিয়ে যে দুটো ঘর করে দিয়েছে তা থেকেও মেয়েপুরুষ ঢুকতে-বেরুতে দেখলাম। পোশাক-আশাক, মেয়েদের প্রসাধন—সবতাতেই শহরের ছাপ পড়েছে। মনে মনে বললাম—সাবাস নটবর!

ট্রেনে আসতে আসতে আমায় জিজ্ঞেস করলে, দেখেশুনে আমার মতটা কি দাঁড়াল, আর কোন্ কোন্ দিক দিয়ে ইম্প্রুভমেণ্ট করা যায়, আমি তো শহরের মানুষ।

দেখেশুনে যা আসল মত সেটা তো দেওয়া যায় না দাদা, দিলে শুনছেই বা

কে? কতকগুলা হিন্দী সিনেমা—গানের কলি এদিক-ওদিক শুনে বুঝতে পারলাম বোম্বাই হাওয়াও এসে গেছে। বললাম—'মত দেওয়ার তো কিছু বাকি রাখেননি পালমশাই, আপনি একসঙ্গে মানসিক, আধ্যাত্মিক, পারিবারিক, সমাজিক সবরকম ইম্প্রুভমেণ্টের যা একটিমাত্র উপায় আছে আজকাল, সেটা তো ধরেই দিয়েছেন সবার সামনে, দেখলেই বেশ বোঝা যায় কাজ হু হু করে এগিয়ে যাচ্ছে। কদিনেরই বা পত্তন বলুন না। তবে আমার মনে হয় এর সঙ্গে আর একটা জিনিস মাঝে মাঝে জুড়ে দিলে নাম-ডাকটা আরও তাডাতাড়ি ছড়িয়ে পড়ত। তাইতেই, এই এতগুলো টাকা যে আপনি ঢাললেন দেশের কল্যাণের জন্যে সেটা উঠেও আসত তাড়াতাড়ি। শুধু পাবলিককে দেখলেই চলবে না, আবার নিজের দিকটাও একটু ভাবতে হবে তো।'

গলে গেল দাদা। বললে—'বলুন আর কি করতে পারি এদের জন্যে? দেখছেনই তো কত নীচে পড়ে রয়েছে এখনও।' বললাম—'মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লাগিয়ে দিন।'

বললে—'নাম শুনেছি বটে, কিন্তু জিনিসটে কি ঠিক জানি না। দেখছেন নিজের ধান্দা থেকেই ফুরসত নেই, তার ওপর এই এক হাঙ্গাম ফেঁদে বসেছি।'

বুঝিয়ে দিলাম দাদা। প্রথমটা নামটা শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল, বুঝি পণ্ডিতী ব্যাপার কিছু। বললাম—ওঁ-টোঙের ধারে কাছে দিয়েও যায় না, ভয় নেই; শুধু নাচ-গান, আধুনিক-কালোয়াতি। যাদের সিনেমার পর্দায় দেখছে তাদের দু-একটাকে যদি টানতে পারা যায় তা হলে তো তীর্থস্থান হয়ে পড়ে। তখন এই টিনের চালা আর হপ্তায় দুটো দিনে কুলুবে? তবে কিছু খরচ হবে প্রথমটা।

'টিকিট করা চলবে?'—জিজ্ঞেস করল। বললাম—প্রথম দু-একটা ক্ষেপ আর করে কাজ নেই। এ-সব শিক্ষামূলক, গঠনমূলক বলে শহরের দিকে বড় একটা করে না, সমাজসেবাই তো। তবে জমে গেলে তখন আবার টিকিট করে তুলে নিলেই হবে।

রাজী হয়ে গেল। সেই ছাপা সামলে আসছি দাদা। উঃ, ছাপাই বৈকি! নটবর যে এতটা সভ্য করে তুলেছে এর মধ্যে অতটা আন্দাজ করতে পারিনি।"

যেন উৎকট কিসের একটা স্মৃতিতে সেকেণ্ড কয়েক চুপ করে রইল গোবর্ধন—"আমারই ভুল হয়ে গেল। প্রথমত টিকিট না করা, দ্বিতীয়ত প্রথমবারেই তারকার দিকে হাত বাড়াতে যাওয়া।

তবু গুরুবল দাদা যে আসল তারকা কোনর নাগাল পাওয়া গেল না। যাকে ধরা গেল, সে হিসাবে তাকে তারকা না বলে জোনাকি বলাই ভাল। নন্দিতা চাকলাদার, কলকাতারই মেয়ে, একটা হিন্দী সিনেমায় দুটো ডান্স আর গান দিয়ে সবেমাত্র বেরিয়েছে, সিনেমাটা অন্নপূর্ণা হলে কদিন আগে দেখানও হয়েছে, তাকে এন্‌গেজ করতেই হাঁটাহাঁটি করে পায়ের জুতো ছিঁড়ে গেল। দুটি ডান্স আর গান, দুশটি টাকা। আর দেওয়া নেওয়ার মধ্যে আমাদের ক্লাবের জন্যে শখানেক টাকা টেনে নিলাম দাদা, অবশ্য নটবরকে বলেই। একটা সরোদ দেবে আমাদের টুনে দত্ত ; একটা কালোয়াতি, অখিল ; দুটো আধুনিক, জটে সিঙ্গি। একটা রবীন্দ্র-সঙ্গীতও ঢুকিয়ে দিলাম দাদা, যদি শোনে ধৈর্য ধরে, খানিকটা পাপ ধুয়ে যায়। সভাপতি আবার কাকে ধরতে যাব দাদা ? কোন্ কাগজে একটা আধুনিক কবিতা বেরুবার পর থেকে হাবলা দাড়ি গজিয়ে বড় চুল রাখছে, তাকে সভাপতি করে দিলাম। প্রধান অতিথির কথা বলেইছি।"

সব ঠিকঠাক করে আমি আবার গিয়ে দুটো দিন থেকে খুব ভাল করে চারিয়ে এলাম ব্যাপারটা দাদা। হ্যাণ্ডবিল বিলি করে, লাউড স্পীকার ঘুরিয়ে, গোটা চারেক যে শো পাওয়া গেল তাতেও ঘটা করে স্লাইড্ দিয়ে দিলাম। হ্যাণ্ডবিলে বিশেষণের ছুট যা লাগিয়ে দিলাম, তাতে নন্দিতা চাকলাদারকে স্টারদের ছাড়িয়েও ঠেলে তুললাম আকাশে, আর টুনে জটেদের তো মনে হবে লোকের যে এই আনকোরা গন্ধর্বলোক থেকে নেমে এসেছে।

তারপর দলবল নিয়ে কালকে গিয়ে উঠলাম। গাড়ি থেকে নেমেই চক্ষুস্থির —এ আবার কোথায় এসে পৌঁছুলাম! রীতিমত এক মেলা বসে গেছে 'অন্নপূর্ণা হল'-কে ঘিরে। কত রকমের লোক, কত রকমের ফিরিওয়ালা, কত রকমারি আওয়াজ! নটবর হাজিরই ছিল তার লোক নিয়ে, আমাদের অভ্যর্থনা করে কেবিনে নিয়ে গেল। ছটার সময় প্রোগ্রাম শুরু, আমাদের মালা-টালা পরিয়ে ডায়াসে নিয়ে গিয়ে তুলল। ভেতরে যা অবস্থা তারও বর্ণনা দিতে হবে দাদা ? এই জন্যে জিজ্ঞেস করছি সভাপতি আর প্রধান অতিথিগিরি করে আপনার তো অনেক ভোগান্তি গেছে।"

হেসে বললাম—"বাদ দিতে পার। তুমি যা ছাতু গুলেচ, ভাবছিলামই তুলবে কি করে।"

"নিলাম কিন্তু সামলে দাদা"—মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল গোবর্ধনের। বলল —"কি সংগঠনমূলক কাজ করে ফেলেছে নটবর এর মধ্যে! মনে হবে না

কলকাতার বাইরে কোনও জায়গায় রয়েছি আমরা। পর্দার পেছনে বসে আমরা ঠিকঠাক হচ্ছিলাম—একটু দেরি হয়েই যায়, প্রথম কাজও তো—তা সে কি বেড়াল-ডাক, কুকুর-ডাক, কি চোখা চোখা বুলি। তারপর একটু পর্দা ফাঁক করে অডিটোরিয়ামটা দেখে তো একেবারে চক্ষুস্থির! তাকে ভিড় বলবেন? মনে হচ্ছে যেন বাক্সভরা পিণ্ডি-খেঁজুর। নটবর একবার বেরিয়ে গেল। যখন ফিরে এল, মুখটি শুকিয়ে গেছে একেবারে, বলল—'ভলান্টিয়াররা ঠেকাতে পাচ্ছে না। টিনের ঘর, আর একটু চাপ বাড়লেই যে কি হতে কি হয়ে দাঁড়াবে।'

আপনার পায়ের আশীর্বাদে মাথাটা ঠিক থাকে দাদা, যত ঝড়-ঝাপটাই আসুক না কেন। কখন কি দরকার হয়, টাইম-টেবিলটা ভাল করে জানা ছিল। কি ভুলটা হয়েছে কেন বলতে যাব দাদা? বললাম—আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন। আমাদের ওদিকে এ নিত্যিকার ব্যাপার, এর ঝাড়ন-মন্ত্র জানা আছে আমার। ভাববার কিছু নেই, শিক্ষা যত বাড়বে, নিখুঁৎ হয়ে আসবে, ততই এসবও বাড়বে, আর তাইতেই আপনার 'অন্নপূর্ণা হলের'ও জয়জয়কার। আপনি নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকুন।

এই সময় মেন লাইনে দুদিক থেকে দুটো গাড়ি এসে দুদিকে বেরিয়ে যায় আর তার মিনিট পনেরর মধ্যে তাদের প্যাসেঞ্জার নিয়ে ব্র্যাঞ্চ লাইনেরও একটা গাড়ি ছেড়ে যায়। এর পর ঘণ্টা আড়াই পরে আবার প্রায় ঐরকম ব্যবস্থা, যার ভরসায় বাইরের লোকগুলো এসেছে।

পর্দা টানিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি। হাত জোড় করে নমস্কার করে দাঁড়াতে ঠাণ্ডা হয়ে গেল এক চোট হলটা।

'আমার একটা নিবেদন অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে আপনাদের জানাতে হচ্ছে' বলে আরম্ভ করে বললাম—'একটা বিশেষ কারণে আজ আমাদের সভাপতি আর প্রধান অতিথিকে তাঁদের ভাষণ দুটো প্রথমে শেষ করে নিয়ে চলে যেতে হবে। সেই আদি রামায়ণের যুগ থেকে কি করে আমাদের এই আর্যসংস্কৃতির উদ্ভব আর উন্নতি হল সে বিষয়ে তাঁদের ভাষণ—সংক্ষিপ্তই করবেন তাঁরা—তবু যে সময়টুকু লাগবে, আশা করি ধৈর্য ধরে বসে থাকবেন আপনারা। তার পরেই আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—যেটা প্রোগ্রামের প্রথমেই রেখেছিলাম আমারা সেটা আরম্ভ করে দোব। আপনারা দয়া করে যেন উঠে যাবেন না। দুজনের ভাষণে যাতে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি না লাগে তার জন্যে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করব।'

অত সহজে হয় দাদা?—সে যা মেঠো গলায় চিৎকার উঠল একটা,

কলকাতার রেশন-খাওয়া গলা তা পাবে কোথায় ?

কিন্তু গুরুবল—ঠিক এই সময় এর ওপরও ছাপিয়ে ওদিকে স্টেশনে ইঞ্জিনেরও আওয়াজ উঠল, একটা গাড়ি বোধ হয় এসে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে যা হুল্লোড —বেরিয়ে যাওয়ার, সেটা ঠেকানই দায়। কত আর বলব দাদা ?—এর পর আরও ছুটি তোড। না তখন গাড়ি ধরার হুজুগ উঠে গিয়ে স্টেশনের দিকে টান ধরেছে, আর কি ইঞ্জিন কখন আওয়াজ করবে সে ভরসায় কেউ দাঁড়িয়ে থাকে ?

মিনিট কুড়িক পরে—যখন ফিরতি যাত্রী-বোঝাই হয়ে তিনটে গাড়িই গেল বেরিয়ে, এদিকে 'অন্নপূর্ণা হল' তো প্রায় আধাআধি খালি—এবার নটবর পালকেই পর্দা টানিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলাম। সে করজোড়ে নমস্কার করে বিনীত নিবেদন জানাল—অনেক সাধ্যসাধনা করে সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে থেকে যেতেই রাজী করেছে। এবার পূর্বের প্রোগ্রাম মতই নৃত্য-গীত আরম্ভ হবে…কিছু অন্যায় হল দাদা ?"

অভিমতের জন্য মুখের দিকে চেয়ে রইল গোবর্ধন।

শ্রীমতী

দুপুরে ঘুম থেকে উঠে দেখি টিপ টিপ করে একটা অলস বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে কখন। বাইরে একটু কাজ ছিল, কিন্তু আকাশকে বিশ্বাস করে বেরুতে পারা গেল না। নিজেরও একটা জড়তা লেগে রয়েছে, ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে গিয়ে গা এলিয়ে বসে পড়লাম জানলার ধারে, এর মধ্যে থেকেই বাইরের জগতের যেটুকু চোখে পড়ে, কানে আসে।

দূরে কোথা থেকে একটা মন্থর রেডিও-সঙ্গীত আসছে ভেসে, যেন বৃষ্টিতে আধভেজা হয়ে। অকাল-সন্ধ্যাটাকে দিনান্ত ভেবে মাঝে মাঝে দু-একটা পাখী কুলায় যাচ্ছে ফিরে। বাইরের প্রকৃতি আজ কৃপণ, বোধহয় সেইজন্য একটা শব্দে আকৃষ্ট হয়ে মনটা ভেতরের দিকে ফিরে এল। নীচে, বাইরের উঠানের সামনে চণ্ডীমণ্ডপে পাঁচ-ছয়টি ছেলে খেলাঘর পাতবার আয়োজন করছে। এক দল, উঠানটা যাদের ফুটবল গ্রাউণ্ড, তারা নয়। এরা আরও ছোট, খেলাঘরের বয়সেরই এ বাড়ির আর পাশের দু-একটা বাড়ির। বৃষ্টিতে আটকে গিয়ে পাঁচ মাথা একত্র করে সময়োপযোগী কোনও একটা খেলা

রচনার চেষ্টায় লেগে গেছে। ওপর থেকে বেশ দেখা যায়, একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে গুছিয়ে বসলাম।

চেষ্টা করছে কিন্তু কিছু দাঁড় করাতে পারছে না। চণ্ডীমণ্ডপের কোণের ঘর থেকে একটা চেয়ার আর চৌকির ওপর পাতা মাদুরটা নিয়ে এসে স্কুল-স্কুল খেলা দিয়ে শুরু করল, একজন মাস্টার হয়ে চেয়ারে বসে এবং বাকি সবাই ছাত্র হয়ে মাদুরের বেঞ্চে বসে। জমাতে পারল না। বার দুই ছাত্র-মাস্টার অদল বদল করেও জুত করতে না পারায় স্কুল তুলে দিয়ে মুদিখানার দোকান বসাল এদিক ওদিক থেকে পাঁচ রকম জিনিস যোগাড় করে। একটু সুবিধা হল, চণ্ডীমণ্ডপ মেরামতের কাজ চলছে, কলি ফেরানো হচ্ছে, চুন-সুরকি বালি মজুত থাকায় চাল ডাল ময়দা দিয়ে দোকান সাজাতে বেগ পেতে হল না। একজন দোকানী আর চারজনের 'কিউ' দিয়ে বেশ শুরুও হল, তারপরে হঠাৎ বৃষ্টিটা চেপে আসতে আমার জানলাটা বন্ধ করে দিতে হল।

দোকান শেষ পর্যন্ত চলল, কি স্কুলেরই দশা প্রাপ্ত হল ঠিক জানতে পারলাম না। তবে মিনিট পাঁচ ছয় পরে বৃষ্টির তোড়টা থেমে গিয়ে পূর্বাবস্থা ফিরে আসতে কখন আবার জানলা খুললাম, দেখি স্টেজ পাল্টে গেছে একেবারে। এবার আর খেলার স্কুল কিম্বা খেলার দোকান জাতীয় কিছু নয়, মনে হল যেন রীতিমত খেলাঘরই, অর্থাৎ সংসার।

এবার একটা 'প্লট' দাঁড় করিয়েছে মনে হল, যদিও গোড়ার হয়ত অনেকখানিই বাদ পড়ে যাওয়ায় বেশ ভালো করে ধরা গেল না। আমার সামনে যেটুকু অভিনীত হল তাতে দেখলাম চেয়াটাকে বৈঠকখানা করে সবচেয়ে বড ছেলেটি—আন্দাজ বছর আটেকের—কর্তা হয়ে বসে কোণের ঘরের ক্যালেণ্ডারটাকে খবরের কাগজের মত করে ধরে ঝাপসা-দৃষ্টি কর্তার মত চোখের কাছাকাছি এনে পড়ছে, মাদুর খাডা করে রচিত ভেতর বাড়ি থেকে একজন চাকর এসে বলল—"মাঠাকরুন বললেন আজ রেশন আনবার দিন।"

কর্তা চটে উঠল—"হোক দিন, আমি এখন উঠতে পারব না।" ভেতর থেকে যথাসম্ভব একজন জাঁদরেল গৃহিণীর ভাষা, কণ্ঠস্বর আর বাচনভঙ্গিতে ভেসে এল—"না উঠতে পারলে, পোড়া বাকোড় ভরবে কি দিয়ে?"

হঠাৎ কি একটা হয়ে গেল। খেলাঘরই যখন, সেক্ষেত্রে গালাগালিটুকু হজম করে যাওয়াই উচিত ছিল; হদ্দ, হজম না করতে পারার ভান করে একটি মানানসই উত্তর দেওয়া। কিন্তু আকাশের অবস্থা অথবা কিছু জমতে না পারা—যে কারণেই হোক, কর্তা হঠাৎ সত্য সত্যই চটে গিয়ে চেয়ার ঠেলে অন্তঃপুরের

দরজার কাছে উঠে গেল এবং অকৃত্রিম বিরক্তির সঙ্গে বলল—"অত কড়া গাল দিয়ে বলবি কেন ?"

"বলে সত্যিকার গিন্নিরা।"

"কক্ষনও বলে না।"

"হ্যাঁ বলে, যাস আমাদের পাড়ায়।"

গলা ক্রমেই চড়ে উঠছে। ভাষাও। "ছোট লোকের পাড়া তোদের"—বলে আর এক পর্দা উঠেছে, সংসার ভেঙে যায়, এই সময় "তোদের আজ কি হচ্ছে রে অন্তু ?"—বলে সত্যিকার ভেতর বাড়ি থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল।

এর বয়সও আন্দাজ আট বৎসর। একটি ফ্রকপরা, বব্ করে কাটা চুলে একটা রাঙা রিবন বাঁধা, বেশ শ্রীও আছে একটি। কর্তা অন্তুই বলল—"খেলাঘর খেলবি তুই রূপা ?"

"ঝ্যাঁটা মারি।" একটু নাকটা সিঁটকে উত্তর করল মেয়েটি। বলল—"বেটাছেলের সঙ্গে খেলাঘর পাতা ! তা মাঝখানে মাদুর খাড়া করেছিস কেন ?"

মাদুরের ওদিক থেকে ওরাও বেরিয়ে এসেছে, একজন বলল—"এটা ভেতর বাড়ি।"

"হাসালি ! আজকাল আবার ভেতর-বার কি ?" একটু কোল কুঁজো হয়ে হেসেও উঠল। সেই হাসিটুকু টেনেই প্রশ্ন করল—"ব্যাচা বুঝি গিন্নি সেজেছিস ? তা শাড়ি পরিসনি যে ? হাফ প্যাণ্ট পরা গিন্নি, যমের অরুচি !"—এবার বেশ খিলখিল করে হেসে একটু উল্টেই গেল।

বেচু বলল—"তুই হ'না, হবি ?"

"তা আর হব না !"—চোখ পাকিয়ে উঠল রূপা, বলল, "পোড়া মুখে আটকালও না বলতে। মরগে যা ঝগড়া করে, আমি যাই।"

ঘুরে পা বাড়িয়ে আবার ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করল—"তা কি খেলাঘর করছিলি ?"

"র‍্যাশান আনা, আরও সব।"

"আর কিছু পেলে না !"—চোখ তুলে একটু কি ভেবে নিয়ে মন্তব্য করল রূপা। "তা এত বিষ্টি মাথায় করে ! যাই। এত সব থাকতে খেলা বাছ্লে কিনা রেশন !"

"অরুচি !" নাক সিঁটকে ঘুরে দুপা এগিয়ে আবার কি বলবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে, এই সময় আবার একটা দমকা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিটা নামতে আমার

জানালাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে হল।

বৃষ্টি ধরলে জানালা খুলে দেখি ইতিমধ্যে স্টেজের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে গেছে। কিছুটা শিল্পী মহলেও। বেচুর জায়গায় গৃহকর্ত্রী এখন স্বয়ং রূপা। কর্তার পাট তুলে দিয়ে অন্ত এখন বাড়ির বড় ছেলে। তবে রূপার মাথায় এয়োতি-চিহ্ন রাঙা ফিঁতেটা দেখে মনে হল, কর্তাকে একেবারে লুপ্ত করা হয়নি, সে নেপথ্যে কোথাও আছে বলে যেন ধরে নেওয়া হয়েছে।

ইট দাঁড় করিয়ে রীতিমত ঘর বারান্দা রচনা করা হয়েছে। রূপা তার খেলার বাক্স নিয়ে এসে, হয়ত বা প্রয়োজনমত কারুর কাছ থেকে আরও কিছু ধার করেও ঘরগুলিকে যথাবিধি সাজিয়েছে ও। শোবার ঘরে ইটের খাটের ওপর চাদর বালিশ, পাশে একটি আলনা। রান্নাঘরে বাসনপত্র, উনুন —প্ল্যাস্টিকের দৌলতে একটা সম্পন্ন গৃহস্থের যা যা দরকার কিছুরই তো আর অভাব নেই। প্লাস্টিকেরই একটা দোলনায় টাঙানো পাখীসুদ্ধ পিঁজরাও যোগাড করে বারান্দায় সাজিয়ে রেখে গৃহস্থের রুচি এবং শখের দিকটা বজায় রাখা হয়েছে। সে-ই খেলাঘরই, শুধু একটি মেয়ে মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ভোল একেবারে গেছে ফিরে।

সবচেয়ে ভালো করে সাজানো হয়েছে বৈঠকখানা। ইট সাজিয়ে একটি বেশ বড ঘরে সোফার সেটি, চেয়ার, টেবিল, টেবিলে ফুলদানি, মায় তুকোণে তুটি টেবিল ফ্যান পর্যন্ত। মেঝেটিও খালি নয়, একটি জামার ছিট বা শাড়ির পাড়ের রাঙা কার্পেট পাতা। রীতিমত একটি ড্রয়িং রুম।

সব ছিম ছাম, সবাই ব্যস্ত, অথচ তটস্থ, যেন একটা কী বড় ব্যাপারের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

অল্প তু-চারটা কথা কানে যেতে সেটাও বোঝা গেল। আজ রূপার মেয়েকে পাকা দেখতে আসছে বরের পক্ষ থেকে।

সবাই ব্যস্ত। যাওয়া-আসা, আনা-রাখা, তার মধ্যে বাড়ির গৃহিণী সব চেয়ে ব্যস্ত বেশি। এঘর-ওঘর ঘুরে আসছে, তারপরেই আবার রান্নাঘর। কাজের থৈ না পেয়ে বলছে, "আজ আবার দিন বুঝে ঝি পোড়ারমুখী পর্যন্ত আসেনি।"

বড় ছেলে অন্ত বলছে—"এরা আবার যে হঠাৎ দিন ঠিক করলে মা।"

"তুই আর জ্বালাস নে বাছা! বরের বাপ, তার এখন পায়া ভারি, সে আবার নাকি বলে কয়ে আসবে! কথা আরম্ভ হয়েছে, তোয়ের থাকতে হবে।"—রান্নাঘরে উনুনে চাপানো কড়ায় খুন্তি নাড়তে নাড়তে বললে রূপা।

কল্পনার সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার একটা মস্ত বড় সুবিধা হয়েছে, পরশুই পাশের বাড়ির বোসেদের মেয়ে অনীতাদির পাকা দেখা হয়ে গেল। ভাষার দিক দিয়ে চিত্রটি পূর্ণাঙ্গ করে তোলায় কারুর আটকাচ্ছে না। খেলাঘরের বিষয় নির্বাচনেও অদ্ভুত দক্ষতা এবং দূরদর্শিতা দেখিয়েছে রূপা।

একসময় খুন্তি নাড়তে নাড়তে চমকে একেবারে সোজা দাঁড়িয়ে উঠল—

"হ্যারে কেউ নেই বাড়িতে, একলা কোন্ দিকটা দেখি? বলি, রুচির হল নাওয়া, সাজগোজ। বলিহারি আজকালকা' মেয়ে বাবা! ভাবন আর শেষ হয় না!"

একজন, বোধ হয় মেজো ছেলে—বললে, "ওকে দীপা, রতি ওরা ছাড়লে না, ও করে কি?"

একজন ছুটে সত্যিকার বাড়ির মধ্যে চলে গেল। রূপা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—"বেচু, অন্তু তোমরা ওদিকটায় নজর রেখো, বৃষ্টির জন্যে বোধ হয় মটোরের আওয়াজ কানেই আসবে না। নতুন কুটুম; যাও না হয় ছাতা মাথায় দিয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়েই থাকো গিয়ে। ওদিকে বুঝি বুটের ডালটা ধরে যায়, কটা দিক যে সামলায় একটা মানুষে! এদিকে যার দায় তিনি গিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তি হয়ে বসে রইলেন কোথায়!"

বৃষ্টি আবার যবনিকা দিল টেনে। যখন উঠল দেখি চারিদিক গেছে সামলে। রূপার ওদিককার পার্ট সব সারা হয়ে গেছে। শোবার ঘরটাকে নীচে রেখে একটা সত্যিকার চেয়ারে আছে বসে। ওরই ভাইঝি, বছর দেড়-দুয়েকের খুকুন হয়েছে কনে। দিব্যি ভালো করে সাজানো। আশীর্বাদের সময় বাগড়া না দেয় তার জন্য এক হাতে একটা পুতুল, এক হাতে বোধ হয় চকোলেট। খুব মন লাগিয়ে চুষে যাচ্ছে।

যথাসাধ্য সত্যরূপ দেওয়ার জন্য ওরা দুজনে ছাতা নিয়ে গেটে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, বেচু ছুটে এসে বলল—"ওঁরা এসে গেছেন। দাদা বললে—খবর দিগে যা মাকে। আমি আসছি নিয়ে সঙ্গে করে।"

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল রূপা খুকুনকে কোলে নিয়ে।

এই সময় হঠাৎ আবার দমকা হাওয়ার দোলায় আগেকার চেয়েও জোরে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামায় আমায় শেষবারের মত যবনিকা টেনে দিতে হল। শেষ যা দেখলাম নিখুঁৎ করে সাজানো ঘর সংসারের মাঝখানে জমজমে সাজে মা মেয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে।

ভাগীরথীর গল্প

॥ ১ ॥

ঠাকুরঘর একটা আছে বটে, কিন্তু কোন ঠাকুর নেই। না পট, না মূর্তি। শুধু তাকের ওপর তামার ছোট ঘটিতে ভাগীরথীর জল।

এ নিয়ে গৃহিণী অনুযোগও করেছে, কি ঠাকুরঘরের ছিরি। তামার ঘটি পূজো করলেই হবে? কি আছে ওতে?

হরিহর ভটচায উত্তেজিত হয়নি। তর্কও করেনি। হেসে বলেছে, আমার তেত্রিশ কোটি ওই ঘটির মধ্যেই আছে গিন্নী। কারবারী লোকের যেমন গণেশ, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যেমন সরস্বতী, আমার তেমনই ভাগীরথীর জল। মকরবাহিণীর পুণ্যেই এ বাজারেও দাঁড়িয়ে আছি।

গৃহিণী উত্তর না দিয়ে সেখান থেকে সরে যায়। এমন মানুষের কথার উত্তর দিয়েও লাভ নেই। একচক্ষু হরিণের মতন শুধু একটা দিক দেখবে। সারাজীবন একটা গোঁ আঁকড়ে থাকবে।

আত্মীয়স্বজন অনেকেই বলেছে, হরিহর, এতে আর কিছু নেই, এ কাজ ছেড়ে দাও। মানুষ অধার্মিক হয়ে গেছে, পাপপুণ্যের বিচার করে না, ক্রিয়া-কর্মের দিকে কোন ঝোঁক নেই। তার চেয়ে রিফুইজি অফিসের দরজায় বসে যাও। দরখাস্ত পিছু চার আনা হলেও কম নয়।

হরিহর কানে আঙুল দিয়েছে, মাপ করবেন। পয়সা তো আরও অনেক ভাবেই উপার্জন করা যায়। বেশ মোটা টাকা। ছোট একটা কাঁচি আর একটু আঙুলের কসরত, ব্যস পরের পকেটের ব্যাগ একেবারে নিজের আওতায়।

পরামর্শদাতারা বিরক্ত হন। কার সঙ্গে কার তুলনা। কি কথার কি উত্তর।

এ কাজের সবচেয়ে বড় মূলধন হরিহরের চেহারা। গায়ের রং জবাকুসুম সঙ্কাশং। আয়ত, করুণ টলমল দুটি চোখ। মল্লিকাশুভ্র উপবীতের গোছা। ভাগীরথীর জলে আবক্ষ ডুবিয়ে যখন পরিচ্ছন্ন, উদাত্ত স্বরে সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করে, তখন আশেপাশে ছোটখাট ভীড় জমে যায়।

একটি গল্প—কিন্তু এর আদি, মধ্য, অন্ত লিখেছেন তিনজন লেখক আলাদাভাবে। তিনজন লেখকের লেখা তিনটি অধ্যায়ের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ এই গল্পটি।

বাঁধা যজমান আছে কিছু। তাদের যত ক্রিয়াকর্ম হরিহর ভটচাযকে ছাড়া চলে না। বরং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা অপেক্ষা করবে, তবু অন্য কাউকে দিয়ে কাজ করাবে না।

সূর্যোদয়ের আগে হরিহর ঘাটে এসে পৌছয়। তখন ঘাট ফাঁকা। পাড়ার দু একটা বৃদ্ধা শুধু ডুব দিতে আসে। হরিহর বলে কাকস্নান। শেষঘাটে বসে কোনরকমে মাথা ভেজানো। কেউ আরো দু এক ধাপ নেমে চট করে একটু ডুব দিয়ে নেয়। এটা হরিহর লক্ষ্য করেছে যাদের বয়স যত বেশী, তাদের প্রাণের মায়াও তত বেশী। একটু জোয়ার হলে বয়স্করা ধারে কাছে থাকে না, অথচ ছোকরাগুলো আশপাশের ভাঙা পাঁচিল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের ওপর।

কাঁচা প্রাণের ওপর ভাগীরথীরও টান বেশী। বছর বছর যে কটি গ্রাস করেন, সবই তাজা বয়সের।

কাছাকাছির মধ্যে এ ঘাটেই ভীড়টা সব চেয়ে বেশী। দশ গজের মধ্যে একটা আশ্রম আছে, একটু দূরে একটা হাসপাতাল। গোটা দুয়েক কারখানা। নানা মেজাজের, নানা মতের লোক স্নান করতে নামে।

ঘাটে বসে নানা ধরনের আলোচনাও চলে। শ্মশানঘাটের মতন ভাগীরথীর ঘাটেও মানুষে মানুষে যেন পার্থক্য থাকে না। সমাজের যে কোন স্তরের লোক দিব্যি পাশাপাশি বসে থাকে। যে যার বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী কথা বলে।

আশ্রমের অধ্যক্ষের পাশে নির্বিবাদে মোটর ওয়ার্কস-এর ফটিকচাঁদ বসে আধ্যাত্মিক আলোচনা করে।

ওসব ভাঁওতা, ঠাকুর, সব ভাঁওতা। নদীর আবার রকমফের কি? এ নদীও যা আর আমার গাঁয়ের পার্বতী নদীও তাই। একটা বড আর একটা ছোট এই যা। একটায় জাহাজ চলে আর একটায় নৌকা, তফাত এইটুকু।

খুব বিজ্ঞজনোচিত একটা কথা বলেছে এইভাবে ফটিকচাঁদ একটা পায়ের ওপর পা রেখে তালে তালে নাচাতে থাকে।

অধ্যক্ষ অমায়িক হাসেন। ফটিকচাঁদের অজ্ঞতা ক্ষমা করার ভঙ্গীতে, তারপর বলেন, বড বড কথা যাক, সামান্য একটা কথা বলছি। এই ভাগীরথীর জল একটা পাত্রে রেখে দাও, অন্য পাত্রে অন্য নদীর জল রাখ, দেখবে কিছুদিন পরে অন্য নদীর জলে পোকা বেডাচ্ছে, অথচ ভাগীরথীর জল যেমন ছিল, ঠিক তেমনই রয়েছে। কাজেই, এ জলের কিছু একটা মাহাত্ম্য আছে বৈকি।

হরিহর অন্য একজন যজমানকে মন্ত্র পডাচ্ছিল, কিন্তু কান ছিল এদিকে। কথাগুলো কানে যেতেই চমকে উঠল। দুটো হাত জোড করে প্রণাম করল ভাগীরথীর উদ্দেশে। ব্যাপারটা এতদিন খেয়ালই করেনি। তামার ঘটিতে করে জল নিয়ে যায়, জল বদলায় কিন্তু সে জলে পোকা হয় কি না সেটা লক্ষ্য করেনি।

আশ্রমের অত বড একটা অধ্যক্ষ কি আর বাজে কথা বলছেন? এই ঘাটে বসেই তিনি কতদিন বেদবেদান্ত ব্যাখ্যা করেছেন, গীতা পাঠ, সিঁডির চাতালে বসে বসে হরিহর শুনেছে।

বিকালে কাজ বিশেষ থাকে না, তাও হরিহর ঘাটে এসে বসে থাকে। অনেক রাত পর্যন্ত। ঘাট খালি হয়ে যায়। যে যার উঠে পডে। দু একজন নেশাখোর আর দু একটা বেওয়ারিশ কুকুর বসে বসে ঝিমোয়। চারদিকে অন্ধকার নেমে আসে। এ ঘাটে নৌকার ঝামেলা নেই। মাঝিমাল্লার চীৎকার শোনা যায় না। শুধু দুশ্চেদ্য তমসায় ভাগীরথীর কুলুকুলু ধ্বনি কানে ভেসে আসে।

হরিহর বলে, নদী কথা কয়। তারও সুখ আছে, দুঃখ আছে, আনন্দবেদনা আছে, ঢেউয়ের কলরোলে সেই সব অনুভূতি সে প্রকাশ করে।

হবিহর আরো একটা কথা ভাবে। নিঃসন্তান হরিহরের একটা ক্ষোভ, একটা ব্যথা, তার গৃহে শিশুর কাকলি নেই। ভাগীরথীর কাছে খুব ভোরে নির্জনতার সুযোগে অনেকবাব আকুল প্রার্থনা জানিয়েছে হরিহর। একটা সন্তান দে মা। তারপর আবেদন সংশোধন করে দিয়েছে, কন্যা নয় মা, পুত্র। আমার সঙ্গে সঙ্গে আসবে ক্রিয়াকর্মে সাহায্য করবে। তাকে সব মন্ত্রতন্ত্র শিখিয়ে যাব। যজমান চিনিয়ে দেব। যাগযজ্ঞ হোম সব ব্যাপারে সে আমার সহায় হবে।

আজকাল আর হরিহর এসব কিছু বলে না। বুঝতে পেরেছে বলে লাভ নেই।

কিন্তু অন্ধকার রাত্রে একেবারে শেষ ধাপে বসে ভাগীরথীর কল্লোল শুনতে শুনতে চমকে ওঠে। অবিকল শিশুর কলধ্বনি। ঠিক যেন খল খল হাস্যে দিগন্ত মুখরিত করে চঞ্চল পায়ে এক শিশু ছুটে আসছে তার দিকে, আবার বাহুবন্ধনে ধরা পডার আগেই সরে যাচ্ছে। ভাগীরথীর এ ছলনার অর্থ হরিহর বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে হরিহরের কানে অন্য কথাও আসে।

মল্লিক বাডির গিরিজা মল্লিক। বিরাট ধনী। তিনখানা গাড়ি কিন্তু

দরকারের সময় নিজে একখানাও পান না। বৌ আর ছেলেরাই ব্যবহার করে। প্রায়ই বিকালে চাতালে এসে বসেন। রুপোবাঁধানো লাঠিটা ইটের ওপর ঠুকে ঠুকে বলেন, ওসব পাপ, পাপ। যার নেই, সেই সুখে আছে। এর চেয়ে বাড়িতে একপাল বাঁদর পুষলেই পারতাম। পুন্নাম নরক থেকে উদ্ধার করবে সে তো পরের কথা, জীবনেই নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়ে ছাড়লে।

হঠাৎ হরিহরের দিকে নজর পড়ে যেতে বলেন, বেশ আছেন ঠাকুর মশাই আপনি। মুক্ত পুরুষ। অশান্তি, ঝামেলা নেই। সুখী লোক।

হরিহর কোন উত্তর দেয় না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। গিরিজা মল্লিকের পারিবারিক অশান্তির কথা সে একটু একটু জানে। এ তল্লাটের সবাই। ছেলেরা বাপকে মানে না। যার যা খুশি করে বেড়ায়। অশান্তির ঢেউ মল্লিক বাড়ির শক্ত, নিশ্ছিদ্র পাঁচিলের পরিধি পার হয়ে বাইরেও আছড়ে এসে পড়ে। পড়শীদের কিছুই অজানা নয়।

রোজকার মতন সেদিনও হরিহর খুব ভোরবেলা উঠে পড়ল। বাসি কাপড় ছেড়ে ঠাকুরঘরে ঢুকে তামার ঘটিটা তুলে নিল। পূজার তৈজসপত্রগুলোও। আজ ঝুনঝুনরাম আগরওয়ালা নতুন কারবারের পত্তন করবেন। সকালবেলা ছোটখাট একটা হোমের ব্যবস্থা হয়েছে ভাগীরথীর ঘাটে। পুরোহিত হরিহর ভটচায। ঝুনঝুনরাম বহুদিন আছেন এ পাড়ায়। বাড়িও করেছেন। প্রায় বাঙালীই হয়ে গেছেন। সবাই বলে ঝুনুবাবু। একটা পাটকল আছে, একটা তেলের মিল, আর একটা লোহার ছোট কারখানা খুলবেন বেলুড়ের দিকে, তাই আজকের এই হোমের বন্দোবস্ত। হোমের ভস্ম নিয়ে সোজা বেলুড়ে গিয়ে মেশিনে ছোঁয়াবেন। প্রাপ্তিযোগটা ভালই। তাই হরিহর একটু ভোর ভোরই ঘাটে গিয়ে পৌঁছল। কাজও অনেক আছে। মাটি দিয়ে বেদী করতে হবে তার ওপর বেলের ডাল। কোশাকুশি সাজাতে হবে। এসব করতে করতেই ঝুনঝুনওয়ালার মোটর এসে পড়বে জিনিসপত্র নিয়ে।

ঘাট একেবারে ফাঁকা। শুধু ওপরের চাতালে বসে নন্দপাগলা গান গাইছে, আমায় লোহারই বাঁধনে বেঁধেছে সংসার দাসখত লিখে নিয়েছে হায়।

অন্ধকারে ঠাওর করে করে খুব সাবধানে হরিহর সিঁড়ি দিয়ে নামল। আগে স্নানটা সেরে নেবে তারপর হোমের গোছগাছ করবে।

একেবারে জলের কাছাকাছি এসেই হরিহর থেমে গেল। আর একটু হলেই হোঁচট খেত। নীচু হয়ে দেখেই শিউরে উঠল।

কতকগুলো গাছের ডালে আটকে গেছে। দেহটা অর্ধেক জলে, অর্ধেক

সিঁড়ির চাতালে। আধঅন্ধকারেও জামার সোনার বোতামগুলো ঝকঝক করছে।

গিরিজা মল্লিক চিত হয়ে পড়ে রয়েছেন। মুখে কিন্তু দুশ্চিন্তা আর অশান্তির চিহ্নমাত্রও নেই। এতদিন পরে, এই ভাগীরথীর জলে যেন পরম শান্তি খুঁজে পেয়েছেন।

—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

॥ ২ ॥

বেঁচে থাকতে গিরিজা মল্লিককে কমই চিনত হরিহর, কিন্তু মৃত্যুর পর তিনি তার জীবনে বড় বেশী জড়িয়ে পড়লেন।

খবরটা ঘরে প্রথমে বয়ে আনল তার স্ত্রী। একেবারে পুরনো কয়েকটি গৃহস্থঘরে এয়োকর্ম বা ব্রত উদযাপনে এখনো সে সম্মানিত আহ্বান পায়, বারোয়ারী মণ্ডপে বিসর্জনের প্রতিমা সে-ই আগে বরণ করে। সেদিন হরিহর সন্ধ্যেবেলা ঘাটে বসবার জন্যে বেরুবার আগে সে দরজায় এসে দাঁড়াল।

"হ্যাঁগো, সবাই যা বলছে সে-কথা কি সত্যি?"

"কি বলছে আমি কি জানি?"

"আমাকে বললেন আরতির মা।"

"কিন্তু কথাটা কি?"

"তুমি নাকি মাল্লিকমশায়কে বলে দিয়েছিলে, অমুক দিনে অমুক সময়ে গঙ্গাজলে আপনি দেহ রাখবেন?"

কই, এমন কথা বলেছে বলে তো মনে পড়ে না হরিহরের।

মাঝে মাঝে অবিশ্যি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, "এত দুঃখ কিসের মল্লিক মশায়, পরকালের কথা ভাবুন।"

গঙ্গাতীরে দেহ রাখবেন একি কম ভাগ্যের কথা?

কিন্তু গৃহিণী যা শুনে এসেছে তা অবিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়। বললে, "সবাই বলছে যতই কলিকাল হক, তবু কিছু মাহাত্ম্য থাকবে বই কি, তোমার মুখ দিয়ে খাঁটি কথাটিই বেরিয়েছে।"

"যা শুনেছ সব বাজে কথা," বেরিয়ে আসে হরিহর। সে বলেছে বলে কথা ফলে যাবে তা বিশ্বাস হয় না। জাহ্নবী তার আকুল প্রার্থনা যদি শুনতেন তাহলে সে এতদিনে উপযুক্ত ছেলের বাবা হত। তার যতই ইচ্ছে থাক,

সে ছেলে হয়তো অন্য বৃত্তি নিত, অন্য জীবিকা, হরিহর ঘাটে এসে দাঁড়ায়।

তার কথা ফলবে কেন, সে অচলাভক্তি, জ্বলন্ত বিশ্বাস কোথায় তার, যার জোরে দেবী শাঁখারীর ঝাঁপি থেকে শাঁখা পরেন, একই গাছে লাল, সাদা দুটি জবা ফোটে।

না, দেবতার প্রতি তার কোন নালিশ নেই।

সে যাই মনে করুক, দেবতা যে মাঝে মাঝে ভক্তকে নিয়ে কৌতুক করেন তা এখন বোঝা গেল।

বাজারের মধ্যে তাকে চেপে ধরল নন্দ পাগলা। বলে দিতে হবে সে কবে মরবে। হরিহর যতই তার হাত ছাড়াতে চায় সে ততই ঢিপ ঢিপ করে পেন্নাম ঠুকে হেসে কেঁদে অস্থির। এমন বাসসিদ্ধ মানুষটি তাদের মধ্যেই আছেন, কেউই জানতে পারেনি। শেষে নন্দর হাত ছাড়াবার জন্যেই হরিহর বললে, "যদি কোন কথা ফলে থাকে নন্দ, জেনো মায়ের কৃপাতেই হয়েছে। এবার আমায় যেতে দাও, পথ ছাড় দেখি?"

এ-কথায় নন্দর হাত ছাড়ানো গেল বটে, কিন্তু আরো বহুজনের হাতে গিয়ে পড়ল হরিহর, বহু অবস্থার আবর্তে, গঙ্গার জলে খড়কুটো পাটের ফেঁসো অবধি এমন অসহায় হয়ে ভাসে না। চারিদিকে রটে গেল জাহ্নবী দয়া করেছেন হরিহরকে, ক্ষমতা দিয়েছেন হাতে তুলে।

তার মাড়োয়ারী ভক্ত চলে এল গাড়ি হাঁকিয়ে। "কানাঘুষোয় খবর পাওয়া মাত্রই কারখানায় ভাইপোকে বসিয়ে পেন্নাম করতে এলাম। একদিন নিয়ে যাব আপনাকে। বাড়িতে দেখবে সবাই। সত্যি, এতদিন ধরে ক্রিয়াকর্ম করে দিচ্ছেন, কোনদিন বুঝতে পারিনি ঠাকুরমশায়!"

বোঝবার কিছুই নেই এ-কথা কাকে বলবে হরিহর?

স্ত্রী বলে যদি কিছু না থাকবে তাহলে এতলোক আসে কেন? এতলোক আসছে, ভক্তি জানাচ্ছে হরিহরকে, এ-কথা তো মিথ্যে নয়!

এক এক সময়ে হরিহরের মনে হয় সে পাপ করছে। ঘাটে বসে বসে ভাবে এই যে এতজন আসছে, তার কাছে বসে দুটো সৎ কথা শুনছে, এই শ্রদ্ধা গ্রহণ করবার অধিকার নেই তার। সে তো যেমন ছিল তেমনই আছে। সেদিন এরা আসত না, আজ আসে কেন? সেদিন এমন প্রণাম জানাত না, আজ জানায়, কাকে জানায়?

আবার মনে হয়, এমন করে বিবেকের দংশনে সে মিছেই জ্বলে মরছে। কোন অন্যায়ই হচ্ছে না তার। এ সৃষ্টিতে যে যার কাজ করে চলে। নদী,

এই ভাগীরথী, বলতে গেলে, এর আর কি কাজ আছে, এও শুধু সমুদ্রের দিকে যায়। হরিহর যে সেই পুণ্যতোয়াকেই বিগ্রহ জ্ঞানে পুজো করে এটি তার কাজ। ভক্তি আর বিশ্বাসটাই আসল কথা, সে যে দেবতাকেই দিই না কেন।

তাই, তার কথায় মানুষ যদি বিশ্বাসের একটি শীতল আশ্রয় খুঁজে পায়, তো পাক না।

আবার অন্য কথাও কানে আসে, সে প্রবঞ্চক, সুবিধেবাদী। তার এতদিনের কৃচ্ছ্রসাধন সব মিথ্যে, আসলে সে ব্যবসায়ে নেমেছে। মন আবার সংশয়ে দীর্ণ হয়।

এরই মধ্যে একদিন তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাতে এল ফটিকচাঁদ। বললে এবার কলকাতা থেকে আত্মীয়-স্বজনদের আনিয়েছেন মল্লিকদের বড়ছেলে। কাল আসবেন সবাইকে নিয়ে।

"কেন আসবেন?"

"কেন কি ঠাকুরমশায়, ওঁরা আপনাকে দেখতে চান যে!"

দেখতে চান! হরিহরের হঠাৎ মনে হল বড়বেশী জড়িয়ে ফেলেছে সে নিজেকে। অনেক আগেই তার বলা উচিত ছিল তোমরা কাকে ভক্তি জানাচ্ছ? সে আমি নই। আমি বড় সামান্য ব্রাহ্মণ, গঙ্গোদকের আধারকে পুজো করেই সন্তুষ্ট থেকেছি। মনে হয় নিজেকেই সে বিপদের জালে জড়াচ্ছে। যেদিন এরা জানবে তার কোন ক্ষমতাই নেই সেদিন কি এরা তাকে ক্ষমা করবে? সেদিন সে যদি বলে মহাপুরুষ হতে চাইনি আমি, যতবার বলেছি না, কোন ক্ষমতা নেই আমার, ততবারই তোমরা ভেবেছ সেটা আমার বিনয়।

রাতে শুয়ে শুয়ে গৃহিণীকে বলল, "কাজটা বোধহয় ভাল হল না গিন্নী, এ আমি ঠিক করিনি।"

"কি ঠিক করনি", গৃহিণী বললে, "তুমি যে মিছে কথা কও না, গঙ্গা পুজো কর, এ কথা কি মিথ্যে? তুমি কি, এই যে এতলোক আসছে, কারুকে একটা জিনিস প্রণামী দিতে দিয়েছ? তুমি যা ছিলে তাই আছ, তা দেখে যদি মানুষ ভক্তি করে তো করুক না। তুমি ভাব কেন?"

ভাব কেন, বললেই কি ভাবনা চলে যায়? সারারাত ধরে ভাবল হরিহর। ভোরবেলা, অন্ধকার থাকতে উঠে গেল আজ। অনিদ্রায় মাথা দপদপ করছে, প্রত্যহের স্নানটা আজ আগে সারা চাই।

জলে পা দিতেই শিউরে উঠল শরীর। একদিন, আর একদিন সে এসেছিল অন্ধকার থাকতে, সেদিন থেকেই তার জীবনের ধারা গেল পালটে। আজ আবার সে একা ; ঘাটে কেউ নেই। জীবনটা দুর্বহ হয়েছে তার কাছে, নিজের মন নিয়ে, বিবেক নিয়ে আর সে পারে না।

উপায় সামনেই। কুলুকুলু নাদে বয়ে চলেছে নদী, অবিরাম, কত যুগ ধরে। হরিহর সেদিন গিরিজা মল্লিকের মুখে প্রশান্তি দেখেছিল, প্রশ্নের অবসান। সে ধীরে জলে নামল।

এখন জল কত কাছে। মা বলে ডাকে হরিহর, মা'র কোলেই কি সঁপে দেবে নিজেকে ? জলে হাত রাখল আলতো করে। অনেকদিনের সম্পর্ক, অনেকভাবে দেখা, সে স্থির হয়ে দাঁড়াল। এখন সব ভেবে নেওয়া দরকার, অন্যের সম্পর্কে বলতে না পারুক, নিজের ব্যবস্থা তার নিজের হাতে। সে ধীরে চোখ বুজল।

চোখ খুলল হরিহর। না কিছুই হাতে নেই তার, নিজের জীবনও নয়, সে ডুব দিল কানে আঙুল দিয়ে। কে বলছিল সেদিন হরিহর মানুষের মনে ভক্তি ফিরিয়ে এনে ভগীরথের কাজ করল। কে জানে কি সত্যি, কি মিথ্যে তবে এমন করে জীবন থেকে সরে গিয়ে লাভ নেই। তার যেটুকু করবার সেটুকু করে যাবে।

"আজ সব তোমার হাতে," হরিহর হাত জোড় করে মনে মনে বলে, প্রণাম জানায়। নিরুত্তর, নিরুত্তর নদী। কলকলে, ছলছলে হয়ে যাওয়াই তার কাজ। হরিহরের এত প্রশ্নের একটি জবাবও সে দেয়নি, ভক্তের জন্যে যদি না হয়, তবে নদীর ভাষা কার জন্যে ?

হরিহর ঘাটের সিঁড়ি ধরে উঠতে লাগল।

—মহাশ্বেতা দেবী

॥ ৩ ॥

উঠেই চলেছে। অসহ্য ক্লান্তি শুধু তো অনিদ্রাই নয়, অবসন্ন দেহের ভারই নয়, এক বোঝা প্রশ্ন সংশয়, তার ওপর ক্ষুব্ধ বিবেক। শরীর বয় না, পা ওঠে না, সিঁড়ির যেন আর অন্ত নেই।

একটা প্রচণ্ড অভিমান ঠেলে উঠছে মনে, ঘুরে দাঁড়াল হরিহর। না, শেষই করে দেবে সব জ্বালা। মুক্তি কি মোক্ষ—এসব কিছু আশা করে নয়।

অসীম বিশ্বাসে যাকে এতদিন পুজো করে এসেছে, সে একটা জল-প্রবাহ মাত্র। তার হাতে যেমন জীবত্ব প্রশ্নের কোন সমাধান নেই, তেমনি নেই মুক্তি—মোক্ষের প্রসাদ। পরিস্থিতিটা অসহ্য হয়ে উঠেছে, মৃত্যুকে সামনে যে-রূপে পাচ্ছে সেই রূপেই করবে বরণ। এই ভাগীরথীর তীরে, বুকে, নাকি কত কি অলৌকিক ঘটে গেছে—জীবনভোর প্রবলভাবেই বিশ্বাস করেও এসেছে হরিহর, আজ তার কাছে সব অলৌকিকত্বই অলীক।

কি ভেবে কিন্তু আবার ঘুরে ক্লান্ত চরণক্ষেপে উঠেই চলল হরিহর। কেন, দেহমনের চরম অবসাদও তো সেই চরম শান্তি মৃত্যুকে এনে দিতে পারে। তাহলে তার জন্যে কেন এই মূক জলপ্রবাহের আশ্রয় নেবে ?

ঐ অভিমান আর কি।

তারপর এল সেই অলৌকিক। আর, যখন এল তখন একেবারে কল্পনাতীত রূপেই এল। যেন ভাগীরথীর তীরের যুগযুগের ঐতিহ্যের পুনরাবর্তন করেই। কত কাহিনীতে কত উপাখ্যানে যা সব ধরা রয়েছে।

প্রথমে মনে হল একটি আলোকবিন্দু—জোনাকীর মতই ক্ষুদ্র—নীচের, অর্থাৎ ভাগীরথীর দিক থেকেই হাওয়ায় ভেসে এসে হরিহরের সামনে হাত দুয়েক ব্যবধানে স্থির হয়ে দাঁড়াল। আজ যতখানি রাত্র থাকতে বেরিয়েছে বলে আন্দাজ হরিহরের, তার চেয়ে বরং বেশি রাতই ছিল। অন্ধকার এখনও কাটেনি। প্রথমে জোনাকী বলেই মনে হল হরিহরের। পরক্ষণেই সমস্ত দেহে রোমাঞ্চ জেগে উঠে মনটা সেই অতীন্দ্রিয়-কিছু একটার জন্যে উদগ্র হয়ে উঠল যার প্রত্যাশায়—অসীম ধৈর্যে এতদিন এসেছে কাটিয়ে।…জোনাকী, কিন্তু জোনাকী তো কখনও স্থির থাকে না!

ওর চিন্তার মধ্যেই আলোকবিন্দু প্রসারিত হয়ে একটি জ্যোতিকমলের রূপ নিল। তারপরেই…

প্রথমটা হরিহরের মনে হল নন্দ পাগলার মেয়েটা। আছে বছর দশ-বারোর একটা মেয়ে ওর, নিজের কি, কুড়িয়ে-পাওয়া কেউ জানে না—বাপের মতই খ্যাপাটে, আপন-ভোলা, সর্বত্রগতি, তবে—

ঘাটের টানটাই বেশি। নামটা দুলালী থেকে দুলীতে এসে দাঁড়িয়েছে। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু বুঝল দুলী নয়, এ আর এক মেয়ে। তবে বোধহয় মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টির জন্যেই হরিহরের মনে হল একেবারে দুলীর মত না হলেও তার সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে। শুধু তার সঙ্গেই নয়, যেন ঐ বয়সের যেথায় যত মেয়ে আছে, দেখা-অদেখা সবার সঙ্গে কি করে কোথা দিয়ে

একটা মিল রয়েছে মেয়েটির। ওর অধরে ঐ যে ক্ষীণ হাসিটুকু ফুটে উঠেছে তাতে যেন এই অনন্ত রহস্যেরই সঙ্কেত।

তা তো হবেই - মেনে নেওয়ার জন্যে হরিহরের মনটাও প্রস্তুত হয়ে উঠেছে —ঐ মেয়ে, ভাগীরথী, কণ্ঠে কৈশোরের কুলু-কাকলি, ওই তো সব মেয়ের মধ্যেই রয়েছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে।

তারপর কথাও ফুটল—

"অভিমান হয়েছে, না? তা এই তো এলাম, আর কি চাস, বল।"

"আর কি চাস!"—অভিমানভরেই ওর কথাটা উল্টে দিল হরিহর, বলল—"যেন দুহাত ভরে কত না দিয়ে এসেছিস জীবনভোর।"

"ওমা দিইনি! সবচেয়ে যা বড় পাওয়া, একটা ছোট্ট তামার ঘটির মধ্যে গোটা আমাকে পেয়ে গেছিস, কটা লোক পায় বল?"

তারপর একটু মাথা দুলিয়ে খোঁটা দিয়েই বলল—"অবিশ্যি যতদিন চেয়েছিলি। তারপর তোর ছেলের সাধ হল…"

"মস্ত বড় অপরাধ হয়েছিল যেন!" হরিহরও ঠেস দিয়েই উত্তর করল, বলল—"কেউ যেন চায় না, কাউকে যেন দিসনি কখনও।"

ওদিক থেকে উত্তর—"গিরিজা মল্লিকের অবস্থা দেখেও তোর হুঁশ হবে না কি করে জানব? দেখিয়ে তো দিলাম।"

কবার প্রশ্নে-উত্তরে ছমছমিটা আরও কেটে গিয়ে বেশ সাহস দাঁড়িয়ে গেছে হরিহরের, জোরের সঙ্গেই বলল—"তেমন ছেলেই বা দিতিস কেন? পুজো-অর্চা নিয়ে থাকত, জোত-যজমানগুলো বজায় রাখত…"

"ঝুনঝুনরামের কালো-বাজারের কল্যাণে যাগ-যজ্ঞ করত…"

ঠোঁটের সেই হাসিটা দুষ্টুমি করে একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলল মেয়েটি।

"তা না-ই করত।"—তর্কের ঝাঁঝের সঙ্গেই উত্তর দিল হরিহর।

বলল—"কিছু না তো বাড়ির পুজোর ধারাটা বজায় রেখে যেতে পারত তো।"

"রক্ষে করো!"—এবার একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি। দুলী খেপী যেমন ওঠে হেসে; দুলে দুলে ঢলে পড়ে। তার মধ্যেই দুষ্টুমিতে চোখ নাচিয়ে বলল—"নিজে যা করছিস করে রেহাই দে আমায়; দুপুরুষ ধরে ঐ ছটাক খানেকের তামার ঘটিতে বন্দী থাকি আর কি, ইন্দ্রের ঐরাবৎকে যে নাকি নাকানি-চোবানি খাইয়েছিল। জানিস না সেকথা?"

হাসিটা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। গঙ্গায় বুঝি জোয়ার এল? ঢেউয়ের

তালে হাসিটা যেন আরও জমে উঠে আরও বেশি করে বাজছে কানে। সত্যিই তাহলে কোন অপরাধ করে এল নাকি সারা জীবনটা ধরে? বাঃ তাই বা কেন হবে? বুকে আবার সাহস ভরে নিল হরিহর। যে ঐরাবৎকে নাকানি-চোবানি খাওয়ায় তাকে ভক্তির জোরে যে তামার ঘটিতে বন্দিনী করে রাখতে পারে সেই বা কম কিসে?

ভক্তির কথাতেই সম্বিতটা হঠাৎ ফিরে এল হরিহরের। কিন্তু সে ভক্তি কোথায় তার? একটি ছোট মেয়েকে ছোট মেয়েই ভেবে তর্কের ঝোঁকে, হেলায় একি হারাতে বসেছে আজ!

স্থির দৃষ্টিতে স্মিত প্রসন্ন মুখখানির দিকে চেয়ে রইল হরিহর সব চটুলতা বন্ধ করে। চেষ্টা করছে আর সব কিশোরীর মতোই এই কিশোরীকে আশ্রয় করে ফিরিয়ে আনতে সেই অচলা-ভক্তি। মনের সমস্ত ব্যাকুলতা দিয়ে। পারছে না কিন্তু। কী ভাষায় কী মন্ত্র পড়বে; কী চাওয়া, কী পাওয়া দরকার —সব যাচ্ছে গুলিয়ে। এদিকে লগ্ন যাচ্ছে বয়ে। এ আঁলো যেমন হঠাৎ এসেছিল, এ-কমল যেমন হঠাৎ ফুটেছে তেমনি হঠাৎই তো মিলিয়ে যাবে এক্ষুনি।

"তার চেয়ে এক কাজ কর না।"—কিশোরীই সমাধান করে দিল, যেন হরিহরের মনের অবস্থাটা বুঝে নিয়ে। মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে এসেছে, তবু সেই চটুল হাসির রেখা কোথায়, যেন একটু রয়েছেই আটকে, তুলীর যেমন থাকে এক এক সময়।

"কি, বল্। করব যা বলবি।"—উদগ্রীব হয়ে বলল হরিহর।

"মেয়ে চা বরং একটি।"

"তুই দিবি মা!...দে! দে! তাই দে!! কী মেয়ে দিবি মা?..."

"যাকে সারা জীবন চেয়েছিস, ধর্ যদি আমিই আসি?..."

—তীব্র উত্তেজনায় সমস্ত দেহটা যেন খানখান হয়ে ভেঙে যাবে এবার হরিহরের। তাইতেই ঘুমটা গেল ভেঙে।

দারুণ আনন্দে সিঁড়ির একটা ধাপে বসে একটাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সিধা হয়ে বসে ঘুরে চাইল। সূর্য বুঝি এই উঠল; তীরের গাছের মধ্যে দিয়ে ঋজুভাবে নদীর জলের ওপর গিয়ে পড়েছে তারই একটি! হরিহরের মনে হল মেয়েটিই এই আলোর আলপনা বেয়ে আবার নেমে গেছে জলে।

মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, আচ্ছন্নভাবেই স্নানটা সারল হরিহর। আজ

আর অভাব, অভিযোগ, বিবেক, সংশয়—কোন কিছুর কথাই তুলল না। ঘটিটি ভরে নিয়ে বলল—"তুমি সন্তান হয়ে আসবে কি তোমার ছলনা কিছুই জানিনে মা। আজ শুধু একটি প্রার্থনা—বাইরের জীবনটা সুখ-দুঃখ, যা খুশি তোমার তাই দিয়ে দিও ভরে, শুধু অন্তরটা এই তামার ঘটটুকুর মতন তোমায় দিয়ে চিরদিন রেখো পূর্ণ করে।"

—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

একথা-সেকথা

॥ ১ ॥

১২।২।২৫

দিল্লী। এখানে আসিয়া প্রথম দিনই কুতবমিনার দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রকাণ্ড একটা ঘেরা হাথার মধ্যে এই স্তম্ভরাজ মাথা উঁচাইয়া পরিবর্তনশীল বহুবিস্তৃত দিল্লীর পানে চাহিয়া আছে। শত শত বৎসর নিজের নিজের রাজশ্রীর গৌরবে, রাজধানীর উল্লাস বিভীষিকার মধ্যে দিয়া কত দিল্লী কত নামে কাটাইয়া গেল, এই স্তম্ভ অপরিমিত আয়ু লইয়া তাহা দেখিয়াছে, আরও যে কত দিল্লী দেখিবে কে জানে। ঘেরাওটার ভিতর দিয়া অনেক কবর, অনেক বাড়ির ভাঙা ভাঙা ছোট বড় খিলান। একটা কবর—সেটা নাকি আলতামানের। ঠিক মিনারের সামনাসামনি উত্তর দিকে আর একটা বৃহত্তর মিনারের পত্তনি (বোধ হয় শুরু করিয়াছিল)—খানিক দূর উঠিয়া বাদশার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গিয়াছে। গাঁথুনিটা শৃঙ্খলাবদ্ধ আজকালকার গাঁথুনির মতন নয়—পাথরের চাঁই আর মসলা দিয়া মোটামুটি একটা চাপের মত করিয়া তুলিয়া গিয়াছে—অনেকটা মাটির দেওয়ালের মতন। জিনিসটা মানুষের আকাঙ্ক্ষার দুর্বলতার একটা কঠিন সাক্ষ্য। কুতুবমিনার যেমন বিজয় ও সফলতার সাক্ষ্য, তাজ যেমন মর্মস্পর্শী প্রেমের সাক্ষ্য, এটা তেমনই মানুষের বিফলতার, কালের নিকট পরাজয়ের সাক্ষ্য—যেন একটা মূর্ত বিদ্রূপাত্মক অট্টহাস্য।

মিনারের সামনে অনেক থাম ও খিলানের বারান্দা দিয়া ঘেরা একটা প্রকাণ্ড হাথা—উঠানের সামনে গোটাকতক বড় বড় গুম্বজ। কে মসজিদ করিতে চাহিয়াছিল—সম্পূর্ণ শেষ করিতে পারে নাই। সেই গুম্বজগুলার সামনে দুই তিন সারি থামে-ঘেরা অনেকখানি লইয়া একটা প্রকাণ্ড বারান্দার মতন। থামগুলা বোধহয় হিন্দুদের মন্দির হইতে আনা। মুসলমানেরা দেখিতেছি খুব উদার জাতি—ভাবিল এই মসজিদও ঠাকুরের স্থান, আর কাফেরের মন্দিরও ঠাকুরের স্থান—ওখান থেকে পাথর এনে এখানে লাগাইলে আর দোষটা কিসের! আমি ভাবছি আবার তাই যদি হইবে তো ঠাকুরের নামের জিনিস ভাঙিতেই বা যাইত কেন?—ভাবিত বোধহয় কাফেররা কদর জানে না। কি যে এ জাতটা ভাবে আমি আজ পর্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যেটাকে অপবিত্র ভাবে পবিত্র মসজিদে তো সেই সবই জড়ো করিয়াছে।

যাক্ মোটামুটি জানা গেল পৃথ্বীরাজের দিল্লী এইখানটা ছিল এবং পরে পাঠান বাদশাহরা এইখানে আস্তানা গাড়ে। মিনারের দক্ষিণ দিকটা একটা মসজিদের গুম্বজ অনেকটা অক্ষত অবস্থায় আছে। এইটা দেখিতে চমৎকার এবং বেশ বড।

আমরা কুতবমিনারের চোইদ্দি ছাড়িয়া আরও দক্ষিণে একটা প্রদর্শকের সঙ্গে রিজিয়ার কবর দেখিতে গেলাম। রিজিয়া যে বাড়ি ফাঁদিয়াছিল তাহা আর শেষ করিয়া যাইতে পারে নাই। তাহার কবরের পাশে তাহার হাবসি প্রণয়ীর একটা কবর। হায় রাজপুত্রী!

আরও একটু দূরে একটা অদ্ভুত গোছের কুয়া আছে। আমাদের চক্ষে অদ্ভুত ঠেকিলেও এরকম ধরনের কয়েকটা কুয়া দেখিলাম—তাহার মধ্যে দুই তিনটা আগ্রায়। কুয়ার তলা হইতে উপর পর্যন্ত চারিপাশে কামরা তৈয়ারী করা। কুয়ার গভীরতা অনুযায়ী এই সব কামরা সাত-আট তালা। উপর হইতে দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। দারুণ গ্রীষ্মের দিনে এইসব কামরায় আশ্রয় লইয়া নবাব বাদশাহরা শীতল হইত। কুয়ার একদিক হইতে আবার বরাবর উপর পর্যন্ত সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সেই সিঁড়ি বাহিয়া জল পর্যন্ত নামা যায়। রিজিয়ার প্রাসাদভুক্ত এই কুয়ায় জল পর্যন্ত আমিও নামিয়া গেলাম—১০২।৩ ধাপ সিড়ি হইবে; নিচের দিকটা বেশ ঠাণ্ডা। একটা লোককে ছয় গণ্ডা পয়সা দেওয়ায় সে কুয়ার প্রায় ৫।৬ তলা উপর হইতে লাফ দিয়া জলে পড়িল। লোকটা বৃদ্ধ—ইহাদের ব্যবসাই এই।

এখান হইতে আসিয়া কুতবে উঠিলাম। ৩৮০ ধাপ, গাইড বলিল ২৩২ ফিট উঁচু। উপরে উঠিয়া খানিকটা বসিলাম। ভারতের সমতলের মধ্যে সকলের চেয়ে উঁচু জায়গায় বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া ৯টা মৃত শিল্পীর কবর দেখিলাম। বহুদূর পর্যন্ত অসমতল ভূমি—মাঝে মাঝে এক একটা বুরুজ কি এক-আধটা ভাঙা স্তম্ভ। কোথাও কোথাও পাহাড়ের রেখা একটু-আধটু আঁকিয়া-বাঁকিয়া গিয়া সমতলের সঙ্গে মিলাইয়াছে। এই স্তম্ভকে কেন্দ্র করিয়া ১৫।১৬ মাইল ব্যাপিয়া লীলাময়ী দিল্লী বিস্তীর্ণ। নিজের খেয়াল অনুযায়ী আজ যেখানে রাণীর বেশ ধরিয়াছে কাল সেইখানেই শ্মশানভস্ম গায়ে মাখিয়াছে।

ফিরতি যুধিষ্ঠিরের কেল্লা নামে অবিহিত বিশাল কেল্লাটা দেখিলাম। পাঠান দিল্লী আর মোগলের অধুনাতম দিল্লীর মাঝামাঝি। প্রবেশ করিতে হয় একটা বিশাল দ্বারপথ দিয়া—আমি কত লক্ষতম প্রবেশক কে জানে। ভিতরে গিয়া দেখিলাম মধ্যে একটা বিশাল ভূমিখণ্ড।

পাথরের প্রাচীরের ভিতর দিকটা খিলান করা ছোট ছোট কামরা। (এরূপ প্রায় সব দুর্গের মধ্যেই দেখিলাম। বোধহয় রক্ষীদের বাসস্থান ছিল।) একটা হর্ম্য ভাল অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। ভিতরে গিয়া দেখিলাম মুসলমানদের আঁচড় রহিয়াছে। পূর্বে দুর্গটা যুধিষ্ঠিরের হউক বা অন্য কোন হিন্দুরাজারই হউক ; মুসলমানরা যে এক সময় দখল করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া একসময় যমুনা বহিত এখনও তৃণাস্থীর্ণ বালুকাময় ভূমিতে তার চিহ্ন আছে। সত্য মিথ্যা যাই হোক, যুধিষ্ঠির নামের সহিত জড়িত বলিয়াই আর বাহির হইতে পা নড়িতেছিল না। সূর্য তখন অস্তমান। একসময় যেখানে বোধহয় মহাভারতের কত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল সেই মাটির উপর দাঁড়াইয়া অস্তমিত-গৌরব হিন্দুর এক সন্তানের মনে কি হইতেছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। সমস্ত দিনটাই যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে কাটিয়া গেল। ৪০০০ বৎসর পূর্বের হিন্দু যুগের কত অস্পষ্ট দৃশ্য তাহার পর ঐতিহাসিক যুগের হিন্দুরাজত্বের কত স্পষ্টতর ঘটনা—তাহার পর ৫০০ বৎসর ব্যাপী পাঠান যুগের, পঞ্চপাঠান বংশের রক্ত-রঞ্জিত ইতিহাস এই পুরাতন দিল্লীর পথে ঘাটে, দুর্গে, মিনারে, পাহাড়ে বিক্ষিপ্ত দেখিলাম। যুধিষ্ঠির বোধহয় একদিন যে স্থান হইতে এমনি উজ্জ্বল সন্ধ্যায় দাঁড়াইয়া নিজের বিশাল রাজ্যের নবোত্থান প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেইখান হইতে সাত সমুদ্র তের নদীর পারের একজাতির গণনানুযায়ী বিংশ শতাব্দীর এই দিনে আমি দেখিতেছি—ঐ দূরে বিদ্যুৎ আলোকিত শ্বেত-হর্মরাজির শোভায় দিল্লীর দ্বাদশ রাজধানী মাথা উঠাইতেছে। সেই যুধিষ্ঠির দুর্গে—আমারই পাশে এক ইংরেজ রমণী ও তাহার স্বামী ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলী পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছে।

॥ ২ ॥

২৩।২।২৬

মঙ্গলবার

পরদিন আমরা দিল্লীর কেল্লা দেখিতে গেলাম। খোলা থাকে ১০ হইতে ১টা এবং ৩ হইতে ৫টা, দুই আনা করিয়া টিকিট। আমরা বারজনে গিয়াছিলাম। কিল্লার ফাটকের ভিতরে ঢুকিয়া খুব উচ্চ খিলানের মধ্যে দিয়া সোজা যাইতে হয়। দুধারে ছোট কামরায় দোকান। এই খিলানকরা রাস্তাটার পরেই

খানিকটা খোলা জায়গা—তাহার পরেই নহবৎখানা। এইখানে টিকিট দিয়া দিতে হয়। বাড়িটা দুই তলা—লাল পাথরের, এখন যুদ্ধের নূতন-পুরাতন অস্ত্রশস্ত্রের আজব ঘর। ঠিক সামনাসামনি 'দেওয়ানি আম' লাল পাথরের একতলা দালান—সারি সারি থামের উপর দাঁড়াইয়া। মাঝখানটার, দেয়ালের গায়ে ঘেঁষিয়া দুই মানুষ আন্দাজ উঁচুতে বাদশাহের বসিবার জায়গা ছিল। শ্বেতপাথরের একটা খুব লঘু ছাঁটেব খিলান, পিছনে শ্বেতপাথরের গায়ে নানারকম পাথরের বিন্যাসে নানারকম পা ী তৈয়ার করা। লেখা আছে —ইহা কোন কারিগরের তৈয়ারী৷। উপরে ঠিক মাঝখানটা একটা ফরাসী **orpheus** এর পাথরকাটা প্রতিলিপি অনুমানটা অনেকটা সাব্যস্ত করে।

দেওয়ানি আমের বাম দিক দিয়া নামিয়া পিছনে যাইতে হয়। সামনেই এক—কাতারে—কেল্লার দেওয়ালের প্রায় গায়ে ছোট বড নানারকমের হর্ম— মমতাজমহল, শিল্পমহল, রঙ্গমহল, দেওয়ানিখাস, খাসমহল ইত্যাদি। সব হাল্কা হাল্কা বাড়ি অদ্ভুত কাজকরা। কোনটাই কিন্তু বড নয়। সে আমলে দেখিতেছি খুব বেশিরকম বড করিবার ঝোঁক ছিল না। মাপিক সইরকম অবয়ব করিয়া সৌন্দর্যে কারুকার্যে ভরিয়া দিত। ইউরোপীয় দাম্পত্য বিশালতার মধ্যে সৌষ্ঠব ও সামঞ্জস্য রক্ষা কবিয়া চলে। ভারতে পুঙ্খানুপুঙ্খতার দিকে বেশী ঝোঁক। খাসমহল, হামাম, দেওয়ানিখাস, এই সবে সুক্ষ্মতার পবাকাষ্ঠ বর্তমান। ইউরোপীয় স্থাপতের সৌন্দর্য পৌরুষ, আর এসব যেন এক একটি তন্বীতরুণী—নেহাত পাখা নাই বলিযাই যেন মাটি স্পর্শ করিয়া আছে—ঐ লঘু প্রজাপতিটির মত কি মিষ্টি গন্ধটির মত হাওয়ায় ভাসিয়া বেডাইলেই বেশী মানাইত।

ইহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া খাসমহল আমার চক্ষে এক অদ্ভুত জিনিস বোধ হইল। ইহাতে তিনটি মহল আছে অর্থাৎ তিনসেট ছোট ছোট ঘর কিম্বা দালান হইতে সোনালী জল আর রং দিয়া চমৎকার লতা পাতা আঁকা। পাথরের জাফরি সুক্ষ্ম হইতে সুক্ষ্মতম কারুকার্যে ভরা। এত হাল্কা ফিনফিনে হইয়া গিয়াছে যেন চাদরের উপর জরির কাজ বলিয়া মনে হয়। ইহার একসেট ঘবের নাম 'খোয়াব-গাহ,' অর্থাৎ 'স্বপ্নবিলাস'। বাদশাহ এখানে আলবোলার সুরভী ধুঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐহিক-বেহেস্তের স্বপ্ন দেখিতেন। ঘরগুলায় ইংরাজ গভর্নমেণ্ট মছলন্দ, কিংখাপ, মখমলের তাকিয়া ঝালর প্রভৃতি সাজাইয়া—কারু-কার্যময় আলবোলাটি যথাস্থানে রাখিয়া ঘরে তালা আঁটিয়া রাখিয়াছে। এই মহলটা লালিত্যে আমার এতই চমৎকার লাগিল যে বলিয়া উঠিতে পারি না—

মনে হয় সমস্ত মহলটাই অবাস্তব—বাদশাহি স্বপ্নের একটা বিচ্ছিন্ন খণ্ড আমাদের মোহাবিষ্ট নয়নের সামনে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাসিয়া আসিয়াছে—যদি দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায় তো কিছুই আশ্চর্য হইবার নাই। লিখিতে আমার সাহস হইতেছে না কিন্তু তবুও লিখিতে হয় যে সৌন্দর্য সৃষ্টির হিসাবে অল্পায়তনের মধ্যে আমার খাসমহলটা আগ্রায় তাজমহলের চেয়ে নিচু বোধ হইল না। অবশ্য তাজ তাজই—কিন্তু খাসমহলও অনির্বচনীয়। তফাত এই যে তাজের সৌন্দর্য বাহিরে—ভীতরে, নিজটুকুতে এবং আবেষ্টনীতে সর্বত্র সমান, পরিকল্পনায় Execution-এ; আর সকলের ওপর স্মৃতির ঐশ্বর্যে তাজ হর্মমাত্রেরই তাজস্বরূপ, কিন্তু তাজের চেয়ে অনেক অল্পতার মধ্যে খাসমহল বড় রমণীয়। বিশেষ করিয়া ভিতরের মধ্যে দিয়া দেখিলে।

মহলের মধ্যস্থান দিয়া "নহর-ই—বেহেস্ত" চলিয়া গিয়াছে। কেল্লার দেওয়ালের উপর একটা ঝরোঙ্গ। বাদশাহ প্রত্যহ এইখানে আসিয়া দর্শন দিতেন।

মমতাজমহল বলিয়া একটি বাড়ি আছে। সেখানে আজকাল ইংরেজ গভর্নমেণ্ট মোগলবাদশাহ ও ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সংক্রান্ত আজব-ঘর বসাইয়াছে; দুইদিন দেখিলাম। অনেক ছবির সমাবেশ করিয়াছে। আমার চোখে ঠেকিল বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ও তাঁহার বেগম জিন্নৎ মহলের পোশাক। বাদশাহের পায়জামা সবুজ সিল্কের উপরে জড়ির কাজ করা কাপড়ের, খুব ঢিলা-ঢালা সোজা ছাঁট—ইট-খোলার চিমনির মতন। শালের চাপকানেরও বিশেষ তারিফ করিতে পারিলাম না। বেগম সাহেবার ঘাঘরা ও দোপাট্টাও তথৈবচ। হইতে পারে ইহাই সর্বাপেক্ষা ভাল পোশাক নয় এবং মোগল বাদশাহ বংশ বাহাদুর শাহের আমলে তৈলহীন দ্বীপের নিষ্প্রভ শিখার মতই হইয়া পরিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের যুগের সহিত তুলনা করিলে অন্ততঃ বেশভূষা যানবাহনাদিতে পূর্ববর্তী কোন যুগই থই পায় না। আমার মনে হয় এই যুগটাকে পঙ্গু করিয়া 'সত্য যুগের' যে বোধটা জগতে চলিয়াছে তাহা অনিষ্টজনক। আমরা আদর্শযুগের কাছেই অগ্রসর হইতেছি এবং বর্তমান যুগেরই আংশিক সংস্কারে সমর্থ হইলে মানব সমাজ কল্যাণের আস্বাদন পাইবে। এই বিজ্ঞানের যুগ অনেকের মধ্যেই অবসাদ আনিয়া দিয়াছে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যেসব যুগের মধ্যে দিয়া আসিয়াছি সেই সব দিকে সকরুণ সতৃষ্ণ নেত্রে চাহিয়া থাকা কখনই কল্যাণময় নয়। আসল কথা আমার তো মনে হয় অতীত কোন যুগেই এযুগের অপেক্ষা মহত্তর ছিল

না। আমাদের বুঝিবার ভ্রমে অতীত নয়নরঞ্জন দেখায় কিন্তু বাস্তবিক যাহারা সেই অতীতে বর্তমান ছিল তাহারা কিরূপ ছিল কে জানে। "Everything looks beautiful through the hazy distance of time." আসত কথা হইতেছে এই। আকাশের ঐ তারাটি জ্বালাময়ী পিণ্ডমাত্র—অথচ আমাদের এই পৃথিবীতে স্নিগ্ধ আলোক খণ্ড বলিয়া মনে হইতেছে। এর পূর্বের কোন যুগে মানুষের গৃহ অধিক নিরাপদ, পথঘাট অধিক সুগম, জ্ঞান আদান-প্রদানের অধিক সুবিধা ও বিজাতীয়তা ভাব বর্জিত, মানুষে মানুষে অধিকতর আত্মীয়তা, স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধের মধ্যে অধিকতর ঋজুতা এবং স্বাভাবিকতা এবং ধর্মবাদের মধ্যে অধিকতর উদারতা কখনো ছিল বলিয়া বোধ হয় না। মানুষের এই আশ্চর্যরকম সংখ্যাধিক্যের যুগে যে মানুষ কিরূপ শৃঙ্খলা ও ধৈর্যের মধ্যে চালাইয়া যাইতেছে তাহা প্রকৃতই আশ্চর্য। সকলের উপরে যায় মানুষের অকল্যাণ দূর করিবার ইচ্ছা—যাহার একটা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক "League of Notions" বা জাতি সংঘ। আজ অনেকে অশ্রদ্ধায় মুখ ফিরাইতেছে—তা ফিরাক, কিন্তু সফল হইলে একদিন এই সংস্থানে জগতের বর্তমান দুঃখের শতকরা ৫০ ভাগ কমাইয়া দিবে।

॥ ৩ ॥

রাঘোপুর

৬।৪।২৭

মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ ছাড়িয়া কয়েকমাস এখানে রয়েছি, রাজবংশের দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের জমিদারিতে। এঁদের অভিধা "বাবুয়ান"। আমার কাজ ছেলে পড়ানো এবং স্টেটের ইংরাজী দপ্তরটার মোটামুটি চার্জে থাকা। হাল্কা আর বেশ খাতিরের চাকরি। ডেকে নিয়েছেন নিজে কর্তাই। লাগছে মন্দ না, তবে নিতান্তই পাড়াগাঁ, এই যা।

বাবুসাহেবের মায়ের ৭ম মাসিক শ্রাদ্ধ আগামী ৯ তারিখে। লোকটা একটা মহাযজ্ঞ করিতেছে। দেশ বিদেশ হইতে সর্বসুদ্ধ প্রায় ৫০।৫৫ জন পণ্ডিত আসিতেছে। আজ আসিয়া পরিল ৩ জন গোয়ালিয়রের অবসর-প্রাপ্ত রাজ পণ্ডিত দক্ষিণীরাওজী শাস্ত্রী ভামন পাগা। পণ্ডিতজি কাল রাত্রে সাকরিতে আসিয়া পহুঁছিয়াছিলেন। আজ একটা গোরুর গাড়িতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে একটা চাকর এবং নিজের পুত্র। ৮০ বৎসর বয়স

হইবে। নিজে বেঁটে গোছের মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, বাঁদিকে পেটে একটা আব। পূজাতে মদ ব্যবহার করেন—অবশ্য গোপনে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বাঙ্গালোরের মহামহোপাধ্যায় শিবশঙ্কর শাস্ত্রী। লোকটি একটি "চরিত্র"। খুব কেতা-দুরস্ত সন্ন্যাসী। ছাপান নিজের ফটো তোলা কাগজে পত্র লেখে; সুবিধা পাইলেই নিজের কীর্তির বিবরণ আওড়াইয়া যায়—এমন কি সে সময়ে পরকে একটা কথা বলিবার সুবিধা না দিয়াও—অথচ কথায় কথায় গীতা আওড়াইয়া বলে—"আরে ছ্যাঃ, আমি কে, করছেন তো সেই তিনি।" আসিয়াই আমার ছাত্র "বাচ্চার" জন্য একটা রক্ষা কবচের জন্য লাগিয়াছে। খায় বেলপাতা থেঁত করিয়া আর দুধ। সন্ধ্যার সময় পূজায় বসিল—তাহা দেখিবার জন্য এবং প্রসাদ পাইবার জন্য সবাইকে নিমন্ত্রণ করিল। লোকটা যেন মতলুবে বলিয়া ঠেকিতেছে।

আর একজন আসিয়াছে—লক্ষ্মীপুরম্ শ্রীনিবাসাচার্য—মাইসুরের। এ আবার সঙ্গে বৃদ্ধা ভগ্নী আনিয়াছে। বেশ শান্ত শিষ্ট লোকটি। মোটের উপর এদের সকলকেই শান্ত শিষ্ট দেখায়; তাদের একটা কারণ অবশ্য এই যে ওদের ভাষা এখানে চলে না বলিয়া প্রায় সর্বদাই মৌন থাকিতে হয়, উহাতে দেখায় বেজায় সাত্ত্বিক গোছের; অবশ্য ইহারা সবাই যে প্রকৃতপক্ষেও বেশ সাত্ত্বিক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখানে আমাদের বাঙলা পণ্ডিতরা অনেকটা খেলো হইয়া পড়েন; কতকটা তাঁহাদের চেহারার অভাবে, কতকটা ভড়ং-এর অভাবে এবং কতকটা কতকটা প্রকৃত সাত্ত্বিকতার অভাবেও বটে।

বাঙলী পণ্ডিতেরা নামিলেন ৮ তারিখে—একেবারে হুড়মুড় করিয়া যাহাকে বলে। পণ্ডিত ভিন্ন অন্য প্রকারের অভ্যাগতও ছিলেন, যেমন—ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ডাক্তার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডাক্তার বিনয়তোষ ভট্টাচার্য (হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র)—এই নূতন-ফোটা ডাক্তারটি চমৎকার লোক। বরোদার স্টেট লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ, বাবুসাহেব বলে ৫০০।৬০০ টাকা তনখা পায়। বয়স ২৯।৩০ হবে—বেশ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ডাগর ডাগর চোখ—কথাবার্তা চালচলন খুব দ্রুত এবং ধী-ব্যঞ্জক—এদিকে গর্বলেশহীন, মাটির মানুষ, স্বাস্থ্যবিষয়ক আইন কানুন ঘাঁটাঘাঁটি করার একটা বাতিক আছে—এটা নাকি তার নূতন উপদ্রব জুটিয়াছে, আগে ছিল না। আমি তো এটা কলিকাতার ট্রেডমার্ক বলিয়া ধরিয়া থাকি।...বাবুসাহেব অত্যন্ত ভালবাসেন, নিজের সঙ্গে এক গদিতে বসান... বলেন লোকে যদি ছেলে কামনা করেন তো এই রকম, ইত্যাদি। তা বাবুসাহেবকে ভালোই বলিতে হয়। লোকটি খুবই চমৎকার...সমস্ত পরিচয়ের

মধ্যে এক জায়গায় একটা সামান্য চোট পাইয়াছিলাম—বিল দেওয়ার সময় একটু সা-মা-ন্য লোভের চিহ্ন সূচিত হইয়াছিল। তা সে লোকটির সম্বন্ধে আর একটু না জানিয়া অভিমত দেওয়া নিরাপদ নহে।

ডাক্তার সর্বাধিকারীর মধ্যে বেশ খানিকটা মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। প্রথমে স্টেশনে, গাড়ি কম ছিল বলিয়া অনেকগুলি পণ্ডিত প্রথম ঝোঁকে রওয়ানা হইতে পারিল না। আমি একটা মোটরে ˮবাধিকারীর জন্য একটু জায়গা করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিবার চেষ্টা করিলা ˮ. কিন্তু ভদ্রলোক গেলেন না। তিন চার খেপে যখন অন্যান্য পণ্ডিত' ও তাহাদের শিষ্যেরা চলিয়া গেলে তখন তিনি শেষ ক্ষেপে কয়েকজন পণ্ডিতকে লইয়া রওয়ানা হইলেন। ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের লইয়া একটা গাছতলায় কম্বল বিছাইয়া বসিয়া গল্প-সল্প করিতে লাগিলেন। বরাবর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি সন্তুষ্টই ছিলেন ; তাহারা যেমন সেবার দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, তিনি তেমনি মধুব ব্যবহারের দ্বারা তাহার প্রতিদান দিয়া আসিয়াছিলেন।···আমি বলিলাম আপনাকে শিমলায় মহারাজের বাড়িতে দেখার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তিনি বলিলেন —Yes. I remembered you as soon as I saw you here ; but I could not be so rudeas to ask—বলিযা হাসিতে লাগিলেন। ইহার পর দুই একবার কাজের ভীড়ের ফাঁকে গিয়া দেখা করিয়াছি। তাঁহার মিষ্টি সম্ভাষণে শরীরটি স্নিগ্ধ করিয়া দিয়াছে।

একটু ইংরাজীতে কথা বলিতে ভালবাসেন, fluent বক্তা নন। নাদুস-নুদুস চেহারা দেখিয়া এবং মন্থর ইংরাজী শুনিয়া সেই সেকেলে অফিসের বড বাবুর কথা মনে হয়। কথাবার্তায় খানিকটা patronising টোন তা এমনকি বড়সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তাতেও—অবশ্য প্রচুর বিনয়ের সাহচর্যবশতঃ মোটেই রূঢ় কিম্বা বেমানান ঠেকে না।···শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়ে দ্বারভাঙার মহাবাজও এসেছেন। মহারাজও ডাকেন নাই ; তিনিও ওপরপডা হইয়া দেখা করেন নাই।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শ্যামবর্ণ, সুখের ঘরের বাঙালীর মতো বয়স সত্ত্বেও হৃষ্টপুষ্ট। একটু কাল, বাঁদিকটা মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে রাখেন। অল্প এবং মৃদুভাষী লোকটি। বিদ্যা এবং মানসিক উৎকর্ষের বেশ গভীরতা আছে বলিয়া ধারণা হয়। ১০ তারিখে সর্বাধিকারী, তিনি, বিনয় এবং বালকৃষ্ণ ঘোড়দৌড় এবং সতীপোখরা দুটো দীঘি দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে বিদ্যাপতি সম্বন্ধীয় অনেক গবেষণা-মূলক তত্ত্ব বলিলেন। একটা কথা এই যে, বিদ্যাপতি লছিমা দেবী সংক্রান্ত যে

একটা অপবাদ আছে তাহা তাঁহার মতে অমূলক। বলিলেন—লছিমা দেবী ভিন্ন আরও অনেকানেক স্ত্রীলোকের নামে এরূপভাবে ভণিতা লেখা গান পাওয়া গেছে—তাঁহার অনুমান সে-সময়ে অনেকে ফরমাইস করিয়া নিজেদের স্ত্রীর নামে এরূপ গান বিদ্যাপতির দ্বারা বানাইয়া লইত…ইত্যাদি।…সতী পুকুরে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল—আমরা উপরে কথাবার্তা করিতেছিলাম, তিনি নামিয়া গিয়া মাথায় জল দিয়া আসিলেন—তীর্থ সলিল রূপে, শুষ্ক প্রত্নতাত্ত্বিক নয়। দেখিলাম দেশকালের গণ্ডি ডিঙাইয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী পিছাইয়া যাইবার ক্ষমতা এবং ভাবুকতা আছে।

সর্বসমেত প্রায় ৬০ জনকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রায় ৪৭ জন লোক আসিয়াছিল। দেউরির দক্ষিণ দিকের গাছিটা (আমবাগান) পণ্ডিত ও তাঁহাদের শিষ্যাদিতে ভরিয়া গিয়াছিল। তাঁহাদের জন্য কলিকাতা বারাণসী হইতে নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার আনা হইয়াছিল।

লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম বাঙালী পণ্ডিতদিগের সংখ্যার আধিক্য হইলেও, অন্ততঃ বাহ্যতঃ একটা impression create করিবার ক্ষমতা অল্পই। মহামহোপাধ্যায় কামাক্ষ্যানাথ তর্কবাগীশ হইতে সেই নেহাত মামুলি মহামহোপাধ্যায় পর্যন্ত সকলেই প্রথমতঃ সংস্কৃতে কথাবার্তা করায় একেবারেই অপারগ। ওদিকে দ্রাবিড়ী, মারাঠি ও রাজপুতানার দরবার পণ্ডিতরা অনর্গল, জলদগম্ভীর স্বরে সংস্কৃত বলিয়া যাইতেছে। বাঙালীদের এই দারুণ দৈন্যের কথা লইয়া অনেক চর্চা হইল মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সহিত। তিনি শেষ পর্যন্ত কলিকাতা সংস্কৃত Council-এ কথাটা তুলিবার চেষ্টা করিবেন বলিলেন।

॥ ৪ ॥

কলিকাতা

৩০।১২।৩৪

পাণ্ডুলে হেডমাস্টারির পর কমাস থেকে আমার চলছে মহারাজার ভাগ্নে কানহাইয়াজীর গৃহশিক্ষকতা। মহারাজ নিজেই ডাকিয়া লন। ভালো কাজ। তবে রাজবাড়ির একটি চঞ্চলমতি ছোট ছেলেকে সামলাইয়া রাখা, ফুরসতের একেবারে অভাব। রবিবার। কানহাইয়াজীকে লইয়া কুমারসাহেব পোলো দেখিতে গেলেন। আমি রবিবারটাকে আরও মুক্তভাবে পাইলাম। আমার এই স্বাধীনতাটাকে যে ‘কি করিব কোথায় রাখিব’ যেন ঠিক করিয়া উঠিতে

পারিলাম না। সকাল হইতে ইচ্ছা হইতেছিল যে বাসে কিম্বা রেলগাড়িতে করিয়া খুব দূরে চলিয়া যাই—যেখানে দেশটা নিবিড় ভাবে বাংলা দেশ। বাঙ্গলার স্নিগ্ধ জীবনের খানিকটা আস্বাদ লইয়া আসি। একবার মনে হইল চাতরায় যাই। সন্ধ্যায় আবছায়া-আবছায়ায় ওর পথঘাটগুলা, না বাড়িগুলা, ডোবাপুকুর, গন্দার ঘাট, ছিদাম ময়রার দোকান—সব দেখিয়া আসি। অনুভব করিয়াও ছিলাম—মনটা গিয়া পড়িয়াছে--ঘুরিতেছে—সেঁতো জায়গার অলিগলিতে, ভাঙা নড়ি, বুড়ো শিবের মন্দির—বহু দিবসের সেইসব পরিচিত জায়গায় শৈশবের কালজীর্ণ রোম্যান্সগুলো খুঁজিয়া নড়াইতেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক যেমনভাবে যুগান্তরের কাহিনী অনুসন্ধান করিয়া ফেরে—একটা ভগ্ন প্রস্তরে, একটা ভাঙা কলসের কানায়, একটা খেলনার টুকরায়।···

পোলোতে জয়পুর—গ্ল্যাডিয়েটর্সের (gladiators) খেলায় জয়পুর জিতিল ৫-৪ গোলে। পরে আর একটা খেলা ছিল, কিন্তু আমি আর দাঁড়াইলাম না। আনন্দটুকু মনে ভরিয়া লইয়া—খিদিরপুরের দিকে পায়ে হাঁটিয়া চলিলাম। একবার সিনেমার কথা মনে হইল—ছাত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া একটা দেখিলে কেমন হয়? কিন্তু আমায় বাঙলা টানিতেছিল। সময়ের অভাবে আর বেশীদূর যাওয়া সম্ভব নয়। তবুও খানিকটা বাইরে যাইতেই হইবে।

পুল পার হইয়া একটা খাবারের দোকানে ঢুকিলাম। বৃদ্ধ বাঙালী দোকানি একলা সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না এবং সেকথা বেশ মোলায়েম করিয়া বলিবার বালাইও নাই দেখিলাম। অর্থাৎ যাকে দিচ্ছি তাকে ছেড়ে তোমার দিকে দৌড়াই কি করে বাপু?—ভাবটা (এবং ভাষাটাও অনেকটা) এই রূপ। লাগিতেছিল ভাল কিন্তু সময়াভাবে অন্য দোকানে গিয়া একটু জলযোগ করিয়া লইলাম।

মেটিয়াবুরুজ। ওই দিকটা দেখি নাই, যদিও আগ্রহটা তেমন প্রবল ছিল না, কারণ মুসলমান প্রাধান্যের জন্য, বিশেষ করিয়া পশ্চিমা মুসলমানদের জন্য ওদিকে অভিলিপ্সিত বস্তু পাইব না। তবুও···। বাসে করিয়া চলিলাম। টিকিট যখন শক্তিহীন হইয়া পড়িল, কনডাকটার জানাইয়া দিল—আর যাওয়া যাইবে না।

অনেকটা ভেতরে গেছি। পশ্চিমা মুসলমানদের এলাকা ছাড়াইয়া বাঙলাদেশ ; সরু রাস্তা শান্ত জীবন—এক জায়গায় নরম চেহারার একটা মেয়ে একটা রাস্তার বাঁকে দাঁড়াইয়া আছে—মুসলমানের মেয়ে। লুঙ্গীতে লুঙ্গীতে

এতক্ষণ যেন চক্ষুটাকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল—কেমন একটা অস্বস্তিকর অনাত্মীয়তার ভাবে মনটা ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল, এই মেয়েটিকে দেখিয়া তবু যেন একটি তৃপ্তি পাইলাম। যাক্, এর গায়ে তবু বিসদৃশ আরবী ছাপ নাই।

বাস হইতে নামিয়া পাশেই ফিরতি বাস পাওয়া গেল। ঘোরাঘুরির স্পৃহা আর না থাকায় ফিরিলাম।

ব্রিজ হইতে জোরে হাঁটিয়া তক্তাঘাট। ঠিক সময়ে স্টীমার পাওয়া গেল। পায়ের প্রতি করুণাপরবশ হইলে আবার তাহাকে এতখানিটা পথ হাঁটাইয়া দয়ার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

শিবপুর পারুলের বাড়ি। অনেকদিন এরকম তৃপ্তি পাই নাই। পারিবারিক জীবনের একটা মিষ্ট স্বাদ যেন জীভে জড়াইয়া যাইতে লাগিল। মুড়ি-মুড়কি আহার ও গল্প গুজব করিয়া ফিরিলাম। খিদিরপুর মেটিয়াবুরুজের পশ্চিম ভ্রমণের পর শিবপুর বড় মিষ্ট লাগিতেছিল। সমস্ত মাটি মাড়াইয়া জায়গাটার একটু একটু করিয়া স্বাদ লইতে লইতে ট্রামে আসিয়া উঠিলাম। বাস নয়।

ইচ্ছা হইল হাওড়া স্টেশনটায় ঘুরিতে হইবে। আগে যেমন ঘুরিতাম, অহেতুক ভাবে। কোথায় কোন যাত্রী পরিবার গাড়ির অপেক্ষায় বসিয়া আছে, পোঁটলা-পুঁটলি কাছে লইয়া, বোধহয় স্ত্রী—আধা ঘোমটা-টানা—বোধহয় মেয়ে সপ্রতিভ কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি—বেশ লাগে তাহাদের দেখিতে, তাহাদের সম্মুখের পথ—আমার অজানা হইলেও—আমার অজানা বলিয়াই আমায়ও টানে। ছোট ; বাড়ি, সেখানে কাহারা সব পথ চাহিয়া আছে—এদের যাত্রার কথা লইয়া জল্পনা করিতেছে···ইহারা যেন পহুঁছিল—একটি আনন্দ-কাকলি উঠিল···আমি সঙ্গে আছি···এরা আমার নয় ; কিন্তু এদের এই বিরহজড়িত আনন্দটুকু আমার বড়ই নিজস্ব···এর লোভেই আমি নিরুদ্দেশের পাড়ি জমাইয়াছি।

হাওড়া স্টেশনে ঘুরিয়া স্বরোর দোকানে গিয়া উঠিলাম। বড় মামার সঙ্গে দেখা। আলুর দম আর একটা কেক আহার করিয়া ট্রামে উঠিলাম। মোটে সাড়ে আটটা। এখন বাসায় ফেরা হইবে না। সময় আমার, সম্পূর্ণ আমার। আরও খানিকটা গ্রহণ করি কলিকাতাকে।

টিকিট কাটাইলাম এস্‌প্ল্যানেড পর্যন্ত। নামিলাম। শেড্‌টায় খানিকটা পায়চারি অযথা। একটি ছোট বাঙালীর ছেলে একটা ঝুড়িতে করিয়া পান বিক্রী করিতেছিল। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, লাবণ্য ভরা মুখখানি···কাপড়-

চোপড় খদ্দর···পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। লোক ধরিয়া ধরিয়া বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে—সফল হইতেছে, নিরাশ হইতেছে কিন্তু উভয়েই উৎসাহ। ডাকিয়া পান লইলাম। খুব মিষ্টি কথা। "খুব ভাল পান, খেয়ে দেখুন না হয়। ···সিগারেট নেবেন ?"

এক পয়সায় তুটো সিগারেট দিল। বলিলাম—"আমায় একটা দাও।"—"আধলা নেই বাবু।" বলিয়া মিনতির স্বরে মুখের দিকে চাহিল। বুঝিলাম এটুকু প্রবঞ্চনা। বলিলও সেই রকম মিনতি মাখা নরম স্বরে—"আমি গরীব, আমার বিক্রী হবে বাবু।" আমি লইলাম। তারপর একটা ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—"নাও, এই একটা, আমার পকেটে ভেঙে যাচ্ছে···থাক্ তোমায় আধলা দিতে হবে না···পকেটে ভেঙে গেলে কি করব আমি ?"

ছেলেটা একটু অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া লইল। একটা সিগারেটের বাক্স কুড়াইয়া পরিষ্কার করিতেছিল, আমি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছি, আসিয়া সেই রকম লজ্জা জড়িত মিনতির সহিত দাঁড়াইল—সিগারেট রাংতায় জড়াইয়া আমার দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল—"না, নিন বাবু, নিন···"

এত মিষ্ট লাগিল। সিনেমায় গেলে কলিকাতা আমার মধ্যে কি এমন রমণীয় কিছু দিতে পারিত ?

একটি বৃদ্ধ বাঙালী মুসলমান ভিখারী। অন্তরের নবাবী তাহার মনের জানালায় আসিয়া বসিল। ভিক্ষালব্ধ একটি পয়সা দিয়া এক পয়সার পান কিনিল। সঙ্গে ছোট একটি ছেলে—কালো, অপরিষ্কার, অন্যের গায়ের মাপের তৈরী শতছিন্ন একটা কোট গায়ে—কিন্তু খুব স্ফূর্ত অর্থাৎ তাহার কালো রং, ময়লা কোট ভেতরটায় স্পর্শ করিতে পারে নাই।

একটু হাসিয়া আলাপ জমাইলাম। "বাড়ি কোথায় ?"

"জান কৃষ্টনগর" না কি একটা বলিল, মনে পড়িতেছে না। পানটা মুঠোর মধ্যে লইয়া উপরে হাত তুলিয়া আনন্দের মৃদু হাস্যের সহিত বলিল—"আল্লা দিলেন বাবু।"

আমি যে আজই সন্ধ্যায় পোশাকের, জীবনপ্রণালীর বিভিন্নতার জন্য মুসলমানের সঙ্গে একটা অনাত্মীয়তা বোধ করিতেছিলাম, সেটা যেন এক মুহূর্তে কাটিয়া গেল।—হ্যাঁ, আল্লাই দিলেন বটে, কতটুকুকে যে কতবড় করে দিতে পারা যায় তা এক তিনিই জানেন। আজ আমার সিনেমায় যাবার কথা ছিল—ঠিক সিনেমাতেও নয়, কলকাতার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কি তা খুঁজে দেখবার।

তিনি এসপ্ল্যানেডের এই Shade-এর মধ্যে আমার মনের সব চেয়ে ভাল খোরাক যে সঞ্চিত করে রেখেছিলেন তা কে জানত ?

জিজ্ঞাসা করলাম—"রোজা করেছ ?"

ছোট ছেলেটা উত্তর দিল—"হ্যাঁ করে।"

পকেটে একটা কমলালেবু ছিল, একটা পয়সা সঙ্গে দিয়ে বললাম—"এই নাও, পয়সাটা দিয়ে কিছু কিনে খেও।"

ঠিক দান করিলাম না। আমার যে একটা মানুষের সঙ্গে অনাত্মীয়তার ভাব সন্ধ্যার সময় গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল, সেটাকে বিদায় করিয়া যেন আচার-মুক্ত ধর্মমুক্ত বিশ্বপিতার সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহার আর একটি সন্তানকে মহামুক্তির মধ্যে অন্তরে গ্রহণ করিলাম।

॥ ৫ ॥

পাটনা

২২।৪।৪২

আজ সকালে 'নীলাঙ্গুরীয়র' শেষ অধ্যায় লিখিয়া প্রবাসীতে পাঠাইয়া দিলাম।

আশ্বিনে আশ্বিনে এক বৎসর, তাহার পর বৈশাখ চলিয়াছে—সাতমাস। এই দীর্ঘদিন ধরিয়া নিজের সৃষ্টির কতকগুলি চরিত্র লইয়া নিবিড়ভাবে মাতিয়া ছিলাম—মাজা-ঘষা, নিত্য চিন্তা করা, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা। কেমন একটা কষ্ট হইতেছিল শেষ অধ্যায়টি লিখিয়া পাঠাইতে। চোখের জল রুধিতে পারি নাই, অথচ লিখিবার সময় বোধহয় অতটা অভিভূত হই নাই। আরও মাস দু-এক বোধহয় প্রবাসীতে চলিবে, যদি বাধা না পড়ে ; জিনিসটাকে বিদায় দিয়া এইটুকু সান্ত্বনা অবশিষ্ট রহিয়াছে মাত্র।

হোক নিজের সৃষ্টি মাত্র, কল্পনা, তবুও মীরা-সতু মনটাকে আলোকলতার মত যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়াছে। কল্পনারও এত মোহ। আমরা কত বেশি বাঁচিয়া থাকি মিথ্যার মধ্যে—সুমিষ্ট মিথ্যার মধ্যে। মনে হইতেছে সত্যই যেন মীরার সঙ্গে আশা-নিরাশায় বহুদিন কাটাইয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছি। মনে হইতেছে সতুর প্রতি বড় অন্যায় করিলাম। তরুকে যেন হারাইয়াছি। অপর্ণাদেবীর ওপর শ্রদ্ধাটা—আশা ছিল যে একদিন 'মা' বলিয়া ডাকিবার অধিকারে সার্থক হইয়া উঠিবে—যেন মস্তবড় একটা আশাভঙ্গ হইল।

ছোট গল্পতে এরকমটা হইবার অবসর পায় না সময়ের অভাবে। ছোট গল্প যেন একদিনের প্রবাস, খুব ঘনীভূত ভাবে একটা নূতন জায়গার আবেষ্ঠনী মনের মধ্যে পাওয়া, ছেড়ে যেতে একটু বেদনা, তারপর একরকম বিস্মৃতি। বড় উপন্যাস দেখিতেছি যে শততন্তু দিয়া মনটাকে জড়াইয়া থাকে।

লোকে কি ভাবে লইবে জানি না তবে আমি তৃপ্তি পাইয়াছি কতকটা। সমাজে অম্বুরীকে পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু নিজের সৃষ্টির মধ্যে তাকে আমি খুব নিবিড়ভাবেই পাইয়াছি। স্নেহশীলা বন্ধুপত্নী। ভাজই মস্তবড় একটা সুমিষ্ট জিনিস বাঙালী পরিবারে, অম্বুরী অনিলের সঙ্গে আমার বয়সের প্রভেদের জন্য খানিকটা ভাজ, খানিকটা বন্ধুপত্নী হইয়া আমার কাছে বড় মধুর হইয়া উঠিয়াছিল। অম্বুরীকে কি চিনিবে সবাই? অথবা আমার মনে যে অম্বুরী ছিল বাহিরে তাহাকে পারিয়াছি কি প্রকাশ করিতে?

মনে হইতেছে সাঁতরায় যেন সব রহিয়াছে—সদুর যাওয়ার পর একটু বিষণ্ণ গতিতে অনিলের সংসার দিনের পর দিনের মধ্যে দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। শুধু আমি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। মনে হইতেছে নিশীথ-মীরার কথা। মীরা কি করিয়া কাটাইবে? আমি যেন পাণ্ডুলের বৈচিত্র্যহীন প্রবাস জীবন দীর্ঘ নিরানন্দ দিনের মধ্যে দিয়া কাটাইয়া চলিয়াছি। চারিদিক দিয়া কি যেন একটা হইয়া গেল আমার প্রথম যৌবনে।

নীলাঙ্গুরীয় ছিল নিজের যেন একটি কন্যা। সে আজ আমার নিকট হইতে বিদায় লইল। মনটা—যতক্ষণ অন্যমনস্ক না থাকি, যেন বেশ একটু ভারাক্রান্ত আজ। এ এক রকম নূতন অভিজ্ঞতা।

॥ ৬ ॥

২৭শে মার্চ, ১৯৫০

কাল দুপুরে এখানে এসেছি। মীনার দুটি ছেলের পৈতা। বেশ লাগে মীনাটাকে, অত ছোট অথচ অত গিন্নি। মামার বাড়িতে—অর্থাৎ ওর বাপের বাড়িতে—তবুও একরকম দেখায় বয়সের সঙ্গে মানানসই, কিন্তু এখানে ওর নিজের সংসারে বয়স ওর গিন্নিত্বর সঙ্গে যেন পাল্লাই দিয়ে উঠতে পারে না। ওদিকে শ্বশুরের তাগিদ করো, এদিকে ছেলে; ঝিকে করো হুকুম, ওদিকে ক্ষেতের কিষাণ মা বলে এসে দাঁড়াল; খিড়কির ধারে গরুগুলো নালিস লাগিয়েছে, নিজে না একবার দেখে এলে ওদের যায় না নালিস।...দাদা

এসেছে, জেলে ডাকিয়ে জাল ফেলতে বলা হয়েছিল, গুটানো জাল উঠানের মাঝখানে নামিয়ে বলল—"একবার সামনে আসতে হবে মা, এই পড়ল, মাছ আর কোথায় ?···যা নিত্যি কুটুম—নিত্যি কুটুম।"

মীনা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

"মুয়ে আগুন! দেখছ মেজদা, কি সুখে থাকা এখানে ?—এই হল এদের মুখের বুলি। কী, না, জাল ফেলে একটু উবগার করেছেন!···না, কারুর এসে কাজ কি, তোমরা সব আলো করে থাক চারিদিকে, তাইতেই মার পুরুষার্থ!···"

সেই মীনা! এ অন্নপূর্ণা ছেলেবেলায় কি ছিল যেন ভাবতেই মাথা গুলিয়ে যায়।

গিয়েছিলাম পুরুলিয়ার সভাপতিত্ব করতে; আমি, নরেনদা, তাঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবী। ফিরলাম একলা, ফেরবার পথে চুঁচুড়াতে নেমেছি কাল সকালে। নেমেই চক্ষুস্থির! ওদিক থেকে ডেলী প্যাসেঞ্জার বোঝাই করে ট্যাক্সি আসে, তার একটাও আসেনি।···"কারণটা কি মশাই? আমার সেই যেতে হবে গোসাই-মালাপাড়া।—দশ মাইলের ধাক্কা, এখন উপায় ?" "একটু অপেক্ষা করুন, আসবেই; কাল রাত্তিরে বেশ এক পসলা জল হয়ে গেল কিনা—মেটে রাস্তা···অবিশ্যি এমৎ অবস্থায় আসেও না কখনো কখনো, কাদাতেই আটকে গেল মোটর, কিম্বা গতিক দেখে ফিরেও গেল এমনও হয়েছে···তবে, আসবেই, ডেলী প্যাসেঞ্জারদের নিয়ে আসে কিনা—না এসে উপায় কি ?··· অবিশ্যি নেতান্তই যদি বাধ্য হয়ে ফিরে না যেতে হয়···"

এরকম গাঁটে গাঁটে আত্মবিরুদ্ধ অভিমত শোনার উৎসাহ নেই। সুটকেস আর হোল্ডঅলে বাঁধা বিছানা ওয়েটিং হলের বেঞ্চে রেখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলাম।

দুটো রিকশা; জিজ্ঞেস করলাম—"ভাড়া যাবে ?"

"আজ্ঞে, ঐ তো কাজ, তবে আর ঘুরে মরছি কেন ?"

মনে পড়ল এ আমাদের বেহার নয়, একটি কথা বেফাঁস হলে সঙ্গে সঙ্গেই তদুপযুক্ত উত্তর, নগদ।

বললাম—"গোঁসাই-মালপাড়া; কত নেবে ?"

"গোঁসাই-মালপাড়া যাবে না রিকশা, বিষ্টিতে পথ খারাপ করে দিয়েছে, সৈঁইয়া পজ্জন্ত পৌছে দোব, পাঁচ টাকা লাগবে।"

"সেখান থেকে মালপাড়া ?"

"তা মাইল তিন।"

যেমন করে কুঁতিয়ে বললে, সন্দেহ হল হাতে রেখে বলছে, ওদিককার দূরত্বটা কমিয়ে।

জিজ্ঞেস করলাম—"তারপর? আমার মোট আছে দুটো।"

"মুটে পাবেন, গোরুর গাড়িও পেতে পারেন।"

"অত দিতে পারব না, আদ্দেক রাস্তা তো ঐদিকেই রইল পড়ে।"

চারটাকা পর্যন্ত একজন নামল।

ওদেরই জিজ্ঞেস করলাম—"মোটর আসবার কোন আশা নেই?"

"আজ্ঞে, আশা করলেই আশা আছে, না করবার তো কোন আইন নেই। তবে এলে ঘণ্টাখানেক আগেই এসে যেত।"

সামনে আরও অনেকগুলি রিকশা আছে, খানিকটা দূরে, যেখানে স্টেশনের এই রাস্তাটুকু বড রাস্তায় গিয়ে মিলেছে। কিন্তু মালপত্র ছেড়ে অত দূর যেতে সাহস হচ্ছে না। তবু পেছন দিকে মাঝে মাঝে চাইতে চাইতে এগুলাম; সাহসও বাডতে লাগল। তাবপর আরও খানিকটা এগুতে না এগুতে তুমুল ঘর্ঘরধ্বনি করতে করতে এক মোটর। অত জীর্ণ মোটর যে পৃথিবীর কোন অংশে এখনও খেটে খাচ্ছে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

মালপত্রের কথা ভুলে গেছি বললেও অন্যায় হয় না। গিয়ে কিন্তু শুনলাম মালপাডার ট্যাক্সি নয়।

"মালপাডারটা আসবে মশাই?"

"মনে হচ্ছিল আওয়াজ তো যেন কানে আসছে।"

কানের নিচেই এই মোটরের আওয়াজ ছাপিয়ে যে-মোটরের আওয়াজ পৌছায়, সেটা চডবার উৎসাহ না থাকলেও দেখবার কৌতূহল থাকেই। জিজ্ঞেস করলাম—"কত পেছনে মনে হল আপনাদের?"

"মাইল খানেকের মধ্যে···কি বল হে?"

"হ্যাঁ, ঐরকম···"

"আওয়াজ তো তাহলে পাবার কথা।"

"বিগডেও যায় কিনা মাঝে মাঝে; চাবুকের ওপরই চালানো তো?··· কোথায় যাবেন?"

"মালপাডা, গোঁসাইদের বাডি।"

"তা একটু অপেক্ষা করুন, এসে পডল বলে।"

একটা রিকশাই ঠিক করলাম শেষ পর্যন্ত। একটি পশ্চিমা চালক, তার

সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত রফা হল তিনটাকায়। স্টেশনে ফিরে এসে সুটকেস আর হোল্ড-অল নিয়ে যখন যাত্রা করলাম তখন আটটা হয়ে গেছে।

একবার নিশ্চিন্ত হয়ে বসে তখন ভালোই লাগতে লাগল। পুলের নিচে দিয়ে লাইন পেরিয়েই দুদিকে গভর্ণমেণ্টের কৃষি-প্রতিষ্ঠান, রাইটার্স বিল্ডিংসের কাগজপত্রের মতোই সাজানো গোছানো, দেখতে লাগে ভালো। সেটা পেরিয়ে একটা গ্রাম, তারপরেই রাস্তাটার দুধারে আরম্ভ হয়ে গেল নিবিড় জঙ্গল—আম, কাঁঠাল, জাম, আমড়া, চালদা আরও কত কি গাছ সব, নীচে দুর্ভেদ্য আগাছার ঝোপ। মাঝে মাঝে দু-একখানা করে মেটে বাড়িও আছে তার মধ্যে এক-আধটা দামে-ঢাকা পুকুর, দু-একটা গোরু, দু-পাঁচজন লোক। কেমন যেন বুকচাপ, লোকগুলোকে দেখলেও মনে হয় কি করে বেঁচে আছে এরা, আর কেনই বা আছে ; অথচ এদের দশ গজ দূরেই সভ্য জগৎ—ভারতের সবচেয়ে বড লাইন বেরিয়ে গেছে—দেশ বিদেশের সঙ্গে তার যোগ, জীবিত জগতের একটা চঞ্চল রক্তের ধমনী। একটা অবসাদ আসে মনে। অরণ্য এখানে জীবনকে জয় করে নিয়েছে, অবশ্য মানুষের জীবনকে ; আদিম অন্ধকার এখানে খানিকটা আছে আটকে, সভ্যতার পাশেই ওত পেতে বসে আছে। এ লোকগুলো সেই সব লোকের ঝডতি-পডতি যারা না খেয়ে লাখে লাখে মরল, যাদের নিয়ে ডাঃ কান্‌জরু বলে গেলেন—"Bengal is too soft" অর্থাৎ বাংলা অতিরিক্ত নরম। গভর্ণমেণ্টও এদের ঠিক সেই পরিমাণ বাঁচিয়ে রাখে যাতে "আয়ু ফুরলে"—এরা নিরুপদ্রবেই মরতে পারে।···আহা, বৈষ্ণবের পীঠস্থান বাংলাদেশ, একটা যা তা কথা ! আমি মানসকর্ণে শুনছি—রাত্রে ঐ জঙ্গলের মধ্যে ঝিঁঝির সঙ্গে সুর মিলিয়ে কোথায় উঠছে মিহি বাউলের সুর--দেহতত্ত্ব।

এদের জীবনেরই মত আমার রিকশা চলেছে ক্লিষ্ট মন্থর গতিতে, কাদা ঠেলে। রিকশাওলার সঙ্গে আলাপ চলছে, বাড়ি মজঃফরপুর জেলায়। আমারই প্রতিবেশী তাহলে। ছেলেপুলে সব সেখানেই, এখানে রোজগার করছে, মাঝে মাঝে যায়। কেমন একটা সহানুভূতি অনুভব করছি, ওকে পাওয়াতেই বাংলা আমার যেন একটু বিদেশ হয়ে গেছে, ওদিককার সুখ-দুঃখ, ক্ষেত-আবাদের গল্প করতে করতে চলেছি, কাদা বেশি দেখলে সহানুভূতিতেই নেমে যাচ্ছি—ওর বারণ সত্ত্বেও—আবার একটু শুকনো পেলে গিয়ে উঠছি। একটা সম্বন্ধের মধ্যে থেকে আর একটা সম্বন্ধ বের করে জীবনটাকে এইভাবে মাঝে মাঝে উপভোগ করতে লাগে বেশ। বাংলার এই ছায়াচ্ছন্ন নির্জন পথটুকুতে আমরা দুজনে আর ঠিক রিকশাওলা আর ভাড়াটে নয়, বিদেশাগত দুটি প্রতিবেশী ; গেঁয়ো

হিন্দীতে যে কথাটুকু বলছি বা শুনছি সেটুকুও এত মিষ্টি লাগছে আমার কানে!

হঠাৎ সামনে যেন একটা আলোর আভাস! তারপর একটা মোড ঘুরেই দুদিকে ফাঁকা মাঠ, একেবারে দিগন্তব্যাপী। বুকটা ভরে নিঃশ্বাস নিলাম টেনে, আহ্, কী আরাম! কড়া রোদ, রিকশার ছাত ভেদ করে যে তাত আসছে তাতেও আপত্তি নেই। বরাবর শুকনো রাস্তা, একটা টানা হাওয়া আছে, সর্বোপরি, অবারিত দৃষ্টির আনন্দ—ওপরে নিঃসীম আকাশ, দূরে দূরে গ্রাম, মাঠে মাঠে জীবনের চাঞ্চল্য; হঠাৎ খাঁচার দোর খুলে দিয়ে মনটাকে যেন মুক্তি দিয়ে দিলে, একেবারে ডানা ঝাপটে পড়ল বেরিয়ে। রিকসার গতি হয়েছে দ্রুত—ওর মনেও আকাশের স্পর্শ লেগেছে; আমি হয়ে গেছি নীরব, ও কি একটা গানের কলি নিয়ে আস্তে আস্তে ভাঁজতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

একটি গ্রাম এসে পড়ল; যেন মন যা খুঁজছিল তাই। ধান ক্ষেত শেষ হয়েই তরিতরকারির ক্ষেত, তারপরেই টানা গোটা দুই ডোবা, পুকুর বললেও দোষ হয় না; হাঁস সাঁতরাচ্ছে, মেয়েরা নাইছে, বাসন মাজছে, ছেলের দল জলে ঝাঁপাই ঝুরছে—বেশ একটি সুস্থ, পরিপূর্ণ জীবনের আভাস। ডোবার পাশেই পুরনো তেঁতুলগাছ, নিচের পরিষ্কার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বিরাট বিচালির গাদা সব, অত বড় কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না—খুব বড় কোন গৃহস্থের আঙিনা বলে মনে হল।···গ্রামের ভেতরে ঢুকেও প্রাণের বেশ সাড়া, যদিও একথা বলতেই হয়, নিত্য রোগজীর্ণ বাঙালীর প্রাণের যতটুকু সাড়া পাওয়া যায় ততটুকুই। এতবড একটা সমৃদ্ধ গ্রাম বেহারের ওদিকে হলে আরও ঢের বেশি গতিচঞ্চল ও শব্দ-মুখর হতই। যাই হোক, ঘুরে ঘুরে দেখি তো মাঝে মাঝে, এটুকুও যেন ক্রমে দুর্লভ হয়ে উঠছে বাংলায়; স্বাধীনতাও তো এল, কিন্তু কৈ?

সেঁইয়ায় পৌছুলাম যখন, বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। কাল বর্ষা হয়ে গেছে, পরিষ্কার আকাশ, রোদ একেবারে চনচনে। একটা তেমাথায় এসে রিকশা দাঁড়াল। একটা মাঝারি গোছের গ্রাম, তারই এটা বাজার। দু-চারখানা দোকান আর তারই মাঝামাঝি একজন পাশ-করা ডাক্তারের ডিসপেন্সারি; ঠিক মডার্ণ বলতে চুঁচুড়ার রেললাইন ছেড়ে এই যা চোখে পড়ল।

মুটে পাওয়া গেল না; লোক আছে, দোকানে বসে বিড়ি ফুঁকছে, জটলা করছে, মোট বইবার মতই, কিন্তু যাবে না, বাঙালী চরিত্রের মূলনীতিটি ধরে বসে আছে। ডাক্তারবাবুর দ্বারস্থ হলাম, চেষ্টা করলেন ভদ্রলোক, কিন্তু কোন ফল হল না। রোজগার করবে না ওরা তো কে কি

করবে ? রোজগারের পথটুকুই না হয় দেখিয়ে দিতে পারে। **You can take a horse to the pond, but cannot make it drink**! ঘোড়াটাকে পুকুরের ধারে না হয় নিয়ে গেলে, কিন্তু জল খাওয়া না-খাওয়া সে তো তারই মর্জি। গোরুর গাড়ি যেতে চাইল, কিন্তু ভাড়া চায় এইটুকুর জন্যে ছ'টাকা। "আমি বাপু এই প্রায় সাত আট মাইল এলাম তিনটাকায়, তাও রিকশা, মানুষে ঠেলে নিয়ে এসেছে আমিও এসেছি আরামে।"

কোন তর্ক চলে না, ওর কমে যাবে না।

ডাক্তারবাবুও বোঝালেন, হার মেনে বললেন—"ওই ব্যাপার মশাই, ওরকম একটা ভাড়া চাওয়া মানেই যাবে না ; মরবে, তবুও রোজগার করে বাঁচবার চেষ্টা করবে না।"

"কি উপায় তাহলে মশাই ?"

উপায় শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ঠিক করতে হল, সুখ-দুঃখের চিরসাথী দুখানি পা। ডাক্তারবাবু শিবুকে চেনেন, আমার ভগ্নীপতি শুনে কোন রকম সাহায্য না করতে পারায় দুঃখ করতে লাগলেন। প্রায় এগারটা, বেশি গবেষণা করবার সময়ও নেই ; নিরাশায়, দুশ্চিন্তায় মনটা তিক্ত হয়ে উঠছে ক্রমেই, এর ওপর বেলা যদি আরও এগুতে দিই তো নিজের পায়ের ওপরও আস্থা হারাতে হবে। ঠিক হল সুটকেস হোল্ড-অল ডাক্তারখানাতেই থাকবে, গিয়েই লোক পাঠিয়ে দোব।

তিন মাইল আন্দাজ পথ হওয়া উচিত ; তবুও ডাক্তারবাবুর মুখ দিয়ে কথাটা একবার বের হলে একটু সাহস পাওয়া যায় ওরই মধ্যে। জিজ্ঞেস করলাম—"কতটা পথ হবে মশাই ?"

সাহস আরও ভালো রকম গেল পাওয়া—"এই ক্রোশ খানেক…এই মাঠটুকু, তারপরেই ঐ আমবাগান—তারপরেই…"

সেই শুরু হল ডাল-ভাঙা ক্রোশ।

একেবারে ফাঁকা মাঠ ধু-ধু করছে তার মধ্যে দিয়ে মেঠে রাস্তা। একেবারে দিগন্তে যে এখানে ওখানে সবুজের রেখা, (যার একটাকে মালপাড়ার আমবাগান বলে দেখালেন ডাক্তারবাবু) তার এদিকে নিতান্ত এক আধ জায়গায় দু-একটা বিরল শাখা পত্র গাছ বা এক আধটা ঝোপ ছাড়া আর কিছু নেই। কাছে-পিঠে কোন গ্রাম নেই একেবারে, রাস্তায় লোক চলাচল একরকম নেই বললেই চলে। মাথার ওপর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে ; মাত্র একটি ক্রোশের মামলা—শুধু এই সান্ত্বনাতেই পা চালিয়ে দিলাম। যতই এগুই বুক যায়

শুকিয়ে, এরকম আঁকাবাঁকা রাস্তা কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না ; ফাঁকা মাঠের ওপর অযথা রাস্তাটাকে এ রকম হাড-গোড়ভাঙা-দ কোন কারিগর করেছেন ভেবে অস্থির হচ্ছি।···নিজের আন্দাজে যখন প্রায় আধক্রোশটাক হেঁটেছি, একজনের সঙ্গে হল দেখা, ওদিক থেকে এদিকে আসছে।

"গোঁসাই-মালপাড়া আর কতটা হবে মশাই ?"

"বেশি নয়, এসে গেলেন, আর কোশটাক—এই রাস্তাটা একটু ঘুরেই সটান···"

"এখনও ক্রোশটাক! সেঁইয়া থেকে যে এলাম এতখানি···"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, কোশটাক হবে বৈকি—হেসে-খেলে।"

এগিয়ে চললাম, একটা আশা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছি, ডাক্তারবাবুর কথাই ঠিক হবে নিশ্চয়।

সামনের একটা নীল রেখা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পৌছুতে মিনিট পনের লাগল, অর্থাৎ প্রায় মাইল খানেকের রাস্তা। প্রকাণ্ড একটি পুকুর, তার চারিদিকে বেশ বড আমবাগান, সামনেই কোন মুসলমান পীর-ফকিরের কবর একটা। জায়গাটি বড মনোরম। সামনে কিন্তু কোন গ্রাম নেই। না থাক, পেছনেই কাছাকাছি আছে নিশ্চয়। কিন্তু একটি মানুষ নেই যে জিজ্ঞেস করি। একবার মনে হল একটু জিরিয়ে নিই, কিন্তু কাছাকাছি যখন এসেই পড়েছি আর সময় নষ্ট না করে ঝোঁকের ওপর মায়া কাটিয়ে বেরিয়েই গেলাম।···রাস্তাটা এখানে উত্তর থেকে একেবারে পশ্চিমে ঘুরে গেছে (অবশ্য যদি দিগ্‌ভ্রান্ত না হয়ে গিয়ে থাকি)।

কোথায় মালপাড়া ?—কোন থৈ-ই পাওয়া যায় না যে!

প্রায় মাইল খানেক গিয়ে জিজ্ঞেস কববার লোক পাওয়া গেল। ক্ষেতে সেচের ব্যবস্থা করছে তারা, জন সাতেক আছে সব মিলিয়ে। অমন সবল, সুস্থ দীর্ঘকায় বাঙাল নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে খুব কম দেখেছি ; কালো কুচকুচে রং, ঘামে যেন পালিশ হয়ে গেছে সমস্ত শরীর কিন্তু মুখে একটু ক্লান্তি বা অবসাদ নেই। দাঁড়িয়ে দেখবার মত, দুঃখ যে দেখবার অবসরই নেই।

"ওহে, গোঁসাই মালপাড়া আর কতটা যেতে হবে ?"

"আজ্ঞে, আর তো এসে গেছেন।"

"কতটা হবে—আধ ক্রোশ ?"

একজন একটু হেসে ফেলল, যেন একটা অন্যায় আবদার ধরেছি, বলল —"আজ্ঞে তা কখনও হয়—অত কাছে ?—তা এখনও আপনাকে কোশটাক

পথ ভাঙতে হবে বৈকি।"

একটু এগিয়ে গিয়েছিলাম, ফিরে এলাম, মনের উত্তাপ খানিকটা বেরিয়ে যাওয়া দরকার, ঝগড়া করেই হোক বা যা করেই হোক, নৈলে মারা যাব।

"ওহে বাপু, এদেশে ক্রোশ কোন্ জিনিসটাকে বলে একটু বুঝিয়ে বলতে পার?—সৈঁইয়া থেকে প্রত্যেকটি লোক আমায় বলেছে ক্রোশখানেক রাস্তা। আমি প্রায় ঘণ্টা দেড়েক হল বেরিয়েছি।"

"আজ্ঞে কোশ হল কোশই—লোকের কথায় বাড়বেও না, কমবেও না। সে তো কারুর গোলাম নয়। যাবেন কোথায়?"

গন্তব্য প্রকাশ করলাম।

"ও! তা যান, এসে গেছেন।"

মাইলখানেক অতিক্রম করবার পর দ্বিতীয় লোকের দেখা। তখন কিন্তু মানুষের ওপরই একটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে। আর জিজ্ঞেস করব না।

কাটিয়ে কয়েক পা গেছি, ফিরে দাঁড়াতে হল:

"এদিককোর নোক নয় তো আপনি।"

"না, বাইরে থেকে আসছি।"

"ব্রাহ্মণ?"

"হ্যাঁ।"

"পাতঃ পেন্নাম হই। যেতে হবে কনে?"

"গোঁসাই-মালপাড়া, গোঁসাইদের বাড়ি।"—প্রতিজ্ঞা করেছি দূরত্বটা আর জিজ্ঞেস করব না।

"তা এসে পড়েছেন…"

"হ্যাঁ, ঐ ওখানে ওরা তাই বললে।"

"ঠিকই বলেছে, আর কোশটাক মেরে কেটে—রোদটা বড্ড চনচনে হয়ে উঠেছে, এই যা; কাল আবার বিষ্টিটা…"

শেষের কথাগুলো কানেও গেল না, কেননা ঘুরে তখন চলতে আরম্ভ করে দিয়েছি।…ওদের সঙ্গে শুধু ঝগড়াই করতে গিয়েছিলাম, দাঁড়ালে এর সঙ্গে বোধ হয় হাতাহাতি হয়ে যেত।

বাড়ি ঢুকতেই প্রথমে শিবুর সঙ্গে দেখা।

"মেজদা যে! একি চেহারা হয়েছে!…হেঁটেই?"

বললাম—"হ্যাঁ, সৈঁইয়া থেকে…"

"তাই বলুন! এই দুপুর রোদ্দুরে···ঝাড়া এক কোশ···"

বার-বাড়িতে পা দেবার মুখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বললাম—"আবার ও-কথা উচ্চারণ করেছ তো এই দোরগোড়া থেকেই ধুলোপায়ে ফিরে যাব বলছি।···বলি হ্যাঁ হে, এ আজব দেশে ইতর-ভদ্র সব সমান?—তোমারও ধারাপাতের বিদ্যে ঐ 'একে চন্দ্র' পর্যন্ত!"

॥ ৭ ॥

৩।৪।৫০

আজ 'প্রোগ্রেসিভ্ পিকচার্সে' 'বরযাত্রী'র অভিনেতা-অভিনেত্রী মনোনয়ন ছিল। ওঁরা যাকে কে-গুপ্ত ঠিক করেছিলেন তাকে 'গোরাচাঁদ' করতে বললাম—ছেলেটি বেশ নাদুস-নুদুস, বলেও ভাল।

বসে আছি, একটি মেয়ে এল একটি ছেলের সঙ্গে—শ্যামবর্ণ ছিপছিপে চেহারা, ফাঁপা শুকনো চুল, একটা লাল ফিতে বাঁধা—ছেলেটি ওর ভাই—চেহারা দেখেই ভেবেছিলাম—জিজ্ঞেস করেও জানলাম তাই—মেয়েটিকে 'পুটুরাণী'র পাটের জন্য ডাকা হয়েছে। ঐ ছোট কিন্তু ভাইয়ের চেয়ে স্মার্ট—প্রকৃতিটা একটু চঞ্চল—মোটামুটি সুশ্রী তবে চোখ দুটি ছোট, যদিও একটা বাহার আছে তারই মধ্যে।

একলাই ছিলাম অফিস ঘরে অমলেন্দুবাবুর (বোধ হয় রাজেন সাজবেন) নির্দেশে ভাই বোনে আমার পাশের কৌচটিতে বসল।···কৌতূহল হচ্ছিল, তার সঙ্গে একটা করুণা—এই যে এ-যুগের ট্রাজেডি সিনেমা নিয়ে। 'সোনার তরী' বলে একটা পত্রিকা পড়ছিলাম, মেয়েটি চেয়ে নিলে—এর পরে আমি ওদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম—ঢাকায় বাড়ি—দাদারা বছর দুয়েক আগে চলে এসেছে, ইন্টালিতে থাকে। বাবা মা নেই, দুই ভাই আর এই বোন—বড় ভাই মার্চেণ্ট অফিসে কাজ করে—'বাবা মা নেই' এই কথাটাই কানে লাগল বেশি করে 'আমার—নয়তো মেয়ের এই জীবন!···আবার বাপ মা থেকেও তো হচ্ছে। কী যে যুগ পড়ল—খালি অর্থ, খালি ব্যবসা।···এক এক সময় মনে হয় সব ভেঙে দিয়ে নিজের পছন্দ মত আবার ঢেলে সাজুন এই নূতন যুগের বিধাতা—নূতন-পুরাতনের এ দ্বন্দ্ব আর যেন সহ্য হয় না।···আমার কথা জিজ্ঞেস করলে—আমি কি বাছাই করবার কর্তা? বললাম—'না'—তবে? বললাম, 'বইটা আমার।' ভারী বিস্মিত আর খুশি—দুজনের মুখেই শুধু—

'দুর্দান্ত হাসি! উঃ!...মেয়েটি বললে আমি তিনবার লাইব্রেরী থেকে এনে পড়েছি। আপনার পথের পাঁচালি?' 'না'—বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ছেলেটি বললে—ওঁর 'নবসন্ন্যাস'......পড়েছি আমি লাইব্রেরী থেকে......'বরযাত্রীর' কথাতেই ফিরে আসে—এক একটা জায়গা ধরে—হাসে আর বলে, 'উঃ, দুর্দান্ত হাসি!'

বড় ভাল লাগছিল মেয়েটিকে, সপ্রতিভ, বুদ্ধিমতী অথচ একটা অপরিসীম বেদনাও ঠেলে উঠছিল—আহা, কোন্ পথে চলেছে!

ওঁরা বোধ হয় একে নেবেন না—সত্যেনবাবু বললেন চেহারা Stage suiting হবে না। পার্ট বলানোতে মেয়েটি বললে কিন্তু বড় চমৎকার। এর আগে দু-তিনটি পার্ট করেছে—সেগুলি এখনও রিলিজ হয়নি। একটির নাম বললে 'নিরক্ষর।'

সান্ধ্য আইন চলছে। ফেরবার পথে মামার বাড়ি হয়ে ফিরলাম। আজ তিন দিন থেকে বড়মামার খুবই অবস্থা খারাপ—চিৎ হয়ে একভাবে পড়ে আছেন—হাঁপানির টান চলেছে ধীরে ধীরে—বসে বসে দেখতে দেখতে মনে হয় আস্তে আস্তে শান্তি যেন ছেয়ে আসছে মামার মুখে। বড় কিন্তু কষ্ট পাচ্ছেন। আজ একটু যেন জ্ঞানের স্ফুরণ হচ্ছিল মাঝে মাঝে। গিয়ে বসতে, গায়ে হাত দিতে যেন বুঝতে পারলেন—হাত দিয়ে আমায় ধরলেন—সবচেয়ে সুন্দর দেখলাম—অর্ধচৈতনের মধ্যে মামার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল—একটু যেন একপাশ হয়ে—শিশুর যখন নূতন হাসি ফোটে সেই সময়ের হাসির মত—বেশ বোঝা যায় এই যে আমি এসে হাত বুলুচ্ছি এটা উপলব্ধি করে ভেতর থেকে যেন একটা পুলক-রোমাঞ্চ ঠেলে উঠছে—কয়েক বারই হাতটা ধরবার চেষ্টা করলেন আমার—আমিও ধরে রইলাম—চোখ দেখে মনে হয় কি বলবার চেষ্টা করছেন, পেরে উঠছেন না, মুখের মধ্যেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

কারফিউয়ের জন্যে চলে আসতে হল—এই কারফিউ অপঘাত মৃত্যুর মধ্যে এর জন্ম, যার তাণ্ডব চলল কদিন ধরে। এই হাওড়ায়...তার পাশেই এই এক মৃত্যু—একটা পরিপূর্ণ জীবনের পরে ধীরে ধীরে একটা রহস্যময় শান্তির মধ্যে তলিয়ে যাওয়া।

আজ শরীরটা ভালো নেই, দাঁতের যন্ত্রণা—মনে একরত্তি শান্তি নেই।—

দিনটাকে শেষ করে তুলসীদের বাড়ির বাইরে এসে বসলাম—কেষ্টবাবুর ছেলে সুবুকে (সুভাষ) নিয়ে একটু ঘুরলাম (অবশ্য বাইরের কারফিউ এড়িয়ে) —জীবন আবার মিষ্ট লাগছে। মনটিকে গুটিয়ে নিয়ে আবার বসলাম

চেয়ারে—ঝিরঝিরে হাওয়া—কাল পূর্ণিমা ছিল—আজ আকাশে প্রায় পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাই—আকাশটা নীলাভ—নিচের মৃত্যুর ওপর একটা বিরাট শান্তি ছেয়ে আছে কল্পনা করছি—এই বাংলা—আমি যেন ডায়মণ্ডহারবারে গঙ্গার সেই বাঁধানো তীরে বসে আছি—থাক মৃত্যু, থাক অশান্তি, আমি এখন সব থেকেই মুক্ত।

॥ ৮ ॥

১৭।৪।৫০

কালীঘাট ফলতার ছোট রেললাইনটা টানছে। পরশু গিয়েছিলাম ফলতা, ১০টা ১০ মিনিটের গাড়িতে, 'দুয়ার হতে অদূরের জন্য' কিছু কিছু নোট্‌স্‌ নিলাম—কলকাতার দক্ষিণের যা সাধারণ feature গাঢ় সবুজ, প্রচুর নারকেল গাছ—দু'পা গিয়েই গ্রাম, মাঝে মাঝে মাঠ—এখন ধানের জায়গায় তরিতরকারি দিয়েছে—জীবনের বেশ চঞ্চলতা—সবদিক দিয়েই পরিপূর্ণতার ছবি একটা।...ফলতা নিজে কিন্তু নিরাশ করলে—ভেবেছিলাম একটা বড গঞ্জ তা নয়, স্টেশনের পাশেই একটা টানা রাস্তা, দু-দিকে দোকান বাড়ি তারপরেই গঙ্গা, ব্যস ফলতা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু গঙ্গার সৌন্দর্য অপূর্ব—দুদিকের ঘন গাছপালার সবুজ রেখার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে—কলকাতার গঙ্গার প্রায় আড়াই তিনগুণ, হাওয়ায় দুলছে—খেয়া ঘাটে দু-তিনটা জলিবোট আর শানকি—তাইতেই লোকেরা পাড়ি দিলে—দেখলে ভয়ই হয়—ওপারে ধ্বজা আর কয়েকখানা গ্রামের নাম করলে মাঝি—খাবারের দোকান নেই—কয়েকখানা বিস্কুট কিনে ১টা ৫ মিনিটের গাড়িতে ফিরলাম—নিতান্ত হঠাৎই এ গাড়িটার সন্ধান পেয়ে গেছি, নৈলে চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত।

বেশ কিন্তু লাগছে। দুপুর, তবু মাঠ বেয়ে হু হু করে হাওয়া। ছোট গাড়ির মধ্যে একটা শান্ত ভাব আছে। পাশের লোকটা গল্প করছে সামনের একজন যুবার সঙ্গে—দুজনেই কলকাতায় থাকে—পরিচয় হচ্ছে—লোকটার কথা কইবার একটা ভঙ্গি আছে—বয়স ৪৫।৫০ হবে, একেবারে নিদন্ত—খুব হাসে হাত নাড়ে আর যখন 'না' বলতে চায় তখন দু'হাতের বুড়া আঙুল দুটা তুলে ধরে, একটা চতুর হাসির সঙ্গে—

দেশটার বেশিভাগই কৃষীর উপর নির্ভর।

টিকিট করেছি শিবানীপুর পর্যন্ত—ডায়মণ্ডহারবার রোড আরম্ভ এখানে,

বাস ধরব—ওখানে না নেমে পরের স্টেশন শিরাশোলে নামলাম—একটু জল খেলাম—আটখানা বিস্কুটের টান ধরেছে—যিনি টিকিট নিচ্ছলেন তাঁকে বললাম টিকিট শিবানীপুর পর্যন্ত—দেখলেন—বললেন—দশটা পয়সা দিতে হবে···তারপর আর একবার দেখে নিয়ে বললেন—ওটা নিয়ে আপনি বেরিয়েই যান—আর ও-নিয়ে 'নাড়াচাড়া' করবেন না।···দশটা পয়সার জন্যে নয়, বেশিরকম সাধু সাজবার অস্বস্তি কাটাবার জন্যেই ওঁর কথামত বেরিয়ে এলাম। একটু দূরে নতুন বাজার বসেছে—লড়াইয়ের সময়, সেইখানে গিয়ে একটা দোকানে একটু জলযোগ করলাম—পানতুয়া, রসগোল্লা—নারকেল তেলের গন্ধ···দোকানী বললে নতুন রাস্তাটা গেছে 'গুস্তে'—আর খালটা হাজীপুর—মগরাহাট পর্যন্ত যাওয়া যায়। বললে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গাম নেই এদিকে।

এসে রাস্তার ধারে দোকানের একটা বেঞ্চে বসলাম—বাসে করে এলাম আমতলা হাট—পরের বাসে শখের বাজার—সেখান থেকে ক্যালকাটা মাঠে মোহনবাগান কাষ্টামসের চ্যারিটি হকি ম্যাচটা দেখে ফিরলাম—ড্র গেল।

প্রায় মাইল পঞ্চাশের একটা চক্র দেওয়া হল।

কাল ১২টা ৪০ এর বরিশাল এক্সপ্রেসে গিয়েছিলাম বনগাঁও—এদিকটা এই প্রথম—বোধ হয় সোজা পশ্চিম পাড়ে। বনগাঁও-এর দিকে যতই যাওয়া যায়, দেশটা যেন রুক্ষ হয়ে আসে, বাড়িঘর বেশিভাগই খড়ের আর ছোট ছোট—বাস্তহারারাও এই রকম ছোট ছোট ঘর করেছে এখানে-সেখানে—Feature বদলে যাচ্ছে—দক্ষিণের মত নয়, বিরল বসতিই—নদী নেই—একটি মাত্র যা আছে তাও শুকিয়ে এসেছে—এর ওপরই গোবরডাঙা—বনগাঁয়ে পৌছুলাম তিনটার সময়—সমস্ত স্টেশনে এবং বাইরে পর্যন্ত বাস্তত্যাগীতে ভরে গেছে—অকথ্য কষ্ট—প্ল্যাটফর্মের ওপরই চিকিৎসা-ক্যাম্প ফেলা হয়েছে তাঁবুতে তাঁবুতে। একটি অচৈতন্য মেয়েকে চিৎ করে শুইয়ে মাথায় জল ঢালছে—এই দেখতে দেখতেই স্টেশনে ঢোকা। প্ল্যাটফর্মটা নতুন করে তোয়ের করবার জন্যে খোঁড়া হয়েছে, তার মধ্যে সব কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ধুকছে—কোনরকমে যাওয়া যায়। বাইরে মাড়োয়ারী রিলিফ ক্যাম্প, পাঞ্জাব এসোশিয়েসন, ভারত আর হিন্দুমহাসভার ক্যাম্প—গেঞ্জি দেবে—কিউয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে—ভিকিরি হয়ে গেল সব—যারা এদশা করলে এদের দেশ ভাগ করিয়ে—দাঙ্গা করিয়ে, তারা পুরু গালিচার ওপর শোফায় বসে হাওয়া খাচ্ছে···

একটা রিকশা করে একবার শহরের বাজারের দিক থেকে ঘুরে এলাম—

একটা দোকানে সন্দেশ খেয়ে জল খেলাম—খুব পুরনো শিরীষ গাছের এ্যাভিনিউ, একটা নদী বয়ে গেছে, নীচুপুলের ওপর দিয়ে রাস্তা শহরের মধ্যে গেছে—রিকশাওলা বাঙালী (এদিকে পশ্চিমাও প্রচুর), বললে সে পাকিস্থান থেকে এসেছে—যশোরে বাড়ি—ওদিকে কেউ মারা যায়নি, তবে এদিকে রোগে মারা গেছে—স্ত্রী বড়ছেলে···নিজের দেশের সুখের কথা বলতে লাগল। দাঙ্গা এদিকে হয়নি—তবে ঘর-টর জ্বালিয়েছে কিছু কিছু, তাইতেই বহু মুসলমান পালিয়েছে—হিন্দুরা মারেনি—তবে গরম হয়ে আছে বললে—

বিভূতিবাবুর (মুখোপাধ্যায়—**contractor** ও লেখক) খোঁজ করলাম—অল্প সময়, ফিরে আসতে হল।

বনগাঁও থেকে রানাঘাট—গোটা তিনেক স্টেশন—এদিককার জমিটা আরও উষর—**Feature**টা অনেকটা বিহারের মত—বসতি খুব কম—নারকেল নেই, তালও অল্প—খেঁজুরে খেঁজুরে ছয়লাপ—মাঝে মাঝে যেন মনে হল কয়েক ঘর করে পশ্চিমাদের বসতিও আছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রানাঘাটে এলাম—যুদ্ধের সময়ে বিরাট একটা সামরিক সরবরাহ-প্রাঙ্গণ—গোল টিনের ছাউনি—যা বোধহয় খাদ্যের গোলা ছিল—এইটিই কুপারস ক্যাম্প নাকি?—বাস্তুহারাতে ভরে রয়েছে—ট্রেন পর্যন্ত রয়েছে—স্পেশ্যাল ট্রেন নিয়ে এসেছে তাদের। অন্যদিকে তাঁবুও পড়েছে অনেক।

স্টেশনের প্ল্যাটফরমে পা দেওয়া যায় না। শেয়ালদহ থেকে যেখানেই দেখলাম সেই এক দৃশ্য—ছোট বড় পরিবার, কচিকাচা, বৃদ্ধ, যুবতী—সংসারের অল্পবিস্তর যা আনতে পেরেছে—দড়িতে বাঁধা ছেঁড়া বিছানাপত্তর—ট্রাঙ্ক—অল্প তৈজসপত্র। যারা একটু মধ্যবিত্ত গোছের তাদের এরই মধ্যে অল্প একটু উন্নত ধরনের—ক্লান্ত, চিন্তিত, নিরাশ দৃষ্টি—কেউ মৌন, কেউ অল্প মুখর। মায়ের নগ্ন বুকে কচি ছেলে নেতিয়ে রয়েছে—যেখানে একটু জলের ব্যবস্থা—সেখানেই স্নানের ভিড়, মেয়েরা লজ্জা রাখতে পারছে না—

আসাম মেল দাঁড়িয়ে আছে—অপর দিকে অপর একখানা গাড়ি। কলকাতাতেই যাবে—মাত্র মিনিট দশ হাতে। ভিড় ঠেলে টিকিট নিতে অনেকক্ষণ গেল—লাউড স্পীকারে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে—লাইনে নামবেন না! বাঁদিক দিয়ে যান।··· টিকিট দিলে প্যাসেঞ্জারের, বললে—আসাম মেল নয়, তার আসার ঠিক নেই—রাত নটা দশটা হয়ে যায়—গার্ডের গাড়ির কাছে গার্ডকে জিজ্ঞেস করতে বললে—আসাম মেলই। আরও কয়েকজন অফিসার

গোছের ছিল—বললে সময় আছে, ঠিক করে নিন টিকিট—বেশ ভদ্রব্যবহার —একজন যুবা অফিসার বলেই বোধ হল—বলল টিকিট নিয়ে বসুন—চলুন ঠিক করিয়ে দিচ্ছি—খানিকক্ষণ পরে একজন চেকারকে নিয়ে এল, সে চার্জ নিয়ে ঠিক করে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় গাড়ি খুলে গেল।

একজন 'আনসার'-কে একটা পুলিস ধরে নিয়ে যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে —কয়েকজন পশ্চিমা বসে ছিল আমার সামনে—"বাঙালী বাবুদের এই এক হয়েছে, কথায় কথায় পুলিস। আরে আগে ঠিক করে তারপরে পুলিসের হাতে। ওরা কি কিছু বলবে?" একজন বাঙালী বাস্তুহারা—গরম হয়ে উঠেছে—"ওরাই তো এতটা কাণ্ড করলে মশাই, বলুন? আবার পুলিসের হাতে?"

আসাম মেলে সাড়ে ছ টার সময় শেয়ালদহে। সাড়ে সাত ঘণ্টায় প্রায় সওয়া শ' মাইলের ফের দিয়ে এলাম—কালকের ছিল শান্তভাব আজকের হাহাকার—সব ছিন্নভিন্ন—গাড়িতে আসতে একটি ছোকরার সঙ্গে কথাবার্তা হল—বললাম —নেহেরুর চুক্তিতে যেন শান্তিটা আসে—দেখাও যেন আর সহ্য হয় না—যারা ভুগছে তাদের কথা তো আলাদা···

বনগাঁও থেকে আসবার সময় পাশে একটা ট্রেন পাকিস্থানমুখী—একটা লোক দেখে বললে—অনেক হিন্দু তো যাচ্ছে ফিরে—

বোধহয় তাই—এ অবস্থার মধ্যে থাকবে কি করে?

চিন্তার কথা হচ্ছে ফিরে যাবার পর ভারত কি আর তাদের কথা ভাববে? এই সহানুভূতি, যাতে আন্তরিকতা একেবারেই নেই (বঙ্গেতর ভারতের কথা বলছি)—সেটা আর কতদিন টেঁকবে? নেহেরু গভর্ণমেণ্টের চোরা নির্দেশ ওরা আসুক, যতদিন থাকে একটু দেখোশুনো, তারপর পাকিস্থান ন্যাশনালদের মত মনে করতে হবে। (Nation) এদেরই গোষ্ঠী এখন ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্তা!···

॥ ৯ ॥

৯ই অক্টোবর ১৯৫০

মজঃফরপুরে এসেছি। কাল সকালে এই সময়টা ছিলাম শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে বুড়ীগণ্ডকের ধারে। দশটা-এগারটা ঠিক বেড়াবার সময় নয় বোধহয়, তবে শাস্ত্র-সঙ্গত সময় দেখতে গেলে বেড়ানও চলে না। আর এ তো

হাওয়া খেয়ে বেড়ানো নয়, দেখে বেড়ানো, এর জন্য সব লগ্নই মাহেন্দ্র লগ্ন। তারপর দেখতে যে হবে তা কি শুধু ভোরের সূর্যোদয়ই? আমার মনে হয় ও যেন ফ্যাসানদুরস্ত দেখা, অন্তত অনেকের পক্ষেই তাই—একটা বড় গলা করে বলবার দেখা—উঃ, আজ যে সূর্যোদয়টা দেখলাম!...অর্থাৎ আমি কবি, চক্ষুষ্মান, আর পাঁচজনের মত নয়।

অবশ্য সঙ্গী পেলাম বলেই যাওয়া; মজঃফরপুর কলেজের অধ্যাপক ডাঃ হরিরঞ্জন ঘোষাল, যাঁর আতিথ্য নিয়ে রয়েছি। নদীর এপার পর্যন্ত গিয়ে রিকশাটা দাঁড়াল। আমায় কিন্তু ওপারে টানছে। বলতে একটু কুণ্ঠিত হচ্ছি, চৈত্র-বৈশাখ না হোক, তবুও তো দুপুরই। কুণ্ঠা ঠেলে বললামই শেষ পর্যন্ত। যেভাবে রাজী হলেন আগ্রহের সঙ্গে, মনে হল ওঁর মনেও কথাটা তোলপাড় করছিল।

ভাসা পুল পেরিয়ে আমরা ওপারে গিয়ে উঠলাম, এই যে মন জানাজানি হয়ে একাত্মীয়তাটুকু গড়ে উঠেছে, এতেই আমরা আস্তে আস্তে মুখর হয়ে উঠলাম।

চড়াই ঠেলে উঠলাম ওপারে, তারপর একটা পানের দোকানের পেছনে একটা তক্তার ওপর গিয়ে বসলাম। একজন জাঁদরেল ডক্টর, কলেজে ইতিহাসের চেয়ার দখল করে আছেন ঘোষালমশাই।

নদীর ধারে অবহেলিত একটা কাষ্ঠখণ্ড নিশ্চয় ওঁর উপযোগী আসন নয়। সে কথা তুলতে কিন্তু হেসে যা বললেন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পোশাকী জীবনকে সঙ্গে টেনে নিয়ে চললে জীবনের পূর্ণতা থেকে অনেকখানি বঞ্চিত হয়ে থাকতে হয়। কথাটা খুবই খাঁটি, তবে বোঝে কম লোকে, আর, বোঝবার জন্যে বোধহয় মাঝে মাঝে এই রকম করে বেরিয়ে আসা দরকার, পোশাকী জীবনের মাঝখানে থেকে তার সীমাবদ্ধতাটুকু নজরে পড়ে না।

খেয়াঘাটের রাস্তাটা উঠে গেছে। ঘেটেলের ঘর বা অফিস, দু-একটা মুড়ি-ছাতুর দোকান, খানিকটা এগিয়ে বেশ খানিকটা বড় উঠান নিয়ে একটা বাড়ি, হরিরঞ্জনবাবু বললেন—এদিককার একজন ছোটখাট জমিদার।

এও শহরের একটা টুকরো, আমরা ঘুরে নদীর দিকে মুখ করে বসলাম, যেদিকে নদীটা টানা উত্তর দিক থেকে এসেছে বেরিয়ে। আমাদের বাঁ দিকে ঘাটের দোকান ঘরগুলো ঘাটের দিকটা করে রেখেছে আড়াল, সামনে জমিটা একটু গড়িয়ে নেমে গিয়েই একটা প্রশস্ত মাঠে পড়েছে ছড়িয়ে, দৈর্ঘ্যে বোধহয় দু'আড়াই মাইল পর্যন্ত। বর্ষায় জমিটা নিশ্চয় ছিল জলের মধ্যে, জল সরে

গিয়ে পলি পড়েছে, তাইতে এখন চলেছে চাষের আয়োজন, কয়েকটাই লাঙল নেমেছে সমস্ত জমিটার ওপর, সামনেরগুলি একটু চঞ্চল, দূরের মন্থর, আরও দূরের আরও মন্থর।···ডানদিকে জমিটা উঁচু হতে হতে তটের গাছপালার মধ্যে মিলিয়ে গেছে, বাঁয়ে গণ্ডক, জল স্বচ্ছ হয়ে এসেছে, তারপর বহু দূরে শহরের বাড়িঘর। সমস্তটুকুর ওপর হেমন্তের ঝলমলে রোদ।

এই দৃশ্য সামনে রেখে আমাদের গল্পটা নীলকুঠির রোমাঞ্চের মধ্যে কখন্ গড়িয়ে পড়েছে। ডাঃ ঘোষাল বেহার গভর্ণমেণ্টের হিষ্ট্রিক্যাল রেকর্ডস নিয়ে পড়েছেন, গভর্ণমেণ্ট কর্তৃকই অনুরুদ্ধ হয়ে। উনি বলে যাচ্ছেন, আমি আছি ডুবে।

ঘণ্টাখানেক কোনদিক দিয়ে যেন কেটে গেল।

এই সকালটি চমৎকার একটি রাত্রি এনে দিলে, সেও মনে গেঁথে রাখবার মত। অবশ্য সকাল আর রাত্রে কোন যোগ নেই, 'এনে দিলে' এই জন্যে বলা যে আমি সকালে কুণ্ঠা ঠেলে প্রস্তাবটা করতে পেরেছিলাম বলেই, বিকেলে কলেজ থেকে এসে হরিরঞ্জনবাবু ওঁর প্রস্তাবটা পারলেন করতে, একটু মন জানাজানি তো হয়ে গেছে।···রাত্রে কীর্তন হয় এক জায়গায়, কীর্তন আর শ্রীভাগবত পাঠ, যাব কি?

সেই গিয়েছিলাম। কালকের সকালটিতে আমরা ছিলাম সৃষ্টির বহির্লোকে, রাত্রে ছিলাম অন্তর্লোকে, দুটোয় মিলে একটি পরিপূর্ণ দিন গেছে আমার।

কীর্তন করেন ত্রিহুতের কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিষ্টাণ্ট ভৈরববাবু, শ্রীভৈরবকুমার সিংহ। আমাদের বাসা থেকে বেশ খানিকটা দূর, গিয়ে পড়তে রাত আটটা হয়ে গেল।

ভৈরববাবু মাঝবয়সী প্রিয়দর্শন পুরুষ, আকৃতিতে বেশ একটি শান্ত আত্মলীন ভাব যা বিশ্বাসী বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রায় লক্ষ্য করেছি; আর যা, আমার মনে হয়, ওঁরা **At peace with the world** থাকেন বলেই অর্জন করে থাকেন। আরও জন চারেক বাঙালী ভদ্রলোক উপস্থিত হয়েছেন, দেখলাম সবাই চেনা; আলাপ করতে খানিকটা সময় কেটে যাওয়ার পর আমরা ভেতরে একটা হলঘরে গিয়ে বসলাম, প্রায় সাড়ে আটটার সময় পাঠ হল শুরু।

"ভগবান মিথ্যো বললেন"—এই বলে বোধহয় পূর্বের জের টেনেই শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা আরম্ভ করলেন, মাটি খাওয়া নিয়ে। এই নিয়ে যত শিশুর মা তো নাকাল হচ্ছে সারা বিশ্বে, ধরে ফেলে এবার সাজা দেবেন যশোদা। ছেলেও তো সাধারণ নয়, বাজীকরের রাজা একেবারে, মুখটা হাঁ করে বললেন

—"কৈ মা খাইনি তো মাটি আমি, এই দেখো না।"

ব্যাখ্যাতা বলছেন—মিথ্যা বললেও, তত্ত্বের দিক দিয়ে ভগবান কিন্তু মায়ের সামনে মিথ্যা বলেননি, কেননা সবই যাঁর মধ্যে তিনি আর খাবেন কি? কিন্তু মিথ্যা বলছেন ধরে নিয়েই লীলার রূপ খোলে, আর কিছু নয়তো, এই মাটিতে নেমে মাটির মায়ের সঙ্গে মাটি নিয়ে খেলা, ঘরে ঘরে যা নিত্য ঘটাচ্ছেন তারই মধ্যে নিজে একবার রূপ পরিগ্রহ করে দাঁড়ানো। একটা দিক এই, আরও একটা আছে এর সঙ্গে, অনন্তেরই শান্ত রূপ তো? "এই দেখো না মা, খাইনি তো মাটি আমি।"

কণ্ঠের নিচে দৃষ্টি দিতে গিয়ে যশোদার বুঝি চৈতন্য লুপ্তি হয়! একি ব্যাপার! সব রয়েছে যে—সারা বৃন্দাবন, সারা গোকুল, সারা জগৎ, জগতাতীত আরও ওকি সব! আমিও যে রয়েছি মুখের মধ্যেই ওর হাতটা ধরে!...একি সর্বনাশ!—একি হল আমার ছেলের!

ব্যাখ্যাতা মাঝে মাঝে পাঠ করে যাচ্ছেন, বাইরে থেকেও শ্লোক এনে করছেন হাজির। অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের সঙ্গে তুলনা করে বললেন—অর্জুন তাতে অভিভূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে আরম্ভ করে দিলেন। যশোদা কিন্তু সে ধরনের কিছুই করলেন না, সব মায়ের মতই আকুলি বিকুলি করতে লাগলেন—ছেলের আমার কি হল! শেষে নারায়ণের হলেন শরণাপন্ন।

লীলার চরম হল, ভক্ত-বন্ধুর কাছে জিতেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু মায়ের কাছে খেলেন হার। তাঁর এ লীলাই বা বুঝবে কে?

ব্যক্তিগতভাবে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা আমি ঠিক বুঝিনি, বাল্যজীবন আর উত্তর জীবন, অর্থাৎ গীতার যুগটা বেশ স্পষ্ট, একটি যেমন মধুর অপরটি তেমনি বিরাট। বলবার লোক হলে যে ঐ মাধুর্যই কতগুণ বাড়িয়ে তোলা যায় সেটা উপলব্ধি করলাম কাল রাত্রে।

একটা কথা এঁর মুখেই বলে বড় ভালো লাগল, কেননা ভক্তিবাদীরা সেটা স্বীকার করতে চান না। ব্যাখ্যাতা বললেন—ভক্তি জিনিসটা তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে টেঁকে না। বললেন, ব্যাপারটা কতকটা বায়ুতে বীজের মত, আধারহীন বলেই ব্যর্থ। গোপীদের ভক্তির কথা বললেন—তাতে তত্ত্ব রূপ হারিয়ে ফেলেছে রসের মধ্যে—মিছরি দুধে গুলে গিয়ে নিজের আকার হারিয়ে ফেলার মত। যারা বাইরে থেকে দেখবে তারা গোপীদের এই তত্ত্বাশ্রয়ী প্রেম বুঝতে পারবে না, বুঝবে শুধু গোপীরাই যারা সেই জিনিস আস্বাদ করেছে।

শেষ হল রাত সাড়ে বারটায়। মনে হল যেন অনেক কিছুই বাকি রয়ে গেল। রসের তো আর তল নেই।

॥ ১০ ॥

১০ই ডিসেম্বর ১৯৫০

কাল গিয়েছিলাম রাজগির-নালন্দা নিতাইয়ের মোটরে; নিতাই, ধবুল, অবনী, বৌমা। তুলসীবাবু রয়েছেন বখতিয়ারপুরে, শ্রীগণেশ হাই স্কুলের হেডমাস্টার। তাঁকে আগে খবর দিইনি। মাস্টারির একঘেয়ে জীবনে pleasant surprise বলে জিনিসটা বড় একটা জোটে না। একেবারে হুড়মুড় করে গিয়ে তুলে নেওয়া যাবে গাড়িতে।

ইংরেজরা গেছে বাঁচা গেছে। ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে আমাদের বেরিয়ে পড়বার কথা ছিল দানাপুর থেকে। কেউ আর দোষ ধরবার নেই, দিব্যি থিতিয়ে জিরিয়ে স্বরাজী চালে আলস্য ভাঙতে ভাঙতে সাড়ে নটার সময় যাত্রা করা গেল। ঘণ্টা দুই পরে বাড়-রোডে তুলসীবাবুর বাসায় পৌঁছে শোনা গেল তিনি এই একটু আগে স্কুলে চলে গেছেন।

সঙ্গে সঙ্গেই মোটর ছাড়া গেল না; মেয়েদের একটু দেখা-সাক্ষাৎ দরকার, ওপর থেকে অনুরোধ এসে পৌঁছাল আমাদেরও একটু চা-জলযোগ করে যেতে হবে। একটা মৃদু আপত্তি উঠল এদিকে—দেরি হয়ে যাবে যে। বললাম—"উপায় নেই, হিন্দু হয়ে যাত্রায় বিশ্বাস করাই ভালো; সেটা আরম্ভই হয়েছে যখন বিলম্বিত লয়ে তখন আপাতত তাই চলবে।"

আসল কথা আমি মানুষটাই বিলম্বিত লয়ে তৈরী, তড়িঘড়ি সয় না আমার ধাতে। রাজগির দেখতে যাচ্ছি বলে যে আর সব কিছুই জগন্নাথকে দিয়ে যাচ্ছি এমন কথা নয় তো।...মাস্টার মশাইয়ের ছোট মেয়ে খুকুটাকে হাতের কাছে পেয়ে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে যাওয়া যায় না। আর, পাওয়াও তো যাচ্ছে না ভালো করে খানিকটা, এতদিন পরে দেখে কি করবে ভেবে না পেয়ে ক্রমাগতই ওপর নীচে করছে।...

Grow more food-এর একটা বড় রকম প্রাইজ মাস্টার মশাইয়ের কপালে নাচছে। District Board-এর রাস্তার প্রায় মাঝামাঝি থেকে লাউ আর সীমের লতা তুলে দিয়েছেন সোজা ছাতের ওপর। রাস্তার ধূলার মাঝে যে এতখানি সরসতা কোথায় লুকানো ছিল ভেবে ওঠা যায় না। একটি যেন

ওয়েসিস। গাঢ় সবুজের গায়ে সাদা সাদা ফুলের স্তবক; একটি বড় লাউ তার নধর মসৃণ শরীরটি লতাপাতার মধ্যে অনেকখানি প্রচ্ছন্ন রেখে উঁকি মারছে, ছোট ছোট অনেকগুলি জালি ঝুলছে, মুখে সাদা সাদা ফুল।·· আচ্ছা, এমনটা কেন হয়?– আমরা যে জিনিসগুলো খাই তাদের সৌন্দর্যের দিকে নজর দিতে পারি না কেন? সীমের ফুল যে ফুল নয়, লাউটা দেখলেই যে ডালনা ঘণ্ট ছেঁচকির কথাই মনে পডতে হবে এ কেমন কথা? প্রকৃতিই পুরোপুরি দিতে চান না, না, আমরাই জানি না নিতে?

লাইন পেরিয়ে খানিকটা এসে তারপর স্কুলটা। দিব্যি ফাঁকা জায়গা, তিনদিকে টানা ঘর, মাঝখানে অনেকটা জমি, তাতে তরকারির বাগান, নেম-রক্ষে গোছের কিছু ফুল। স্কুলেও ফুলকে বঞ্চিত করে বেগুনকে জায়গা দিলে মনে হয় না কি গুণবানরা এবার food-এর আতিশয্যে জাতির পেট ফাঁপাবার ব্যবস্থা করছেন? অন্য দিক দিয়ে বলতে গেলে এ যেন সরস্বতীর আঙিনায় জোর করে লক্ষ্মীকে ডেকে এনে ঝগড়া বাধানো। ওঁরা অবশ্য দুই বোন, কিন্তু দুই সতীনও যে এটা ভোলা নিরাপদ নয়।

Pay-day মাস-পয়লা, টাকা বিলোচ্ছিলেন, তার মধ্যে থেকেই ছিনিয়ে নিয়ে গেলাম আমরা ওঁকে। রামপ্রতাপবাবু সহকারী শিক্ষক, আগের পরিচয় ছিল, বললেন—"আমাদের হেডমাস্টার কেড়ে নিয়ে চললেন?" উত্তর করলাম —"ভাবনা নেই, তীর্থ করিয়ে ফেরত দিচ্ছি, লাভেই থাকবেন।"

দীর্ঘ টানা রাস্তা, চওড়া, পিচ-ঢালা, বাঁ পাশ দিয়ে বিহার-বকতিয়ারপুর লাইট রেলওয়ের লাইন। একটি ট্রেন দুলতে দুলতে চলে গেল উল্ট দিকে। ডিজেল ইঞ্জিনে টানছে, তিনটি গাড়ি, চারটি নেডা ট্রাক; তাতেও লোক, তাদেরও গান! অপূর্ব শান্তি আর সন্তোষের দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ, তার ওপর আবার স্বাধীনতা পেয়েছে; অভাব তো মাত্র ঐটুকুরই ছিল। দুধারে দিগন্ত মাঠ, লিফ্‌ট্‌ জলসেচের কল্যাণে ফসল হয়েছে প্রচুর, বহু দূরে দূরে কিছু গাছপালা, সমস্ত জায়গাটা বর্ষায় পুনপুন্‌ আর দু একটি পাহাড়ী নদীর জলে যায় ডুবে তখন দৃশ্য আরও চমৎকার; দেখা আছে আমার। আমার এই পথটি লাগে বড় ভালো। সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা সাদৃশ্য হেতু মনে পড়ে ডায়মণ্ড-হারবার রোড। তফাতও আছে খানিকটা। ডায়মণ্ডহারবার রোড আরও শ্যামলিমায় মোড়া, আরও স্নিগ্ধ; দূরে দূরে দুদিকে টানা গ্রাম, একের পর এক আম জাম কাঁটালের বাগানের ওপর নারকেলের সবুজ শিখা দুলছে। রাজ-গিরের রাস্তায় আছে বিহারের অপেক্ষাকৃত রুক্ষ পৌরুষ; ডায়মণ্ডহারবার

রোডের এটাকে কি বলি ?—একটি মন-কেড়ে-নেওয়া কীর্তনের সুর।

মাঝে মাঝে স্টেশন আছে। মাঝামাঝি—মাইল পনের-ষোলর মাথায় বেহারশরিফ। মহকুমা শহর হলেও বেশ বড জায়গা। শোনা যায় নাকি বেহারের মহকুমার মধ্যে সবচেয়ে বড শহর, তা ভিন্ন মুসলমানদের এখানে কোন পীর ফকির নিয়ে কিছু আছে বোধহয়, মেলা হয়। নামটা ইতিহাসের দিক দিয়ে একটু বিশিষ্ট। বৌদ্ধদের বিহার থেকে এর নাম, তারপর এই নামই সমস্ত প্রদেশটাকে করেছে নামাঙ্কিত। আমাদের মোটরটা শহরকে একরকম বাঁয়ে রেখেই এগিয়ে চলল। ডান দিকে একটা বিচ্ছিন্ন পাহাড একরকম তৃণস্পর্শবর্জিত বললেই হয়, অল্প অল্প ঢালুর ওপর উঠে গেছে, তারপর শেষের দিকে একেবারে খাড়া গেছে নেমে, বোধহয় পঁচিশ-ত্রিশটা তালগাছের মাপে, হয়তো বা আরও বেশি। শোনা যায় এইখানে বৌদ্ধদের বিহার ছিল, যখন বখতিয়ার খিলিজি আসে। ওদিকে পাহাডের গোড়া বেয়ে ছিল একটা নদী ; এখন মাঠ।

আমাদের মোটর এগিয়ে চলেছে। সামনে রাজগিরের পাহাডের নীল রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দু দিকে চর গেছে শেষ হয়ে ; রাস্তার প্রায় সমতলে মাঠ, বাগান, গ্রাম। কিছু দূরে গিয়ে রাস্তাটা ভাগ হয়ে গেল, বাঁয়েরটা গেছে নওয়াদা হয়ে গয়া, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপ-পথ ; আমরা ডাইনেরটা ধরলাম। মনটা কোথায় গেছে চলে—হিন্দু যুগ, বৌদ্ধ যুগ—আশপাশের এই সব যে লোক, এদের পূর্বপুরুষেরাই তো সৃষ্টি করেছিল সেই সব যুগকে।...আজকের বৈশ্য সভ্যতা ব্যবসার তাগিদে জগৎকে ঘরের কাছে এনে ফেলে, সেদিন তারা এনেছিল ধর্মের তাগিদে, জ্ঞানের তাগিদে—বৈশ্যধর্ম আর বুদ্ধধর্ম। মানুষ এইরকম করে অনেক বারই কাছে ঘেঁষে এসে করেছে কোলাকুলি—কখনও হয়েছে স্নেহে-প্রীতিতে, কখনও সেয়ানায়-সেয়ানায়। যেমন আজ।

নালান্দা স্টেশন। ছোট্ট একটি টিনের চালা। নালান্দার রাস্তা সোজা বেরিয়ে গেছে, বাঁদিকে একটা দোকান, চা, মিষ্টি, কতকটা হোটেলেরও ভাব আছে। কিঞ্চিদধিক হাজার বছর আগে এই রাস্তার এই মোডের মাথার দোকানটির কল্পনা করা যাক, এইরকমক একটা ঘাঁটির মাথায় নিশ্চয় ছিল একটা ; নালান্দা যাবার মোড, ওদিকে রাজগৃহ।...কি বিকিকিনি হত ? তখনকার দিনে চায়ের জায়গা নিয়ে ছিল কোন্ পেয়ারের পানীয় ?...আজকের খদ্দেররা তুলছে নবলব্ধ স্বাধীনতার কথা, তার আনন্দ মলিন করে দিচ্ছে অন্নবস্ত্রের অভাবের কাহিনীতে, মন্ত্রী-সংঘ পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় বৈশ্যচাতুরীর কাছে।

সেদিনের কথা ছিল—"শোনা যায় নাকি অপরূপ এক পরিব্রাজক এসেছেন—চন্দ্রাকৃতি মুখমণ্ডল, নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের মতই পীতাভ উজ্জ্বল—এখানে নাকি অবস্থান করছেন ?..."

মোটর এগিয়ে চলেছে, দূরে চক্রবালে নালান্দার স্তূপগুলো যাচ্ছে মিলিয়ে। 'ত্বপুর তো গড়িয়ে গেল হে, আর কতদূর ?'...হয়ে এসেছে ; এর পর সিলাও, তার পরেই রাজগির।

পাহাড়গুলো স্পষ্টও হয়ে এসেছে।

সিলাও-এর চিঁড়ে আর খাজা। চিঁড়ে কেনা গেল সবাই মিলে প্রায় ছসের, দর একটাকা দশ আনা করে ঠিক হল অনেক টানাটানি করে। খাজার ফরমাশ দেওয়া হল, ফেরবার সময় নেওয়া যাবে। দর তিনটাকা সের ; অত্যাচারই, কিন্তু চিঁড়ের জন্যে একটাকা দশ আনা দেবার পর আর গায়ে লাগে না। অন্তত এই সান্ত্বনাটুকু বুকে করেই তীর্থক্ষেত্রে প্রবেশ করা ভালো।

একটু গিয়েই রাস্তাটা নামতে আরম্ভ করছে। রেলপথ হয়ে চলেছে সঙ্গের সাথী, শুধু যেখানে যেখানে গ্রাম, রাস্তার ত্বধারে বাড়ি, সেখানে সেখানে সামনে ছেড়ে পেছনে চলে যাচ্ছে, আবার গ্রাম ছাড়িয়ে হচ্ছে উপস্থিত।

ঢালুর মুখেই রাজগির এসে পড়ল ; প্রথমে পুরনো গ্রামটা, তারপর রেলস্টেশন ঘেরে নূতন বসতি। শুনলাম কয়েকঘর বাঙালীও বাড়ি করেছেন। রাস্তা নেমেই চলেছে, চারিদিকে উঁচু-নিচু জমি। একটু দূরে ডানদিকে Rest house। চমৎকার দোতলা বাড়িটি, চুণকাম করা, চারিদিককার সবুজের মধ্যে রোদে ঝলমল করছে ; সামনে, পাশে পাহাড়ের নীল পটভূমিটা পেয়ে আরও যেন জলুস বেড়েছে তার।

গাড়ি এসে মন্দিরের গোড়ায় দাঁড়াল।

সামনেই ছোট একটা বাজার, তার মাঝখান দিয়ে পথটা উঠে গেছে। একটা টীলার ওপর ত্বটো মন্দির আর ছোট বড নানা আকারের ঘর দেয়াল, তারই মাঝখানে উষ্ণ প্রস্রবণ।

পাণ্ডা সঙ্গ নিলে গোড়া থেকে। দরকার নেই, কিন্তু শোনে কে ? আমার ধর্ম কিসে তা আমি যদি জানতেই পারব তো ধর্মকে এত রহস্যময়, অবোধগম্য বলা হয়েছে কেন ?

আবার গোটাদশ সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রস্রবণের জলধারা। দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা প্রায় পনের হাত × আট হাত জায়গা—একটা ঘরই, শুধু ছাতটা নেই মাথার ওপর—তারই বাঁ দিকে দেয়ালে দূরে দূরে গোটা ছয়েক ফোকর,

তাই দিয়ে গরম জল বেরিয়ে আসছে।

সবগুলোতেই তুতিন জন করে লোক, গা পেতে নাইছে। দিব্যি গরম এই শীতকালেও। একবার পিঠের দিকটা বাড়িয়ে পরখ করলাম, ছেলে-বেলায় ঐ জায়গাটাকেই অনেক সইতে হয়েছে, দেখাই যাক না আজ কি বলে। হল না সহ্য। পাশেই এই ধারাতেই একটি লোক তার বছর পাঁচেকের একটি রুগ্ণ ছেলেকে স্নান করাচ্ছে পেটের ওপর ঐ গরম ধারা ধরে; ছেলেটার এতটুকু মুখ-বিকৃতি নেই। আমিই আমার পিঠের অভিজ্ঞতায় ভীত হয়েই কয়েকবার বললাম লোকটাকে, সে হাসতে লাগল।

সবাই বেশ নাইছে, ঐ রহস্য—আস্তে আস্তে সইয়ে নিতে হয়—সমস্ত জীবনেরই দার্শনিক রহস্য বলা চলে—কত সইবার যে ক্ষমতা আছে আমাদের নিজেরাই কি জানি?

পাশেই একটা কুণ্ড, এই জলই গিয়ে পড়ছে, আরও গরম। সেখানেও নাইবার লোক আছে, গা ডুবিয়ে, মাথা ডুবিয়ে। অবনী সেইখানেই গিয়ে নেয়ে এল। ওপর দিকে আরও একটা নাইবার জায়গা আছে; আমি যেখানে নাইতে পারলাম না তারও ওপরে।

পৌঁছেছি প্রায় তুটোর সময়। গামছার সাহায্যে স্নান সেরে দেবী দর্শন করতে গেলাম, শ্বেতপাথরের মূর্তি, বোধহয় লক্ষ্মীনারায়ণ। পাণ্ডা ঠিক সঙ্গে আছে, দোরের সামনে দাঁড়াতেই বললে—"এইবার হাতজোড় করে মন্ত্র বলুন—ওঁ…"

বললাম—"আমি নিজে ব্রাহ্মণ বাপু, থামো তুমি।"

বিরক্ত ধরিয়ে দেয়, আবার মনটাকে ঠিক করে নিতে অনেকখানিই সময় যায় লেগে।

ইতিমধ্যে মোটর ওবা দূরে একটা গাছের ছায়ায় নিয়ে গেছে, এখান থেকে অনেকটা নীচু, দেখছি টিফিন কেরিয়ার খোলা হচ্ছে। একটু ঘুরে-ঘারে নেমে সবাই পৌঁছানো গেল সেখানে। চারিদিকে পাহাড়, সামনেরটা রত্নগিরি। বাঁদিকে একেবারেই কাছেরটার কি নাম বুঝলাম না ঠিকমত। তুর্ভাগ্যক্রমে যে লোকটাকে জিজ্ঞেস করা গেল—একজন প্রৌঢ়, স্থানীয় লোক বলেই মনে হল—তার কথাগুলো জড়ানো। নাম জিজ্ঞেস করছিলেন তুলসীবাবু, বার তুই মনে হল ভীষ্মেশ্বর বললে, তারপর যেন বার কয়েক ঐ কথাটাই বিপুলেশ্বর বলে মনে হল; লোকটা চটে যাচ্ছে দেখে ঐতেই সন্তুষ্ট হতে হল দরকার কি ক্রোধটাকে অযথা বিপুলতর করে?…খাবার ব্যবস্থা হতে

থাকুক আমরা দুজনে একটু পাহাড় বেড়িয়ে আসি। তেতলা চারতলা উঁচু পর্যন্ত ওঠা গেল, এও একটু নেম-রক্ষা করা গোছেরই, লোককে বলতে তো হবে।…তুলসীবাবু আবার পদ্য লেখেন, না ছুঁয়ে গেলে অধর্ম হবে।

এই পাহাড়েরই শীর্ষে প্রায় মাইলখানেক দূরে আছে গোটা তিন জৈন মন্দির—অনেক দূর থেকে যায় দেখা। পাহাড়ের গা বেয়ে পাকা রাস্তা করা আছে, অন্তত গোড়ায় খানিকটা তো পড়ল চোখে।

ফেরার পথে নালান্দায় পৌছলাম চারটের সময়। স্টেশনের পাশ দিয়েই পথ গেছে। রাস্তা সেই দানাপুর থেকে নালান্দা পর্যন্ত সমস্তটা ভালো, পিচ-ঢালা। বেহার উন্নতির পথে; পথও উন্নত হয়ে উঠেছে। প্রথমে মিউজিয়ামে গেলাম। টিকিট নেওয়া হয়নি, নিতাই গেল আনতে। রক্ষী আমাদের 'ধারে' প্রবেশ করতে দিলে। কত বিচিত্র জিনিস দেখতে দেখতে কোন্ সুদূর যুগে চলে গেছি—কত বিচিত্র মূর্তি—বর্বর-হস্ত-লাঞ্ছিত—কার ঘরের একটি মাটির প্রদীপ, পিলসুজ-সুদ্ধ; একটি ছোট মৃৎপাত্র; কার শিশুর ছোট্ট একটি খেলনা, জাঁতার ওপরের চাকতিটা। ব্রোঞ্জের কত অপূর্ব মূর্তি; বর্বররা মঠে আগুন লাগিয়েছিল, তার পোড়া চাল একবাটি।

মিউজিয়াম শেষ করে গেলাম Excavation-এ, যেখানে পুরাজগতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় এক সময় ছিল দাঁড়িয়ে। অর্থাভাবে খননকার্য এখন স্থগিত (এঁদের তো অভাবেরই রাজত্ব।)। এগারটি মঠ খোঁড়া হয়েছে, ভাঙা-চোরা হলেও বেশ একটা ধারণা হয় বিপুলতার। সব পাশাপাশি, মাঝখানে একটা করে বিরাট প্রাঙ্গণ, তার পাশাপাশি চারিদিকে ছোট ছোট ঘর সব, একজনের থাকবার মত। প্রায় সব মঠগুলিতেই অঙ্গনের এক পাশে একটা করে কূপ। একটা এখনও চালু রয়েছে। একটা মঠ এরই মধ্যে বিশিষ্ট, মনে হল যেন একটা ঢাকা বিরাট বক্তৃতামঞ্চ ছিল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সব চেয়ে বড় যে স্তূপ সেইটির ওপর উঠলাম। স্থাপত্য-পদ্ধতি দেখলে মনে হয় যে একটাকে চাপা দিয়ে বা একটার ভগ্নাবশেষের ওপর আর একটা গড়া হয়েছিল। গাইড তো বললে এই ভাবে সাতটা স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভগবান জানেন।

প্রধান স্তূপের এক দিকটায় মূর্তিগুলো এখনও বেশ আছে; ছোট বড় ঘণ্টাকৃতি স্তূপগুলোও। সব একরকম পাথুরে চুণ দিয়ে মাজা, অবশ্য মাটির নীচে চাপা ছিল বলেই এখনও আছে। বাঁকা-চোরা সিঁড়ি, অলি-গলি, একটার

গায়ে একটা, যেন একটা অসংলগ্ন স্বপ্নপুরী জমে গেছে; গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই শ্রেণীর ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়।

একেবারে যখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আমরা এগার নম্বর মঠের সামনে, একটা ঘেরা দেয়ালের মধ্যে একটি বিরাট বুদ্ধমূর্তির সামনে উপস্থিত হলাম। শোনা গেল নাকি নিকষ পাথরের। আংটি দিয়ে দাগ কাটা গেল, উঠল কি উঠল না ঠিক বোঝা গেল না; আকাশের নিকষেও তখন সোনার দাগ সব মিলিয়ে গেছে।

॥ ১১ ॥

১৩ই জুলাই ১৯৫১

আজ গিয়েছিলাম কমতৌল, দ্বারভাঙ্গা থেকে দুটো স্টেশন। ডাক্তার ঘোষ এখানে নূতন বাড়ি করলেন, গৃহ-প্রবেশ ছিল।

এক একবার একটু ঘুরে না এলে প্রাণটা আইটাই করে; কাজের মধ্যে তো বসে বসে একটু আধটু কলম-ঘষা, তাতেও যেন মন বসে না; এই অবস্থা চলছে আমার, সেই কবে জুন মাসের গোড়ায় কলকাতা থেকে বেরিয়েছি। তা কলকাতাটাই বা এবার তেমন সুবিধা মত হল কোথায়?—যা গরম গেছে!

বেরুব, তা সঙ্গী চাই তো। দূরের পাল্লার ভোজ, এ-বয়সে একা গেলে মনে হয় যেন নিতান্তই লোভে পড়ে এসেছে। শম্ভু আর নগেনকে জপানো গেল। শম্ভু বেশ চালিয়ে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত, সব কাজেই আগে পা বাড়াবে, ছোকরাদেরও পেছন ফেলে, নগেনটা যেন আমার চেয়েও হয়ে পড়েছে জড়ভরত। কিন্তু ছাড়ছে কে! আহা, সে গুণটা কিন্তু আছে এখনও ওর—সব কাজেই ওর সেই বাঁকুড়ার টানাটানা আধ আধ ভাষায় আপত্তি, তারপর সব কাজেই রাজী।

বললে—"আমি কিন্তু খেতে পারবো না ভাই⋯"

বলা গেল—"তোকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে কে খেতে? চল্।"

তিনটে পঁচিশে গাড়ি, মিনিট কুড়ি দেরি করে নিজের ধর্মটা বাঁচিয়ে নিয়ে প্রায় চারটের কাছাকছি ও, টি, আর-এর গাড়ি ছেড়ে দিলে। তারপর মিনিট পঁয়তাল্লিশ, মাঝে একটা স্টেশন মহম্মদপুর, প্রায় পাঁচটার সময় আমরা কমতৌলে তিনটি 'তশরিফ্'কে হাজির করলাম।

এমন কিছু ব্যাপার নয়, দ্বারভাঙ্গা থেকে পনের মাইলের তফাত, কিন্তু তবুও একটা মুক্তি, একটা Sabbath-এর চাপা উল্লাস অনুভব করছি। ডাক্তার ঘোষ এসেছিলেন, গাড়ি থেকে আরও কয়েকজন বাঙালী নামলেন—রাজের আমলা কয়েকজন। জীপ মোটর রয়েছে; বিরক্ত হয়েই বললাম—"এখানেও শহর আর সভ্যতা তাড়া করে এসেছে!" আধ মাইলও পথ নয়, বৃষ্টি হয়ে থাকবে দুদিন আগে, কাদা নেই তবে ধূলোটা বেশ ভেজ'-ভেজা, হেঁটেই চললাম।

চমৎকার বাড়িটি করেছেন ডাক্তারবাবু। একেবারে হালফ্যাসানের। ভিড় জমে গেছে। ডাক্তারবাবুর গৃহ প্রবেশ, 'পরসাদি'র ব্যবস্থা আছে, বাড়িটিও দেখবার মতো, তার ওপর একটা ছোট ডায়নেমো আনানো হয়েছে, আজ রাত্রে বিজলী জ্বলবে, একটা রেডিও ফিট্ করা হচ্ছে লাউড স্পীকারের সঙ্গে, তার খ্যাঁক-খ্যাঁকে আওয়াজ উঠছে মাঝে মাঝে—একটা প্রকাণ্ড ভিড় গেছে জমে।

এতটা বরদাস্ত করা শক্ত, তাহলে দ্বারভাঙ্গাই বা কি এমন দোষ করেছিল। ঠিক হল একটা নিরিবিলি দেখে জায়গা বেছে নিতে হবে।

স্টেশনেই ভালো, এখন কোন গাড়ি নেই। চায়ের পর্ব শেষ করে আমরা বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠলাম; এবার আমাদের সঙ্গী হলেন জ্যোতীশবাবু, দ্বারভাঙ্গার অ্যাসিস্‌টেণ্ট্ স্টেশন-মাস্টার।

বেশ মজলিসী লোক, রেলের চাকরির দৌলতে ঘুরেছেন অনেক, অনেক দেখাশোনা আছে, গল্প জমে উঠল—কোথায় আসাম সীমান্তের স্টেশনে টেলিগ্রাফ-রত স্টেশন-মাস্টারকে বাঘে তুলে নিয়ে গেল—কোথায় নির্জন প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে চোরেরা চুরি করতে যাচ্ছিল, প্রশ্ন করে নাকি বিরাগভাজন হয়ে পড়েন—সব গল্প শুনেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সন্ধ্যার আকাশের নীচে রোমান্স জমে উঠল আমাদের।

উঠতে হল শম্ভুর তাগাদায়। ও ছেলেবেলার কয়েকটা জিনিস এখনও ধরে রেখেছে, এখনো ও একটু পেটুক।—নেমন্তন্ন বাড়ি থেকে দূরে বসে কে কবে বাঘের জলখাবার হল এ ধরনের গল্প শোনা যে ওর রুচিকর হচ্ছে না এটা বুঝতেই পারছিলাম, রাত হয়ে উৎসব বাড়িতে বিজলীবাতি জ্বলে উঠতে ওকে আর ধরে রাখা গেল না।

এসে দেখি বাড়ি গমগম করছে। সত্যনারায়ণের পূজা এই শেষ হল, 'পরসাদি'র জন্য রাস্তা থেকে নিয়ে বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত লোকেদের চাপ; কোন রকমে ভিড় ঠেলে আমরা ওপরে গিয়ে উঠলাম। খাওয়া-দাওয়ার দেরি আছে, তবে আয়োজন যা হচ্ছে রান্নাঘরের দিকে গিয়ে শম্ভুকে দেখিয়ে

খানিকটা আশ্বস্ত করে ছাতের ওপরে গিয়ে উঠলাম।

বেশ প্রশস্ত ছাত, এ-মুড়ো ও-মুড়ো সতরঞ্চি বেছানো, ফুরফুরে হাওয়া, শরীরটা জুড়িয়ে গেল। ওরা গড়াগড়ি সতরঞ্চি আশ্রয় করেছে; আমি কিন্তু চঞ্চল হয়ে পড়েছি মনে মনে। মনে হল যা খুঁজতে এই পনের মাইল ঘর ছেড়ে আসা তা যেন এইবার পেয়ে গেছি। ছাতের একটি কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম। স্বচ্ছ আকাশে নবমীর চাঁদ উঠেছে, যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়, জ্যোৎস্নার প্লাবন। এই বাড়িতে একটা উৎসবের কলরোল রয়েছে, কিন্তু আমি অনুভব করছি চারিদিকের স্তব্ধতা যেন এটাকে চেপে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। বুঝছি ব্যাপারটা Subjective, আমার নিজের অন্তর জগতের; কাছে থেকেও আমি দূরে গিয়ে পড়ছি মাঝে মাঝে, মুক্ত দিগন্তে আমার মন দিচ্ছে পাড়ি, কিসের সন্ধানে কিসের আকুতিতে নিজেই পারছি না বুঝে উঠতে।

নিকট আবার নিলে টেনে, লাউডস্পীকারে গ্রামোফন সঙ্গীত পরিবেশন হচ্ছে। একটা চলতি সিনেমা সঙ্গীত। খুব চলতি হলেও ও-জাতের গানের ওপরে খুব শ্রদ্ধা না থাকায় কথাগুলো আয়ত্ত হয়নি—তবে মানেটা বোধ হয় এই রকম যে, চঞ্চল বায়ুতে আমার গায়ের রাঙা মলমলের দোপট্টা অর্থাৎ উড়ানি উড়িয়ে দিচ্ছে—দেখো, ওগো দেখো···

আজ হঠাৎ সমস্ত অশ্রদ্ধা ভাসিয়ে দিয়ে গানটা আমার সারা দেহ রোমাঞ্চিত করে দিলে। কারণ ছিল, দৃষ্টি গেল উত্তর চক্রবাল রেখায়; হিমালয়ের শিখর লুপ্ত করে সেখানে হাল্কা মেঘের স্তূপ জমা হয়েছে, একেবারে পূর্ব থেকে পশ্চিম কোণ পর্যন্ত রাঙা দোপট্টার হিল্লোল উঠেছে শান্ত বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণে। এক অদ্ভুত সঙ্গত, আমার দূর আর আমার নিকট এমন এক হয়ে মিলে যেতে আর কখনও দেখিনি। রেকর্ডে সীমাবদ্ধ অল্পায়ু সঙ্গীত এক সময় থেমে গেল, ওদিকে রাঙা দোপট্টার উৎসব কিন্তু অবিচ্ছিন্নই চলেছে মর্তের সঙ্গীতের সঙ্গে স্বরলোকের যারা নেচে উঠেছিল তারা যেন আর নিজেদের সম্বৃত করে উঠতে পারছে না।

রেকর্ডে অন্য সুর উঠতে রসভঙ্গ হল, আমি এসে সতরঞ্চিতে ওদের পাশে গা ঢেলে দিলাম।

রসভঙ্গ হোক, তবুও উর্ধ্বে অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মনটা উদ্বেলিতই হয়ে উঠছে আজ। সুদূর বেহারের পাড়াগাঁয়ে একজন বাঙালীর নবগৃহের এই অনুষ্ঠানটি লাগছে বড় ভালো। আজ আমরা বিপর্যস্ত, কিন্তু সারা ভারতে আমরাই তো প্রগতির অগ্রদূত। আজও একেবারেই অধুনাতম-গৃহস্থাপত্য, রেডিও, বিজলীর যা বিস্ময় তা তো আমরাই দিলাম এনে এখানে।

অর্থের তো অকুলান নেই দেশটায়, কিন্তু কোথায় থাকে যেন পেছিয়েই…

ওই চিন্তাই এনে ফেললে অন্য একটা জায়গায় ; কেমন হয়, এখানে যদি বাংলা ভাষা প্রচার করবার কেন্দ্র করা যায়। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হয়েছে, কিন্তু ওরাও আমাদের একটু জানুক, নৈলে এক জাতিত্বের বোধটা ভালো করে ফুটতেই পারে না। আর, সে জানবার একটি মাত্র উপায় সাহিত্য।

এখানে কয়েক ঘর বাঙালী ; দুঘর ডাক্তার, ঘিয়ের ব্যবসা নিয়ে দুঘর আছেন, পূর্ববঙ্গের এক উদ্বাস্তু পরিবার একটা দোকান করেছেন, স্টেশনেও আছেন কয়েক ঘর, একজন চাষবাস নিয়েও আছেন। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, একটা গোড়া পত্তন করে যেতেই হবে, আস্তে আস্তে হোক না একটু কাজ।

পাড়লাম কথাটা, সবাই লুফে নিলে, চমৎকার হয়। মিথিলা-বাংলার সম্বন্ধটা আদি কালের, আশেপাশেই অনেক মৈথিল পাওয়া যাবে যাঁরা বাংলা ভাষার অনুরাগী, প্রকৃত অভিজ্ঞ এমনও অনেক আছেন, তাঁদেরও সহযোগিতা যাবে পাওয়া। আর মৈথিল-বাঙালী উভয়ের কবি বিদ্যাপতির দেশও এই। কয়েক মাইল দূরেই তো বিপ্‌সী।

জায়গা হয়েছে, লুচির পাতার নীচে কথাটা আপাতত চাপা পড়ল। আমারও ক্ষিদে পেয়েছে, নিতান্ত শিবপুরের গোরাচাঁদ না হই, মানুষই তো!

ব্যবস্থা চমৎকার হয়েছে। হোক পাড়াগাঁ, তেমনি এদিকে আবার ডাক্তারও তো! শম্ভু পর্যন্ত কাৎ হয়েছে। মাছ ছিল, মাংস ছিল, তারপর খাবার মাঝামাঝি ওর কানে ফিসফিস করে একজন কি বলে গেল। প্রশ্ন করতে শম্ভু বললে—"ও কিছু না, তোমাদের ছেলে মানুষদের সব কথায় থাকতে নেই।"

পরে টের পেলাম নৈকষ্য কুলীনদের জন্যে মুরগীর ব্যবস্থা ছিল, আর দুটোর সঙ্গে কখন চালান হয়ে গিয়েছিল পাতে পাতে।

প্রায় সাড়ে দশটার মধ্যে আমরা উঠে পড়লাম। ফেরবার গাড়ি সাড়ে বারোটায়, স্টেশন মিনিট দশেকেরও পথ নয়, আবার সতরঞ্চিতে গা দিলাম এলিয়ে।

আবার বাংলা ভাষা প্রচার সমিতির কথা তুলব তুলব করছি, এমন সময় কাছেই আমার শিয়র থেকে একটু তফাতে একটা আলাপ আলোচনার টুকরো শুনে আমায় কান পেতে দিতে হল। একটি গলা চিনলাম, এখানকারই একটি বাঙালী ছেলের। অপরটি বেহারী, চিনি না, তবে ছোকরাই। আলোচনাটা